নারীর শিক্ষা ও ক্ষমতায়নে সুফিয়া কামাল ও সমসাময়িক কতিপয় নারী ব্যক্তিত্ব: ভূমিকা ও অবদান

মাস্টার অব ফিলসফি (এম. ফিল.) ডিগ্রি অর্জনের আংশিক শর্ত
পূরণার্থে উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

তনুশ্রী মল্লিক

রেজিস্ট্রেশন নং : ০০৬/ ২০১৫-২০১৬
ক্রমিক নং: ১৬-৯০৪
শিক্ষাবর্ষ: ২০১৫-২০১৬

শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

জমাদান : ডিসেম্বর, ২০২১

নারীর শিক্ষা ও ক্ষমতায়নে সুফিয়া কামাল ও সমসাময়িক কতিপয় নারী ব্যক্তিত্ব: ভূমিকা ও অবদান

মাস্টার অব ফিলসফি (এম. ফিল.) ডিগ্রি অর্জনের আংশিক শর্ত পূরণার্থে উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

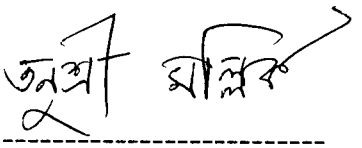

গবেষক

তনুশ্রী মল্লিক

ভাষাশিক্ষা বিভাগ

শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

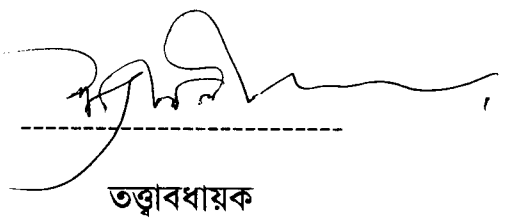

তত্ত্বাবধায়ক

শ্যামলী আকবর

অধ্যাপক

শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সূচিপত্র

ঘোষণাপত্র i
প্রত্যয়নপত্র ii
কৃতজ্ঞতা স্বীকার iii
গবেষণার সারমর্ম iv

প্রথম অধ্যায় ০১-০৪
অবতরণিকা
১.১ ভূমিকা
১.২ সমস্যা নির্বাচন
১.৩ গবেষণার তত্ত্বীয় কাঠামো
১.৪ গবেষণার তাৎপর্য
১.৫ গবেষণার উদ্দেশ্য
১.৬ গবেষণা প্রশ্ন
১.৭ গগেবেষণার সীমাবদ্ধতা

দ্বিতীয় অধ্যায় ০৫-৫৫

সংশ্লিষ্ট সাহিত্য পর্যালোচনা
২.১ সূচনাভাষ্য
২.২ লীলা নাগ, শামসুন নাহার মাহমুদ ও সুফিয়া কামাল: জন্মকথা ও ব্যক্তিজীবনে পারিবারিক, আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রভাব
২.২.১ লীলা নাগ: জন্ম ও বেড়ে ওঠা
২.২.২ লীলা নাগ: ব্যক্তিজীবনে পারিবারিক, আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রভাব পিতা-মাতার প্রভাব
২.২.৩ শামসুন নাহার মাহমুদ: জন্ম ও বেড়ে ওঠা
২.২.৪ শামসুন নাহার মাহমুদ: ব্যক্তিজীবনে পারিবারিক, আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রভাব
২.২.৫ সুফিয়া কামাল: জন্ম ও বেড়ে ওঠা
২.২.৬ সুফিয়া কামাল: ব্যক্তিজীবনে পারিবারিক, আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রভাব
২.৩ লীলা নাগ, শামসুন নাহার মাহমুদ ও সুফিয়া কামাল: সমসাময়িক সমাজ প্রেক্ষাপট
২.৪ জীবনবোধ ও মানসগঠন
২.৪.১ লীলা নাগের জীবনবোধ ও মানস
২.৪.২ শামসুন নাহার মাহমুদের জীবনবোধ ও মানস
২.৪.৩ সুফিয়া কামালের জীবনবোধ ও মানস

তৃতীয় অধ্যায় ৫৬-৯১

৩.১ নারীর শিক্ষা ও ক্ষমতায়ন: প্রাসঙ্গিক পরিপ্রেক্ষিত
৩.২ লীলা নাগ, শামসুন নাহার ও সুফিয়া কামাল: মানসপটে নারীর শিক্ষা ও ক্ষমতায়ন
৩.২.১ লীলা নাগ
৩.২.২ শামসুন নাহার মাহমুদ
৩.২.৩ সুফিয়া কামাল
৩.৩ নারীর শিক্ষা ও ক্ষমতায়ন বাস্তবায়নে মনন, কর্ম ও উদ্যোগ: লীলা নাগ, শামসুন নাহার ও সুফিয়া কামাল
৩.৩.১ লীলা নাগ
৩.৩.২ শামসুন নাহার মাহমুদ
৩.৩.৩ সুফিয়া কামাল

চতুর্থ অধ্যায় **৯২-১০৯**

নারীর শিক্ষা ভাবনা ও নারীর ক্ষমতায়ন বিষয়ে চিন্তা, কর্ম ও উদ্যোগ: বর্তমান সমাজের প্রেক্ষাপটে প্রাসঙ্গিকতা

পঞ্চম অধ্যায় **১১০-১১৮**

গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল ১১০-১১৫
সুপারিশমালা ১১৬-১১৮
উপসংহার ১১৯

পরিশিষ্ট ১২০-১২৩
গ্রন্থপঞ্জি ১২৪-১২৫
সহায়ক গ্রন্থ ১২৬

ঘোষণাপত্র

আমি ঘোষণা করছি যে, "নারীর শিক্ষা ও ক্ষমতায়নে সুফিয়া কামাল ও সমসাময়িক কতিপয় নারী ব্যক্তিত্ব: ভূমিকা ও অবদান" শীর্ষক আমার মাস্টার অব ফিলসফি (এম.ফিল) অভিসন্দর্ভটি তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক শ্যামলী আকবর এর নির্দেশনায় পরিচালিত একটি বস্তুনিষ্ঠ গবেষণার ফসল। এ শিরোনামে আমার কোন অভিসন্দর্ভ কিংবা এর অংশ বিশেষ অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন ডিগ্রি বা প্রকাশনার জন্য ইতোপূর্বে উপস্থাপিত হয়নি।

তারিখ: ডিসেম্বর, ২০২১

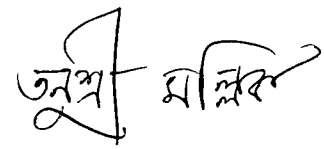

গবেষক
তনুশ্রী মল্লিক
রেজিস্ট্রেশন নং : ০০৬/ ২০১৫-২০১৬
ক্রমিক নং: ১৬-৯০৪
শিক্ষাবর্ষ: ২০১৫-২০১৬
শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রত্যয়ন পত্র

আমি প্রত্যয়ন করছি যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট এর ভাষা শিক্ষা বিভাগের মাস্টার অব ফিলসফি (এম.ফিল) গবেষক তনুশ্রী মল্লিক কর্তৃক উপস্থাপিত "নারীর শিক্ষা ও ক্ষমতায়নে সুফিয়া কামাল ও সমসাময়িক কতিপয় নারী ব্যক্তিত্ব: ভুমিকা ও অবদান" শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি চূড়ান্ত পাণ্ডুলিপি আদ্যপান্ত পাঠ করেছি এবং এটি মাস্টার অব ফিলসফি ডিগ্রির জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যথাযথ কর্তৃপক্ষ সমীপে উপস্থাপনের জন্য সুপারিশ করছি।

তারিখ: ডিসেম্বর, ২০২১

অধ্যাপক শ্যামলী আকবর
তত্ত্বাবধায়ক
শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

মাস্টার অব ফিলসফি (এম.ফিল) ডিগ্রির গবেষণাকর্মটি পরিচালনার আনুষ্ঠানিক অনুমোদন প্রদানের জন্য শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। গবেষণাকর্মটি সুচারুরূপে সম্পন্নকরণে শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের ভাষাশিক্ষা বিভাগের শ্রদ্ধেয় শিক্ষক অধ্যাপক শ্যামলী আকবর এ গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক। তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে গবেষণার বিভিন্ন ক্ষেত্রে তিনি আমাকে আন্তরিক সহযোগিতা, মূল্যবান উপদেশ ও নির্দেশনা প্রদান করেছেন।গবেষক তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছে।

গবেষণার তথ্য সংগ্রহের কাজে শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের গ্রন্থাগার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, বাংলা একাডেমী, গণ গ্রন্থাগার, মহিলা পরিষদ, আইন ও সালিশ কেন্দ্রসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে গবেষক নানাভাবে সহযোগিতা লাভ করেছে। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ব্যক্তিবর্গের প্রতি রইলো গবেষকের কৃতজ্ঞতা। গবেষণাকর্মটি সম্পন্নকরণে লেখক ও গবেষক দীপঙ্কর মোহান্তের প্রতি আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। তাঁর আন্তরিক সহযোগিতা না পেলে মৌলভীবাজার জেলার কমলগঞ্জ, ঘোষপুরের 'বরদা সুভাষিণী স্মৃতি পাঠাগার' থেকে তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হতো না।বহু দুর্লভ বইয়ে সমৃদ্ধ পাঠাগারটি এই গবেষণা কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের শিক্ষকমণ্ডলীর প্রতি গবেষক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে। এই গবেষণা কাজের শুরু থেকে বিভিন্ন সময়ে তাঁদের মূল্যবান পরামর্শ ও দিক নির্দেশনা ছিল গবেষকের চলার পথের পাথেয়। বিশেষ করে গবেষণাকর্মটি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের ক্ষেত্রে শ্রদ্ধেয় শিক্ষক অধ্যাপক ড. আব্দুল মালেক তাঁর মূল্যবান সময়, বিশ্লেষণী পরামর্শ ও দিক-নির্দেশনা প্রদান করে নানাভাবে সহযোগিতা করেছেন। গবেষক তাঁর প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে।

এই গবেষণায় অন্যান্য যারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সহায়তা করেছেন, তাঁদের প্রতি রইলো গবেষকের অশেষ কৃতজ্ঞতা।

ডিসেম্বর, ২০২১

গবেষক
তনুশ্রী মল্লিক

গবেষণার সারমর্ম

তনুশ্রী মল্লিক, **নারীর শিক্ষা ও ক্ষমতায়নে সুফিয়া কামাল ও সমসাময়িক কতিপয় নারী ব্যক্তিত্ব: ভূমিকা ও অবদান,** এম.ফিল. ডিগ্রির গবেষণাকর্ম, শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ২০২১।

গবেষণার উদ্দেশ্য

নারীর শিক্ষা ও ক্ষমতায়নে সুফিয়া কামাল, লীলা নাগ ও শামসুন নাহার মাহমুদের ভূমিকা ও অবদান পর্যালোচনা করা এই গবেষণাকর্মের মূল উদ্দেশ্য।

গবেষণার পদ্ধতি

এই গবেষণাকর্মটির বৈশিষ্ট্য মূলত ঐতিহাসিক ও দর্শনাশ্রয়ী। এ কারণে গ্রন্থ, প্রবন্ধ, চিঠিপত্র, দলিল ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের 'লিখিত সামগ্রী' এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় উপাত্তের উৎস হিসেবে কাজ করেছে। সুফিয়া কামাল, লীলা নাগ ও শামসুন নাহার মাহমুদের লেখা গ্রন্থ, পত্র, ডায়েরি, দলিল ইত্যাদি এবং তাঁদের সম্পর্কে লেখা অন্যদের রচিত বই, পুস্তক, লেখা চিঠি, জীবনী ইত্যাদি লিখিত সামগ্রী থেকে উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। যেহেতু গবেষণাকর্মটি মূলত চিন্তন, ইতিহাস ও দর্শনাশ্রয়ী, সেহেতু গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় উপাত্ত ও তথ্যের প্রধান উৎস হলো বিভিন্ন ধরনের লিখিত রচনা ও তথ্য নথিপত্র। এ কারণে গবেষণায় মূলত নথি বিশ্লেষণ পদ্ধতি (Document Analysis Method) ব্যবহার করা হয়েছে। গবেষণাকর্মটির প্রেক্ষাপট ও প্রাসঙ্গিকতা অনুযায়ী ভাবগত বিশ্লেষণের (Thematic Analysis) মাধ্যমে নথির বিভিন্ন অংশ থেকে উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে।

গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল

লীলা নাগ

১. লীলা নাগ নারী সমাজের পশ্চাদপদতার বেড়াজাল ছিন্ন করতে শিক্ষাকে মূল হাতিয়ার করেছিলেন। তাই নারী জাতির উচ্চশিক্ষার সুবিধার জন্য তিনি আন্দোলন করেছিলেন। নারীর প্রতি সমাজের সংকীর্ণ চিন্তাকে তিনি কখনো প্রশ্রয় দেননি।

২. তাঁর সংগ্রামী জীবনে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সমাজ একই সূত্রে গাঁথা। তাই নারীর মুক্ত, সুস্থ- 'মানুষ' হিসেবে বাঁচার পরিবেশ আনতে হলে প্রয়োজন তাঁর শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং সমাজের সাথে নিবিড় পরিচিতি।

৩. গবেষণালব্ধ ফলাফলে প্রতীয়মান হয়, লীলা নাগ দেশের পরাধীনতা ঘোচাতে নারী ও পুরুষকে একত্রে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন যেমন, তেমনি সমাজে নারীর পরাধীনতা ঘুচাতে হলেও নারী-পুরুষকে একত্রে এগিয়ে আসার মনোভাব সৃষ্টি করার কথাও বলেছেন।

৪. তিনি নারীদের শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় স্থাপনার ব্যবস্থা করেছিলেন।কেবল এতেই থেমে থাকেননি তিনি।বয়স্ক নারীদের জন্য শিক্ষা ও কাজের ব্যবস্থা করেছেন। হাতের কাজ, কুটির শিল্পের কাজের ব্যবস্থা করে, তার মধ্য দিয়ে তিনি নারীর অর্থনৈতিক মুক্তির ব্যবস্থাও করে দিয়েছিলেন।

৫. দীপালি সংঘের মূলধন দিয়ে দীপালি ভাণ্ডার খোলা হয়েছিলো।সমাজ পরিত্যক্ত নারীদের তিনি তাঁর সংঘে ঠাঁই দিয়েছিলেন। তাদের জীবনকে কাজে লাগিয়েছিলেন সমাজের অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর জন্য।

৬. গবেষণার ফলাফলে লক্ষণীয়, নিজ সংস্কৃতির সাথে পরিচয় না ঘটলে দেশপ্রেম জাগ্রত হয় না।পরাধীন ভারতবর্ষকে স্বাধীন করার লক্ষ্যে লীলা নাগ নারী সমাজকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ ও সচেতন করতে চেয়েছেন। তাই তাঁর দীপালি সংঘে নারীদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি তাদের শারীরিক ও মানসিক উন্নয়নের জন্য ব্যায়াম, খেলাধুলা, সঙ্গীত, অভিনয় ইত্যাদি বিষয়েও শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়।

৭. সম্মিলিতভাবে বৃক্ষরোপণ, সব্জিবাগান করা, বয়স্ক মহিলাদের স্বদেশ-ধর্ম চিন্তায় উদ্বুদ্ধকরণ, বাল্যবিবাহরোধ, অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ ও মেয়েদের স্কুলে পাঠানো এসকল কাজের মধ্যে একটি কাজ দীপালি সংঘের সদস্যদের করতেই হতো। দীপালি সংঘের এসব কার্যক্রম ছিল নারী সমাজকে সবদিক থেকে চার দেয়ালের বাইরের জগৎ ও প্রকৃত সংঘর্ষের সাথে পরিচয় করানো।

৮. অবরুদ্ধ নারী সমাজের জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধির উপায় হিসেবে লীলা নাগ পাঠাগার স্থাপন করেছিলেন। মেয়েদের প্রগতিশীল মানস গঠন, স্বদেশপ্রেম জাগ্রত করা, সমাজের কুসংস্কার-কূপমণ্ডূকতা দূরীভূত করে বিজ্ঞানমনস্ক করে তোলার ক্ষেত্রে পড়াশোনার বিকল্প নেই— তা উপলব্ধি করে দীপালি সংঘের উদ্যোগে মেয়েদের জন্য পাঠাগার তৈরি করা হয়েছিলো। পাঠাগারে সামসময়িক পত্রিকার সংগ্রহ ছিল যথেষ্ট।এই উদ্যোগটি ছিল সমকালীন বাস্তবতার সাথে মেয়েদের পরিচয় করানোর জন্য।

৯. দীপালি সংঘের উদ্যোগে 'নারী রক্ষা ফান্ড' গড়ে তোলা হয়েছিলো। বিধবা, স্বজনহীন বৃদ্ধা, সমাজকর্তৃক বহিষ্কৃত নারী, ধর্ষিতা, নিপীড়িত নারীদের জীবন রক্ষা ও সাহায্যের জন্য এই ফান্ড গড়ে তোলেন লীলা নাগ। এসব নারীদের শিক্ষার পাশাপাশি আত্মরক্ষার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও করেন তিনি।

১০. বাংলার প্রথম ছাত্রী সংগঠন গড়ে ওঠে লীলা নাগের হাত ধরে।উনিশ শতকের শুরুর দিকে রাজনৈতিক সংগঠন ও তাদের কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ নারীদের পক্ষে কষ্টসাধ্য ছিল।সে অবস্থায় 'দীপালি সঙ্ঘ' এক উপযুক্ত এবং পরিমার্জিত সংগঠন হিসেবে ছাত্রীদের সুযোগ করে দিয়েছিলো নিজেদের দাবি ও মতামত প্রকাশ, সামাজিক, রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশ নেওয়ার। বেথুন কলেজ, ইডেন হাইস্কুল, জগন্নাথ কলেজ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এই সংঘের কাজ কর্মের পরিধি ছিল বিশাল।

শামসুন নাহার মাহমুদ

১. নারী সমাজের শিক্ষা ও ক্ষমতায়নের কাজে বেগম রোকেয়ার কাছে শামসুন নাহার মাহমুদের হাতেখড়ি। তাঁর জীবনে বেগম রোকেয়ার আদর্শ ও দর্শনের প্রভাব যে প্রবল তা লক্ষ করা যায়।বেগম রোকেয়া কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'আঞ্জুমনে খাওয়াতীনে ইসলাম' ছিল তাঁর কাজের প্রেরণা।

২. বাংলার নারী সমাজের জন্য 'আঞ্জুমনে খাওয়াতীনে ইসলাম' ছিল নারীদের অসূর্যম্পশী অন্ধকার জীবনে এক আলোকবর্তিকা স্বরূপ।বেগম রোকেয়া নিজে শামসুন নাহার মাহমুদকে উত্তরাধিকার হিসাবে 'আঞ্জুমনে খাওয়াতীনে ইসলাম' এর কাজে প্রত্যক্ষভাবে সম্পৃক্ত করেছিলেন।বেগম রোকেয়ার অকাল প্রয়াণের পর এই সংগঠনের দায়িত্ব শামসুন নাহার মাহমুদ নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন।

৩. শামসুন নাহার মাহমুদ চেষ্টা করেছিলেন বেগম রোকেয়ার অসম্পূর্ণ কাজগুলো সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে।বাঙালি মুসলিম নারীদের বিশেষ করে বস্তির মেয়েদের পড়াশোনা শেখানো, হাতের কাজ শেখানো যাতে তাদের মধ্যে সচেতনতার সৃষ্টি হয় এবং তাদের দক্ষতা যেন আর্থিকভাবে কাজে লাগতে পারে, সেটি ছিল 'আঞ্জুমনে খাওয়াতীনে ইসলাম' এর উদ্দেশ্য।

৪. ১৯৩৪ সালে কলকাতায় নিখিল ভারত নারী সম্মিলনের বার্ষিক অধিবেশনে শামসুন নাহার মাহমুদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।সে সময় বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় অবৈধ নারী ব্যবসা দমন প্রসঙ্গে Immoral Traffic Bill পেশ করা হয়।এই বিলের স্বপক্ষে নারীদের মতামত সৃষ্টি করার জন্য তিনি তখন নারী সমাজে ব্যাপক আন্দোলন চালিয়েছিলেন।

৫. শামসুন নাহার মাহমুদ ছিলেন তখনকার সময়ের একজন রাজনীতি সচেতন নারী এবং সক্রিয় রাজনীতিক।গবেষণার ফলাফলে লক্ষণীয়, শামসুন নাহার মাহমুদ বুঝতে পেরেছিলেন, নারীকে শুধু পারিবারিক ও সামাজিকভাবে সচেতন করা ও সুদৃঢ় করার সাথে সাথে রাজনৈতিকভাবে সচেতন ও সম্পৃক্ত করতে না পারলে রাষ্ট্রের সিদ্ধান্ত ও কাজে নারীর প্রবেশাধিকার রদ থাকবে।

৬. নারীদের সার্বজনীন ভোটাধিকারের জন্য বাংলায় প্রবল আন্দোলনের পুরোভাগে ছিলেন শামসুন নাহার মাহমুদ।

৭. নারীদের শিক্ষা ও ক্ষমতায়নের সাথে সাথে তাদের নিরাপদ সামাজিক জীবন নিয়েও সোচ্চার হয়েছিলেন শামসুন নাহার মাহমুদ।নারীর উপর সমাজের অনৈতিক কার্যক্রমের বিপক্ষে তিনি ছিলেন সর্বদা দৃঢ় ও অটল অবস্থানে।

৮. গবেষণার ফলাফলের ভিত্তিতে বলা যায়, শামসুন নাহার মাহমুদ ছিলেন মুক্ত চিন্তক ও অসাম্প্রদায়িক।তাঁর জীবনে বেগম রোকেয়া এবং কাজী নজরুলের প্রভাব তাঁকে মুক্ত চিন্তা করার দিগন্ত দিয়েছিলো।মানুষের সংকটে সবসময় শামসুন নাহার মাহমুদ নিঃস্বার্থভাবে পাশে থেকেছেন। ধর্ম-বর্ণ দিয়ে চিন্তা করেননি কখনো।নিজের মুক্ত চিন্তাকে সবার মাঝে প্রকাশ করার লক্ষ্যে শুরু করলেন সাময়িকপত্র 'বুলবুল'।

৯. আধুনিক ও মুক্তচিন্তা, প্রগতিপন্থী মুসলমান সমাজের মুখপত্র হিসেবে 'বুলবুল' পত্রিকা তার বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখেছিলো। আর এই পত্রিকার মাধ্যমে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সমাজের নারী-পুরুষের চিন্তা প্রকাশ করার উদাত্ত আহ্বান করেছিলেন শামসুন নাহার মাহমুদ।

১০. রাজনীতি সচেতন শামসুন নাহার মাহমুদ দেশভাগের পূর্বে রাজনীতির সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন না।রাজনীতির সাথে তাঁর সম্পৃক্ততা ছিল সামাজিক কর্মের মধ্য দিয়ে। গবেষণায় শামসুন নাহার মাহমুদের সাহিত্যচর্চা, সমাজকর্মের সাথে তাঁর রাজনীতি সচেতনতার পরিচয় পাওয়া যায়।

১১. গবেষণার মাধ্যমে জানতে পারি, শামসুন নাহার মাহমুদ ব্যক্তিজীবনে বিশ্বাস করতেন যে, শিক্ষাহীন সমাজ নিয়ে দেশকে এগিয়ে নেওয়া সম্ভব নয়।নারী-পুরুষ নির্বিশেষে শিক্ষার আওতায় আনতে হবে।সমাজে সকলের জন্য শিক্ষা সুনিশ্চিত হলে দারিদ্র, রোগ দুটোই নিয়ন্ত্রণে চলে আসবে।শিক্ষা না থাকলে দক্ষ কর্মীর অভাব হবে ফলে তাদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি কষ্টসাধ্য হবে।অপরদিকে শিক্ষা মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করবে ফলে রোগব্যধি সম্পর্কে প্রতিরোধ ব্যবস্থা নিতে সক্ষম হবে।

১২. শামসুন নাহার মাহমুদের কাজের পরিসর ছিল সমাজ ও দেশের অগ্রগতি নিয়ে; তাঁর এই চিন্তা শুধু রাজনীতির আলোকে ছিল না।শিক্ষার মাধ্যমে সমাজকে উন্নত না করতে পারলে দেশ সামনে এগুতে পারবে না। শিক্ষাক্ষেত্রে অসম সমাজ পদে পদে মুখ থুবড়ে পড়বে।তাই শামসুন নাহার মাহমুদের রাজনৈতিক চেতনা তাঁর সমাজ চেতনার একটি অংশ।

১৩. গবেষণা কর্মটিতে উঠে এসেছে, শামসুন নাহার মাহমুদ নারী-পুরুষের শিক্ষার পাশাপাশি শিশুর শিক্ষা নিয়ে কাজ করেছিলেন।আজকের শিশুরাই আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। শিশুর বেড়ে ওঠার শুরুর অবস্থা থেকেই তার প্রতি যত্নশীল না হলে আশানুরূপ ফল চাওয়া বৃথা। সমাজকে নতুন করে গড়ে তুলতে ব্যক্তিকে তার শিশু অবস্থা থেকেই গড়ে তুলতে হবে। হঠাৎ করে তার পরিবর্তন কষ্টসাধ্য। তাই তাঁর সামাজিক কাজের একটি অংশ ছিল শিশুদের নিয়ে ভাবনা।

১৪. শামসুন নাহার মাহমুদ সমাজের বঞ্চিত শিশুদের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেছিলেন।তাঁর উদ্যোগে পঙ্গু শিশুদের জন্য পুনর্বাসন কেন্দ্র স্থাপিত হয় ১৯৬১ সালে।তিনি বিশ্বাস করতেন প্রতিটি শিশুই সম্ভাবনাময়, প্রতিটি জীবনই মূল্যবান। সঠিক পরিচর্যায় তাকে বিকশিত করতে হয়। তারাও যেন নিজেদের জীবনকে গঠন করে দেশের আদর্শ নাগরিক হয়ে উঠতে পারে। তাই তিনি আজীবন শিশুদের জন্য নানা কল্যাণমুখী কাজে নিজেকে সম্পৃক্ত রেখেছিলেন।

১৫. সমাজে নারী ও শিশুর ভবিষ্যতের চিন্তা যেমন শামসুন নাহার মাহমুদকে নাড়া দিয়েছে, তেমনি মানুষের দুঃসময়ে তিনি ছুটে গেছেন সেবাব্রতী মন নিয়ে।তাঁর মানবতাবাদী মনন ছিল সর্বোপরি।দুর্ভিক্ষ, দুর্যোগ, বন্যা, মন্বন্তর, দাঙ্গা যে কোন প্রতিকূল অবস্থায় মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি।

১৬. গবেষণায় শামসুন নাহার মাহমুদের মানবিকতা ও মমত্ববোধের প্রমাণ মেলে দেশভাগের তৎকালীন চিত্রে।দেশ ভাগ-কে কেন্দ্র করে বাংলার বুকে শুরু হয়েছিল দাঙ্গা। সংঘর্ষরত হিন্দু-মুসলমান সবার জীবন তখন বিপন্ন।হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে মানুষকে নিরাপদ আশ্রয় প্রদানের জন্য তিনি 'আঞ্জুমানে খাওয়াতীন ইসলাম' এর কর্ণধার হিসেবে এগিয়ে গেছেন মানুষের পাশে।মানুষের প্রতি মমত্ববোধ থেকেই তিনি দাঙ্গা কবলিত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য ছুটে গেছেন। মানুষের প্রতি গভীর মমত্ববোধ তাঁর ভেতরের মাতৃশক্তির ও মাতৃহৃদয়েরও পরিচায়ক।

সুফিয়া কামাল

১. সুফিয়া কামাল ছিলেন এমন একজন মানুষ যার চিন্তা-চেতনা ও মননে শুধু নারী জাগরণের বাণীই অনুরণিত হয়নি; তাঁর জীবনবোধের মুল চেতনা ছিল মানুষের কল্যাণ ও মঙ্গলের জন্য নিজেকে নিবেদিত রাখা। মানুষের উন্নয়নে, রাষ্ট্র ও সমাজে ন্যায় প্রতিষ্ঠার লড়াই তিনি করে গেছেন আজীবন নির্ভীক ও নিরলসভাবে।

২. গবেষণায় দেখা যায়, জন্মের পর থেকেই পারিবারিক গণ্ডিতে নারী পুরুষের যে বৈষম্য সুফিয়া কামাল প্রত্যক্ষ করেছেন সেখান থেকেই তিনি নারী সমাজের অগ্রগতি ও অধিকারের জন্য কাজ করার প্রেরণা পেয়েছিলেন। তিনি তাঁর মায়ের অবরুদ্ধতা, বিপর্যস্ততা প্রত্যক্ষ করেছিলেন। দেখেছিলেন অসহায় জীবনযাপন করতে।সে পরিস্থিতি থেকে নারী সমাজকে বের করে আনার তাগিদ অনুভব করেন তিনি।

৩. গবেষণার ফলাফলে লক্ষণীয়, সুফিয়া কামাল চিরায়ত বাঙালি সংস্কৃতিকে ধারণ করেছিলেন গভীরভাবে।নিজ সংস্কৃতিকে না জানলে, নিজের শিকড়ের সাথে সম্পর্ক না থাকলে মানুষ ও সমাজের প্রতি যথেষ্ট শক্তিশালী বন্ধন তৈরি হয় না। সুফিয়া কামাল সবসময় সংস্কৃতি চর্চার ব্যাপারটিকে সকল স্তরে ছড়িয়ে দেয়ার জন্য সচেষ্ট ছিলেন। সেই লক্ষ্যেই দেশের বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক সংগঠন বা প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার সাথে তিনি সরাসরি যুক্ত ছিলেন।

৪. গবেষণায় সুফিয়া কামালের সাহিত্য মানসে প্রথমে যে পরিচয়টি পাওয়া যায়— তা হচ্ছে মানবতাবাদ।তাঁর সাহিত্যে সবসময় মুখ্য হয়েছে মানুষ ও তার আবেগ-অনুভূতি, জীবন চলা।তাঁর সাহিত্য মাটি ও মানুষের সাথে নিবিড়ভাবে সম্পর্কযুক্ত। দেশ, মাটি ও মানুষ থেকে নিজেকে কখনো তিনি বিচ্ছিন্ন করেননি।

৫. বিশ শতকের শুরুর দিক থেকেই সুফিয়া কামাল সামাজিক কর্ম-কাণ্ডের সাথে সম্পৃক্ত হয়েছিলেন।ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সময়ে সমাজে নারীদের অবস্থান ছিল অত্যন্ত গৌণ। সে অবস্থায় তিনি পরিবার ও সমাজের রক্তচক্ষুর ভয়ে পিছ-পা হননি।শুরু থেকেই তাঁর মধ্যে নির্ভীক এক কর্মীসত্তা লক্ষ করা যায়।

৬. গবেষণায় সুফিয়া কামালের জীবনবোধ ও দর্শনের দিকে আলোকপাত করলে দেখতে পাওয়া যায় সুফিয়া কামালের ব্যক্তিত্বে মানবতাবাদ, নৈতিকতা, সমাজবোধ, নান্দনিকতাবোধ, সম্প্রীতিবোধ, স্বদেশপ্রেম ও স্বজাত্যবোধের প্রকাশ। তিনি আজীবন আপসহীন অবিচল ছিলেন অন্যায়ের বিরুদ্ধে।

৭. সুফিয়া কামাল মানুষ ও মনুষ্যত্বের পরিচয়টিকে সর্বদা সর্বোচ্চ আসনে রেখেছিলেন। তিনি কখনো সাম্প্রদায়িক মনোভাব লালন করেননি।আজীবন নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন মানুষের জন্য। জাত-ধর্ম বিচার না করে যেকোনো মানুষের দুঃখ-কষ্টে পাশে দাঁড়িয়েছেন।কাজ করেছেন ধর্মের সত্য, নৈতিকতা ও মূল্যবোধ থেকে।

৮. সুফিয়া কামালের জীবনভাবনায় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আধুনিক ও উদার মানসিকতা, মানবপ্রেমের দর্শনের ব্যাপক প্রভাব লক্ষ করা যায়। তাঁর শিক্ষাচিন্তায় রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শনের প্রতিফলনও দেখা যায়।

৯. গবেষণায় দেখা যায়, সুফিয়া কামাল সমাজে এমন শিক্ষা ব্যবস্থার কথা বলেছেন যা বাস্তব জীবনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। শিক্ষাকে কাজে লাগিয়ে মানুষ জীবনকে পরিশীলিত করবে, কর্মমুখর করবে এমন শিক্ষা চেয়েছিলেন তিনি।

১০. নারীসমাজকে সুফিয়া কামাল তাঁর সময়ের চিন্তাধারায় যে স্বাবলম্বী, বলিষ্ঠ, মানবিক আঙ্গিকে দেখার আহ্বান করেছিলেন, বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়েও তা ততটাই আবেদন রাখে। নারীকে শুধু পুঁথিগত শিক্ষা দিতে বলেননি তিনি; নারীর চেতনাকে জাগ্রত করার, বোধকে জাগ্রত করার কথাও বলেছেন।

১১. সুফিয়া কামাল নারীর ক্ষমতায়নকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন।আর এজন্য উৎপাদনবিমুখতা দূর করে উৎপাদন খাতের সাথে নারী সমাজকে যুক্ত করার প্রয়োজনীয়তা মানুষের উপলব্ধিতে আনার জন্য কাজ করে গেছেন।নারীর অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতাকে তিনি খুব জরুরি বলে মনে করেছেন। কেননা অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতার সাথে পরিবার বা সমাজের যে কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা বা অধিকার নির্ভরশীল।

১২. গবেষণায় জানা যায়, সুফিয়া কামালের শিক্ষা ভাবনায় যুগোপযোগিতা বা সময়ের দাবির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ শিক্ষার বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে।সেই লক্ষ্যে অচলায়তন থেকে বেরিয়ে এসে নিজের অধিকার বুঝে নেবার প্রতি তাঁর আহ্বান নারীপ্রগতি ও নারীর ক্ষমতায়নে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

১৩. গবেষণায় দেখা যায়, সকল অশুভ, অন্যায়, অসুন্দর ও অকল্যাণের বিরুদ্ধে সুফিয়া কামালের আপসহীন প্রত্যয়দৃঢ় অবস্থান মানুষের বিবেককে দৃঢ়ভাবে পরিচালিত করতে নিঃসন্দেহে শক্তিশালী প্রভাবকের ভূমিকা রাখবে। শুধু সন্তান উৎপাদন বা প্রতিপালন নয়, যে কোন ক্ষেত্রে স্বীয় মেধা ও পরিশ্রমে নারী হয়ে উঠবে স্বনির্ভর ও পরিপূর্ণ যোগ্য নাগরিক।

১৪. সুফিয়া কামাল নারীদের অধিকার আদায়ে লড়াই করেছেন তবে সমাজের পুরুষদেরকেও তিনি আহ্বান করেছেন একসাথে পথ চলতে।কারণ তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, নারী ও পুরুষ একত্রে চললেই জীবন, পরিবার, সমাজ, দেশ তথা আন্তর্জাতিক পর্যায় পর্যন্ত সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব।

১৫. বর্তমান সমাজে নারী ও শিশুর প্রতি যে সহিংস আচরণ তা অত্যন্ত লজ্জাজনক।গবেষণায় জানা যায়, নারী ও শিশুর প্রতি সহিংস আচরণ রোধের দূরদর্শিতা সুফিয়া কামালের চিন্তা-চেতনায় অনেক আগে থেকেই অনুভূত হয়েছিল। সমাজের তরুণদের প্রতি ছিল তাঁর অগাধ আস্থা ও বিশ্বাস। যে কোন সহিংসতা ও দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতিতে তরুণ সমাজকে এগিয়ে আসার জন্য সুফিয়া কামাল উদাত্ত আহ্বান করেছিলেন।

সুপারিশমালা

১. লীলা নাগ, শামসুন নাহার মাহমুদ এবং সুফিয়া কামালকে নিয়ে কাজ করতে গিয়ে তাঁদের বিভিন্ন লেখা ও তাঁদের সম্পর্কিত সমস্ত তথ্য পেতে গবেষককে অনেক বেগ পেতে হয়েছে।সেই অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে গবেষকের মনে হয়েছে, তাঁদের সমস্ত বই, পত্রিকা, নথিপত্র ও অন্যান্য প্রকাশনাকে সহজপ্রাপ্য করার ব্যবস্থা নেয়া আবশ্যক।

২. সরকারি গণগ্রন্থাগারগুলোতে লীলা নাগ, শামসুন নাহার মাহমুদ, সুফিয়া কামালসহ বিস্মৃতপ্রায় ব্যক্তিত্ব সংশ্লিষ্ট বইপত্রাদি প্রাপ্তির নিশ্চয়তা প্রদান করার ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের উদ্যোগ গ্রহণ বাঞ্ছনীয়।

৩. বর্তমান সময়ে সমাজে শিশু ও নারী অপরাধ মারাত্মকভাবে বেড়ে চলেছে।ছোট ছোট কিশোর-কিশোরীরা নানাধরনের অপরাধমূলক কাজের সাথে যুক্ত হয়ে পড়ছে যা খুবই উদ্বেগজনক।অবাধ তথ্যপ্রবাহের এই সময়ে বিজাতীয় সংস্কৃতির প্রভাবও

এক্ষেত্রে বড় ভূমিকা রাখছে।মূল্যবোধের চরম অবক্ষয়ের এই সময়ে লীলা নাগ, শামসুন নাহার মাহমুদ এবং সুফিয়া কামালের জীবনভাবনাকে নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের মাঝে ছড়িয়ে দেয়া খুব জরুরি বলে গবেষক মনে করে। এক্ষেত্রে পাঠ্যবইতে তাঁদের বর্ণময় জীবনের ত্যাগ-তিতিক্ষার সত্যি ঘটনা, জীবনী, জীবনদর্শন ও তাঁদের সাহিত্যকর্ম বিভিন্ন আঙ্গিকে সন্নিবেশিত করা যেতে পারে।

৪. বর্তমান সময়ে নারীর প্রতি সমাজের যে দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণ তা খুবই ন্যাক্কারজনক।লীলা নাগ, শামসুন নাহার মাহমুদ এবং সুফিয়া কামালের চেতনায় সমাজে নারীর যে অবস্থানের ঠিকানা পাওয়া যায়— তা সমাজের সামনে আরও ব্যাপক পরিসরে তুলে আনতে হবে। নারী নিজে উপলব্ধি করুক তার জীবনের সাথে কি করণীয় আছে তার নিজের, মূল্যায়ন করতে শিখুক নিজেকে।

৫. বর্তমান সময়ে সমাজে জাতিগত বিভেদ মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে।সাম্প্রদায়িক মনোভাব পরিহার করে একত্রে চলার যে মনোবৃত্তি তা এই গবেষণার তিনজন ব্যক্তিত্ব— লীলা নাগ, শামসুন নাহার মাহমুদ এবং সুফিয়া কামালের জীবনবোধে ফুটে উঠেছে স্পষ্টভাবে, সেই দর্শনের প্রচার ও প্রসার বর্তমান সমাজে সময়ের দাবী।

৬. নারীর উৎপাদন ক্ষমতাকে কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয়ভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করা আবশ্যক।এতে করে নারী সমাজকে দেশের সম্পদে পরিণত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার সুযোগ সৃষ্টি হবে। বর্তমান যুগে শুধু নারী সমাজ নয়, নারী ও পুরুষ উভয়— সমাজের জন্য হাতের কাজ, বৃত্তিমূলক শিক্ষা, কারিগরি শিক্ষার প্রয়োজন।

৭. লীলা নাগ, শামসুন নাহার মাহমুদ এবং সুফিয়া কামালকে নিয়ে সামগ্রিক কাজের উপর উল্লেখ করার মত তেমন কোন গবেষণা হয়নি। গবেষক মনে করেন, এ বিষয়ে আরও ভিন্ন আঙ্গিকে এবং বৃহৎ পরিসরে গবেষণা হওয়া দরকার। সেক্ষেত্রে গবেষণার উপযোগী পরিবেশ ও সবধরনের সহযোগিতার নিশ্চয়তা থাকা প্রয়োজন।

৮. লীলা নাগ এবং শামসুন নাহার মাহমুদের রচনাসমূহ সংরক্ষণের উদ্যোগ নেওয়া আবশ্যক। বই, পত্রিকার সংরক্ষণ না থাকলে গবেষণা কাজ করা কষ্ট সাধ্য হয় এবং পরবর্তী প্রজন্মের কাছে তাঁদের জীবন এবং কাজ অজানা থেকে যাবার সম্ভাবনা থাকে। এ সমস্ত ক্ষেত্রে শিক্ষা মন্ত্রণালয়, সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় এবং মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা অপরিহার্য।

৯. নারীদের জন্য দীপালি সংঘের মতো সংগঠন গড়ে তোলা অত্যন্ত জরুরি।শিক্ষার পাশাপাশি নারীদের জন্য শারীরিক শিক্ষা, হাতের কাজ, সামাজিক কাজ, দেশাত্মবোধক কাজ, বিনোদনমূলক কাজের সুযোগ রাখা আবশ্যক।

১০. সমাজের চোখে যারা অস্পৃশ্য তাদের জন্য পুনর্বাসন, শিক্ষার সুযোগ, অর্থনৈতিক কাজের সুযোগ তৈরি করার ব্যবস্থা করা আবশ্যক। প্রতিটি মানুষের জীবন মূল্যবান।সমাজ ও দেশের কাজে লাগানোর জন্য তাদের ক্ষেত্র তৈরির দিকে সচেতনতা প্রয়োজন।

১১. সমাজে নারীদের উপর নৃশংস অত্যাচারের যে চিত্র দেখা দৃশ্যমান তাতে নারীদের প্রতিরোধমূলক কৌশল শিক্ষা দেওয়া বাঞ্ছনীয় হয়ে গেছে।

১২. নারীদের শিক্ষা ও কাজের পাশাপাশি রাজনীতি সচেতন হতে হবে।সচেতন না হলে পরিবার থেকে শুরু করে সমাজে, রাষ্ট্রের যে কোন পর্যায়ে অন্যায় অত্যাচার সম্পর্কেও বুঝতে পারবে না এবং এই শোষণের প্রতিবাদও করতে পারবে না।

বর্তমানে নারীর কর্মক্ষেত্রে অংশগ্রহণ তুলনামূলক কিছুটা বাড়লেও রাজনীতির ক্ষেত্রে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ আরও দৃঢ় করা জরুরি।

১৩. প্রাথমিক, মাধ্যমিক থেকে উচ্চস্তর পর্যন্ত লীলা নাগ, শামসুন নাহার মাহমুদ এবং সুফিয়া কামালের লড়াই, কর্ম, উদ্যোগ, দেশপ্রেম, জীবনবোধ ও দর্শন শিক্ষাক্রমের মাধ্যমে পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত করে ভবিষ্যৎ শিক্ষার্থীদের চেতনা ও মননে ছড়িয়ে দিতে হবে। শিক্ষার্থীর বয়স ও উপযোগিতা বিবেচনা সাপেক্ষে সেটি করতে পারলে সমাজে এর গভীর ইতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি করতে সহায়ক হতে পারে।

১৪. সমাজ, দেশ ও জাতির জন্য যারা সারা জীবন কাজ করে গেছেন তাঁদের নাম জন্ম বার্ষিকী, প্রয়াণ দিবস প্রভৃতিতেই যেন সীমাবদ্ধ না থাকে। বইয়ের পাতায় সবাইকে স্থান না দিতে পারলেও বিভিন্ন সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, আলোচনা সভার মাধ্যমে তাঁদের কীর্তি মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়।

১৫. নারীর শিক্ষা ও ক্ষমতায়নের ভাবনাগুলোকে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে বিভিন্ন মাধ্যমে প্রচারণার মধ্য দিয়ে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া অত্যাবশ্যক। তা বর্তমান অস্থিরতা, হিংসা হানাহানির সংস্কৃতি থেকে সমাজ, দেশ ও জাতিকে বেরিয়ে আসতে সাহায্য করবে।

প্রথম অধ্যায়

অবতরণিকা

১.১ ভূমিকা

আধুনিক পৃথিবীর অগ্রযাত্রার পথ পরিক্রমায় পুরুষের পাশাপাশি নারীসমাজের অংশগ্রহণ ও গুরুত্বপূর্ণ অবদান লক্ষণীয়। নারীর সমঅধিকার ও ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে আমরা এখনো আধুনিক বিশ্বের তুলনায় অনেক পিছিয়ে। তবে সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশে নারীশিক্ষার হার বেড়েছে এবং নারীরা রাষ্ট্র ও সমাজের অনেক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করছেন।

দুঃসহ প্রতিকূলতার মধ্যে ৭১' পূর্ববর্তী পরাধীন বাংলাদেশ ও ৭১' পরবর্তী স্বাধীন বাংলাদেশ ভূখণ্ডটির নারীসমাজ দীর্ঘ সংগ্রামের পথ অতিক্রম করে আজ তার নিজস্ব অধিকার প্রতিষ্ঠার দিকে ক্রমান্বয়ে অগ্রসর হচ্ছে। শত শত বছরের অজ্ঞানতা, কুসংস্কার আর ধর্মীয় ও সামাজিক অনুশাসনের অচলায়তন ভেঙে বাংলার নারীসমাজকে যারা আলোর দিশা ও মুক্তির সন্ধান দেয়ার লক্ষ্যে আজীবন লড়াই-সংগ্রাম করে গেছেন তাঁদের মধ্যে সুফিয়া কামাল, লীলা নাগ ও শামসুন নাহার মাহমুদ অগ্রগণ্য। নারীর শিক্ষার জন্য এবং সমাজে নারীর অধিকার ও ক্ষমতা সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে তাঁরা নিজেদের আমৃত্যু সচেষ্ট রেখেছিলেন ।

সুফিয়া কামাল ও তাঁর সমসাময়িক লীলা নাগ এবং শামসুন নাহার মাহমুদের নারীর শিক্ষাচিন্তা-বিষয়ক দৃষ্টিভঙ্গি, উদ্যোগ তৎকালীন সময়ে যেভাবে সমাজকে পরিমার্জিত করার লক্ষ্যে অগ্রণী ভূমিকা রেখেছিল, তা বাংলাদেশের বর্তমান সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে কতটা ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে সক্ষম সেটি জানার লক্ষে এই গবেষণাকর্মটি করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

১.২ সমস্যা নির্বাচন

বাঙালি নারী জাগরণে অনেক উজ্জ্বল নক্ষত্রপ্রতিমের মাঝে অন্যতম সুফিয়া কামাল এবং তাঁর সাথে লীলা নাগ ও শামসুন নাহার মাহমুদও অগ্রগণ্য। তাঁরা তাঁদের লেখনী, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড ও সমাজ সচেতনতা নিয়ে অসম সাহসিকতার সাথে নারী অধিকার থেকে শুরু করে সমস্ত সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অধিকারের জন্য রাজপথেও ছিলেন আমরণ সক্রিয়। তাঁদের নারীশিক্ষা ভাবনা, নারীর ক্ষমতায়নের চিন্তা ও সাংস্কৃতিক চেতনা বর্তমান সময়ের দাবিতে অনেক বেশি প্রাসঙ্গিক। নারীশিক্ষাকে অর্থবহ ও যুগোপযোগী করে একটি ইতিবাচক পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করে গবেষণার বিষয়বস্তু হিসেবে 'সুফিয়া কামাল ও সমসাময়িক কতিপয় নারী ব্যক্তিত্ব: তাঁদের ভূমিকা ও অবদান' বিষয়টি গবেষক বেছে নিয়েছেন।

তাঁদের সাহিত্যকর্ম, নারীশিক্ষা ভাবনা এবং বাঙালির সাংস্কৃতিক চেতনা জাগরণের সুদীর্ঘ সংগ্রামমুখর পথ চলা নিয়ে বিভিন্ন প্রকাশনা, চিঠিপত্র, প্রবন্ধ, বিশিষ্টজনদের স্মৃতিচারণা ও তাঁদের নিজেদের সাক্ষাৎকারের কিছু অংশ পর্যালোচনা করে বর্তমান গবেষণাকর্মের বিষয়বস্তু নির্বাচন করা হয়েছে। বর্তমান সাহিত্য-সংস্কৃতি, শিক্ষা ভাবনায় তাঁদের জীবনবোধ ও চেতনার প্রভাব কতটা তাৎপর্যপূর্ণ- এই গবেষণাকর্মটি তা যাচাই করার একটি প্রয়াস।

১.৩ গবেষণার তত্ত্বীয় কাঠামো

নারীসমাজের গতানুগতিক অন্ধত্ব ও গোঁড়ামিকে উপেক্ষা করে সুফিয়া কামাল, লীলা নাগ এবং শামসুন নাহার মাহমুদ তাঁদের লেখনী এবং রাজপথের সুদীর্ঘ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বাঙালির মুক্তির অন্যতম দিশারীর ভূমিকা পালন করেছেন। বর্তমানেও নারী অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং জাতীয় চেতনার মুক্তি আন্দোলনে তাঁদের চিন্তা, আদর্শ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাঁদের অনুপ্রেরণায় ও সাহসী নেতৃত্বে বিশ শতকের বাঙালি নারীসমাজ সংস্কারের গণ্ডি অতিক্রম করে আধুনিক পৃথিবীতে নিজেদেরকে মানুষ হিসেবে আবিষ্কার করতে পেরেছিল, তাঁর ধারাবাহিকতা এখনো বহমান। একটি সংস্কৃতিমনস্ক জাতি গঠনে সুফিয়া কামাল, লীলা নাগ ও শামসুন নাহার মাহমুদের জীবন, সাহিত্য, সংস্কৃতি চর্চা ও নারী জাগরণে তাঁদের সামগ্রিক ভূমিকা বর্তমান সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে খুবই জরুরি। বিশেষ করে জাতীয় জীবন তথা সাহিত্য-সমাজ, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক চেতনা, নান্দনিক বোধ, নারীর শিক্ষা-ভাবনা, নারীর পারিপার্শ্বিক অবস্থান আমাদের ব্যক্তিজীবনের ইতিবাচক পরিবর্তনে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।

তাঁদের চিন্তা-চেতনা শুধু নারীজাতির জন্যই নয়, সমগ্র বাঙালি জাতি ও সমাজের জন্য সুস্থ পরিবেশ তৈরিতে এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য পথ প্রদর্শক হিসেবে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারে।

গবেষক এই গবেষণায় সুফিয়া কামাল, লীলা নাগ ও শামসুন নাহার মাহমুদের সময়ের অবস্থার পাশাপাশি বর্তমান অবস্থায় এর অবদান কতটা যুগোপযোগী তা পর্যালোচনার মাধ্যমে উপস্থাপন করার চেষ্টা করবে।

বিভিন্ন রচনা, অভিজ্ঞতা ও স্মৃতিচারণা থেকে আমরা জানতে পারি সুফিয়া কামাল, লীলা নাগ ও শামসুন নাহার মাহমুদ বিখ্যাত এবং বিজ্ঞ ব্যক্তিদের সাহচর্য লাভ করেছেন। তাঁদের রচনা ও জীবনের সামগ্রিক কর্মকাণ্ডের দিকে দৃষ্টিপাত করলে আমরা দেখি শত বাঁধা ও ঝঞ্ঝা মোকাবিলা করেও আমরণ তাঁরা সমাজের হতদরিদ্র, অধিকারবঞ্চিত, নিপীড়িত ও শোষিত শ্রেণির পাশে থেকেছেন এবং লড়াই করে গেছেন। এই লড়াই সংগ্রামের মধ্যে আমরা তাঁদের মানবতাবাদী সত্তাকে খুঁজে পাই। মানবতা প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ের এই পথপরিক্রমায় পুরুষশাসিত সমাজের পিছিয়ে থাকা শিক্ষাবঞ্চিত, কুসংস্কার ও অনুশাসনের শৃঙ্খলে বন্দী নারী সমাজকে জাগিয়ে তোলার ক্ষেত্রে তাঁরা ছিলেন নিরলস ও অকুতোভয় যোদ্ধা।

১.৪ গবেষণার তাৎপর্য

সুফিয়া কামাল, লীলা নাগ ও শামসুন নাহার মাহমুদকে নিয়ে ইতোপূর্বে খুব বেশি কাজ হয়নি। সুফিয়া কামালের ক্ষেত্রে তাঁর নিজের রচনা ছাড়া কাজী মোহাম্মদ আশরাফ রচিত জীবনীগ্রন্থ, লুৎফর রহমান রিটন সম্পাদিত 'সুফিয়া কামাল স্মারকগ্রন্থ', নাসিমা হক প্রণীত 'শতাব্দীর সাহসিকা সুফিয়া কামাল', ড. সেলিম জাহাঙ্গীর প্রণীত 'সুফিয়া কামাল'- সহ বিভিন্ন সময়ে কিছু বই প্রকাশিত হলেও তাঁকে নিয়ে ব্যাপক পরিসরে কোন গবেষণা হয়নি। পূর্বে ইয়াছমিন সুলতানা কর্তৃক 'সুফিয়া কামাল: নারী নেতৃত্ব ও সাহিত্যকৃতি' শীর্ষক একটি গবেষণাকর্ম ছাড়া আর কোন উল্লেখযোগ্য গবেষণা হয়েছে বলে জানা যায়নি। তাছাড়া এ যাবত সুফিয়া কামাল-এর উপর বৃহৎ পরিসরে কোন গবেষণা হয়েছে বলে জানা যায়নি। লীলা নাগের উপর দীপংকর মোহান্ত রচিত জীবনী গ্রন্থ 'লীলা নাগ', স্মারক গ্রন্থ 'লীলা নাগ শতবর্ষের শ্রদ্ধাঞ্জলি' এবং শামসুন নাহার

মাহমুদের উপর শাহিদা পারভীন রচিত 'শামসুন নাহার মাহমুদ ও সমকালীন নারীসমাজের অগ্রগতি' ছাড়া আর কোন বইয়ের সন্ধান পাওয়া যায়নি।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে মানুষের চেতনার জাগরণে, বিশেষ করে নারীর সামাজিক অংশগ্রহণ, তার সার্বিক অগ্রগতির প্রয়োজন বিবেচনায় নারীর শিক্ষা-ভাবনা ও নারীর ক্ষমতায়ন নিয়ে গবেষণার প্রয়োজন আছে বলে গবেষক মনে করেন।

সাহিত্যিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক চেতনার জাগরণে সুফিয়া কামাল, লীলা নাগ ও শামসুন নাহার মাহমুদের ভূমিকা বর্তমান সময়ে অনেক বেশি প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠতে পারে। সেই বিবেচনা থেকে গবেষণার বিষয় হিসেবে গবেষক 'সুফিয়া কামাল ও সমসাময়িক কতিপয় নারী ব্যক্তিত্ব: তাঁদের ভূমিকা ও অবদান' গবেষণাকর্ম হিসেবে বেছে নিতে উদ্বুদ্ধ হয়েছেন।

১.৫ গবেষণার উদ্দেশ্য

নারীর শিক্ষা ও ক্ষমতায়নে সুফিয়া কামাল, লীলা নাগ ও শামসুন নাহার মাহমুদের ভূমিকা ও অবদান পর্যালোচনা করা এই গবেষণাকর্মের মূল উদ্দেশ্য।

১.৬ গবেষণা প্রশ্ন

ক) নারীর শিক্ষা সংশ্লিষ্ট কোন কোন বিষয়ে সুফিয়া কামাল, লীলা নাগ এবং শামসুন নাহার মাহমুদ প্রাধান্য দিয়েছেন?

খ) নারীর শিক্ষা সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ বাস্তবায়নে তাঁরা কি ধরনের দিক নির্দেশনা দিয়েছেন?

গ) নারীর শিক্ষা ও ক্ষমতায়ন বলতে লীলা নাগ, শামসুন নাহার মাহমুদ এবং সুফিয়া কামাল কি বুঝিয়েছেন?

ঘ) তাঁদের কোন কোন চিন্তা ও কর্মের মধ্য দিয়ে নারীর ক্ষমতায়ন বাস্তবায়নের পথ নির্দেশনা লক্ষ করা যায়?

ঙ) নারীর শিক্ষা ভাবনা ও নারীর ক্ষমতায়ন বিষয়ে তাঁদের চিন্তা, কর্ম ও উদ্যোগ বর্তমান প্রেক্ষাপটে সমাজের অগ্রগতিতে কতটা সহায়ক?

১.৭ গবেষণার সীমাবদ্ধতা

এই গবেষণাকর্মটি সম্পাদন করতে গিয়ে গবেষককে অনেকক্ষেত্রেই বেশ বেগ পেতে হয়েছে। প্রথমত, সুফিয়া কামাল, লীলা নাগ এবং শামসুন নাহার মাহমুদ বা তাঁদের কাজের উপর গবেষণা এর আগে খুব একটা হয়নি। উল্লেখ করার মতো কেবল

ইয়াছমিন সুলতানা কর্তৃক 'সুফিয়া কামাল নারী নেতৃত্ব ও সাহিত্যকৃতি', দীপংকর মোহান্ত কর্তৃক 'লীলা নাগ' শাহিদা পারভিন কর্তৃক 'শামসুন নাহার মাহমুদ ও সমকালীন নারীসমাজের অগ্রগতি' শিরোনামে গবেষণাপত্রের সন্ধান পাওয়া গেছে যা গ্রন্থাকারে পাওয়া যায়। সুফিয়া কামালের লেখা বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত গ্রন্থের বেশিরভাগই বর্তমানে বাজারে পাওয়া যায় না; সঙ্গত কারণেই সেগুলি সংগ্রহ করতে গিয়ে গবেষককে খুবই বেগ পেতে হয়েছে। লীলা নাগ এবং শামসুন নাহার মাহমুদের লেখা, বিভিন্ন সময়ের প্রকাশিত গ্রন্থগুলো দেশের নির্ভরযোগ্য গ্রন্থাগারগুলোতেও পাওয়া যায়নি। তাঁদের নিয়ে প্রকাশিত কিছু বইয়ের ক্ষেত্রেও একই অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হতে হয়েছে। কিছু বইয়ের সূত্রের সন্ধান পাওয়া গেলেও অনেক চেষ্টা করেও কোথাও ওই বইয়ের কোন কপি পাওয়া যায়নি। তখনকার সময় প্রকাশিত পত্রিকাগুলির অনুলিপি যাতে তাঁদের লেখা ছিল, তা বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য। সে সময়ের কিছু পত্রিকার সন্ধান পাওয়া গেলেও প্রয়োজনীয় আরও অনেক পত্রিকাই পাওয়া যায়নি। বই-পুস্তকের বাইরেও লীলা নাগ ও শামসুন নাহার মাহমুদকে আমরা জনসমক্ষে তুলে ধরতে পারিনি। লীলা নাগ তাঁর ত্যাগী জীবনে— দুঃখের মধ্যে সর্বদা কাজ করে সমাজকে আলোর পথ দেখিয়েছিলেন, কিন্তু এ দেশে কোথাও তাঁর স্মৃতিটুকু রক্ষিত হয়নি। এগুলো সংরক্ষণে যথাযথ প্রতিষ্ঠানগুলো একটু দায়িত্বশীল হলে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহে আগ্রহী যেকোনো গবেষকের পক্ষে কাজ করা সহজ হতো। শুধু জন্মদিন ও মৃত্যুবার্ষিকী ব্যতিরেকে আমাদের দেশের গুরুত্বপূর্ণ মহান ব্যক্তিদের জীবন ও কর্ম নিয়ে তেমন কোন আয়োজনও খুব একটা পরিলক্ষিত হয় না, যা তাঁদের ব্যাপারে জানতে সহায়ক হতে পারে। সুফিয়া কামাল, লীলা নাগ এবং শামসুন নাহার মাহমুদকে নিয়ে কাজ করতে গিয়ে প্রয়োজনীয় তথ্যপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে অনেক প্রতিবন্ধকতা অনুভূত হয়েছে। যেসমস্ত সংগঠন বা প্রতিষ্ঠানের সাথে তাঁরা ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন সেসব সংগঠন বা প্রতিষ্ঠানেও তথ্য যথাযথ গুরুত্বের সাথে সংরক্ষণ করা হয়নি। তা সত্ত্বেও এই তিনজন মহীয়সী— লীলা নাগ, শামসুন নাহার মাহমুদ এবং সুফিয়া কামালকে নিয়ে পরবর্তীসময়ে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের গবেষণার ক্ষেত্রে বর্তমান প্রচেষ্টাটি কিছুটা হলেও সহায়ক হলে গবেষক প্রাণিত হবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সংশ্লিষ্ট সাহিত্য পর্যালোচনা

২.১ সূচনাভাষ্য

পৃথিবীর যেকোনো সভ্যতার দিকে লক্ষ করলেই দেখা যায়, কিছু মানুষ পথ তৈরি করে, আর বাকিরা সে পথ অনুসরণ করে। এ ভাবেই সমাজ ও সভ্যতা এগিয়ে যায়। সভ্যতার ইতিহাসে সুদীর্ঘকাল ধরে বাইরের মুক্ত পৃথিবীর আলো-বাতাস থেকে বঞ্চিত এক অন্ধকারের আবর্তে অবরুদ্ধ জীবন পার করেছে বাঙালি নারী সমাজ। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে এমনই চলে এসেছে। পুরুষ শাসিত সমাজে নারীকে গৃহবন্দী রাখার উদ্দেশ্য থেকে তাদের উপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছে— ধর্মের নামে অমানবিক কঠিন অনুশাসন, নানাবিধ সামাজিক বিধিনিষেধ। সেসব কুসংস্কারের ঘেরাটোপ অতিক্রম করে তাদের সাধ্য ছিল না নিজের ইচ্ছা, যোগ্যতা আর স্বপ্নকে মেলে ধরার। বাঙালী নারী জাগরণের পথিকৃৎ হিসেবে আমরা জানি মহীয়সী নারী বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনকে। রক্ষণশীল সমাজের একজন নারী হয়ে তিনিই প্রথম এ আগল ভেঙে বেরিয়ে আসতে পেরেছিলেন। সকল অবরোধবাসিনীকে ডাক দিয়েছিলেন মুক্ত আকাশের নিচে বেরিয়ে আসার। নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন এদেশের নারী সমাজের উপযুক্ত মর্যাদা প্রতিষ্ঠার কঠিন লড়াইয়ে। এ লড়াইয়ে আরও যারা উত্তরসূরি ছিলেন তাঁদের মধ্যে শামসুন নাহার মাহমুদ, সুফিয়া কামাল এবং লীলা নাগ অগ্রগণ্য। শামসুন নাহার মাহমুদ এবং সুফিয়া কামালের সুযোগ হয়েছিল বেগম রোকেয়ার সংস্পর্শে আসার। তাঁরা সন্ধান পেয়েছিলেন এক উন্মুক্ত আকাশের। লীলা নাগ সরাসরি বেগম রোকেয়ার সান্নিধ্যে যেতে না পারলেও নারী সমাজের জন্য তথা মানব জাতির জন্য কাজ করে গেছেন আজীবন। বেগম রোকেয়ার অসম্পূর্ণ স্বপ্নগুলো অনেকাংশে পূরণ করার চেষ্টা করেছেন লীলা নাগ, শামসুন নাহার মাহমুদ এবং সুফিয়া কামাল।

একটি বিষয় এখানে উল্লেখ্য, লীলা নাগ, শামসুন নাহার মাহমুদ এবং সুফিয়া কামাল—তিনজনের জন্মই খুব কাছাকাছি সময়ে। লীলা নাগ ১৯০০ সালে, শামসুন নাহার মাহমুদ ১৯০৮ সালে এবং সুফিয়া কামাল ১৯১১ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁরা প্রত্যেকেই প্রায় একই সমাজ, সংস্কৃতি ও পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে তাঁদের জীবনের দিকে অগ্রসর হয়েছেন। সমাজের শৃঙ্খল নারীদের প্রতি পদে পদে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সমাজের সেই শৃঙ্খল ভেঙ্গে নারীদের শিক্ষার আলোয় আসার পথ একটুও মসৃণ ছিল না।

লীলা নাগ, শামসুন নাহার মাহমুদ এবং সুফিয়া কামাল মানুষের প্রতি প্রগাঢ় ভালোবাসা আর তাদের অবস্থার উন্নয়নে কাজ করার তাগিদ অনুভব করেছিলেন বাল্যকাল থেকেই। নিজেদের দেখা নানান সামাজিক অসঙ্গতি, কুসংস্কার ও অজ্ঞানতার অন্ধকারে নিমজ্জিত বাংলার নারী সমাজকে আলোর সন্ধান দিতে সমগ্র জীবন উৎসর্গ করে গেছেন তাঁরা। সকল শ্রেণির নির্যাতিত, নিপীড়িত মানুষের অধিকার বাস্তবায়নে সামাজিক, সাংস্কৃতিক এমনকি রাজনৈতিক আন্দোলন-সংগ্রামেও তিনজনই ছিলেন নিরলস ও অকুতোভয় কর্মী। যে কোন দুর্যোগ-দুর্বিপাকে হাজারো অপবাদ আর শাসককুলের রক্তচক্ষুর বিপরীতে তাঁরা সর্বদাই ছিলেন অবিচল।

লীলা নাগ, শামসুন নাহার মাহমুদ এবং সুফিয়া কামাল— এই তিনজন মানুষের চরিত্র গঠনের বুনিয়াদ, বেড়ে ওঠার পরিবেশ, পারিবারিক প্রভাব একেবারেই পৃথক। কিন্তু তাঁদের কাজের আদর্শ ও ক্ষেত্র সময়ের পরিক্রমায় সদৃশ হয়ে উঠেছিলো। নারী তথা মানুষের প্রতি সমাজের আঘাত ক্ষত-বিক্ষত করেছে তাঁদের। তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন সমাজের এই আঘাত প্রতিহত করতে পারে শুধু শিক্ষার আলো। তাই শিক্ষার আলো নিয়ে সমাজের আঘাতকে প্রতিরোধ করার ও মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য ব্রতী হয়েছিলেন এই তিন মহান প্রাণ।

লীলা নাগ, শামসুন নাহার মাহমুদ এবং সুফিয়া কামাল তাঁদের সুদীর্ঘ কর্মময় জীবনে বহু বিখ্যাত ও মহান মানুষের সান্নিধ্য লাভ করেছেন। লীলা নাগ তাঁর কর্মের মাধ্যমে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মহাত্মা গান্ধী, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু, জওহরলাল নেহেরু প্রমুখ ব্যক্তিত্বের সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন। শামসুন নাহার মাহমুদের 'পুণ্যময়ী' বইটির ভূমিকা লিখেছেন আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম। 'আঙুর' পত্রিকার সম্পাদক মুহম্মদ শহিদুল্লাহ্ তাঁর লেখনীর প্রশংসা করেছিলেন। সুফিয়া কামালের লেখার প্রতি মুগ্ধ হয়ে কবিগুরু প্রশস্তি স্তবক লিখে পাঠিয়েছিলেন। আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর লেখা 'সাঁঝের মায়া' বইয়ের ভূমিকা লিখেছিলেন। সুফিয়া কামাল মহাত্মা গান্ধীর সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন। [১] (হক, ২০১৩, পৃষ্ঠা ৭৯, ৯০) এই তিনজন মহীয়সী নারীই নিজ নিজ অবস্থান থেকে মানুষকে দিয়েছেন প্রাণের দিশা, দিয়েছেন জীবনের মন্ত্র। তাঁদের চেতনার বিস্তৃত আকাশের সবটা জুড়ে ছিল সমাজের আপামর বঞ্চিত ও পিছিয়ে থাকা নারী তথা মানব জাতির কল্যাণচিন্তা।

২.২ লীলা নাগ, শামসুন নাহার মাহমুদ ও সুফিয়া কামাল: জন্মকথা ও ব্যক্তিজীবনে পারিবারিক, আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রভাব

২.২.১ লীলা নাগ: জন্ম ও বেড়ে ওঠা

১৯০০ সালের ২ অক্টোবর গিরিশচন্দ্র নাগ এবং কুঞ্জলতা দেবী চৌধুরীর পরিবারে জন্ম নেয় তাঁদের কন্যা লীলা নাগ। লীলা নাগের জন্মের আগে দু'জন শিশুপুত্র ও একজন কন্যা সন্তানের মৃত্যু হয়। তাঁর বড় একজন ও ছোট দু'জন ভাই ছিল। লীলা নাগের জন্মস্থান আসামের গোয়ালপাড়া শহরে। চাকরিসূত্রে তাঁর পিতা সেখানে ছিলেন। তাঁর পিতা তখন গোয়ালপাড়া মহকুমার এস.ডি.ও ছিলেন। লীলা নাগের পৈত্রিক বাড়ি বর্তমান মৌলবিবাজার জেলার রাজনগর থানাধীন পাঁচগাও গ্রামে, পূর্ব নাম ছিল পাঞ্চগ্রাম। [২] (মোহান্ত, ১৯৯৯, পৃষ্ঠা- ১২)

লীলা নাগের শৈশব কাটে আসামের গোয়ালপাড়ায়। বাংলার আর দশটা মেয়ের মত সমাজের শৃঙ্খল অসূর্যস্পর্শী অবগুণ্ঠনে আবদ্ধ করতে পারেনি তাঁর জীবনকে। লীলা নাগের পিতৃকুল ও মাতৃকুল উভয়ই ছিল শিক্ষার আলোয় আলোকিত। নারী শিক্ষায়ও পরিবার দুটি ছিল অগ্রসর। পরিবারে এ ধরনের পরিবেশ থাকায় পারিবারিক আবহে বাল্য শিক্ষার সূত্রপাত ঘটলেও স্বাভাবিকভাবে তাঁর আনুষ্ঠানিক শিক্ষার সূচনা হয় আসামের দেওঘরে একটি বিদ্যালয়ে। কিন্তু সেখানে ভাল বিদ্যালয় না থাকায় ১৯০৭ সালে আট বছর বয়সে কলকাতার ব্রাহ্ম গার্লস স্কুলে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করে ১৯১১ সালে ঢাকা ইডেন হাইস্কুলে ভর্তি হন। সেখান থেকে ১৯১৭ সালে বৃত্তি পেয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন তিনি। [৩] (দাশপুরকায়স্থ, ১৯৯৯, পৃষ্ঠা- ৭৯)

লীলা নাগের পিতা গিরিশচন্দ্র নাগের জন্ম হয় ১৮৬১ সালের ২৬ জুন পাঁচগাও গ্রামে। গ্রামের টোলে পড়ার পর উচ্চশিক্ষা গ্রহণের জন্য তাঁকে কলকাতা পাঠানো হয়। জীবনের প্রায় প্রতিটি পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকারী গিরিশচন্দ্র ১৮৮৬ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শনশাস্ত্রে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হয়ে এম.এ ডিগ্রি লাভ করেন। তাঁর মত মেধাবী ছাত্রকে ফল প্রকাশের পূর্বেই উড়িষ্যার কটক র‍্যাভেনশ্ কলেজ অধ্যাপনার কাজে পাঠাতে প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যক্ষ দ্বিধা করেননি। পরবর্তীতে আইনশাস্ত্রেও তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন। অধ্যাপনার পর কিছুদিন আইন ব্যবসা করে আসাম সিভিল সার্ভিসে যোগদান করেন। [৪] (মোহান্ত, ১৯৯৯, পৃষ্ঠা- ১৪)

চাকুরির টাকা ব্যয় করে নিজ গ্রামের অনুন্নত অবস্থার পরিবর্তন সাধন করেছিলেন লীলা নাগের পিতা গিরিশচন্দ্র নাগ। নারীশিক্ষা বিকাশে ১৮৭৭ সালে 'শ্রীহট্ট সম্মিলন' কাজে অর্থ দান করেছিলেন। তাঁর উপার্জিত অর্থ প্রচুর পরিমাণে তিনি সামাজিক কাজের মতো রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডেও ব্যয় করেছিলেন। চাকুরিজীবন থেকেই স্বদেশী আন্দোলনকারীদের প্রতি প্রসন্ন দৃষ্টি ছিল তাঁর। চাকুরি থেকে অবসর নিয়ে ঢাকার বকশীবাজারে স্থায়ী বসবাস শুরু করেন গিরিশচন্দ্র নাগ। বিশের দশকে ঢাকার বিদ্বৎ সমাজের অন্যতম ব্যক্তিত্ব ছিলেন তিনি। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোর্টের সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন।[৫] (মোহান্ত, ১৯৯৯, পৃষ্ঠা- ১৫)

লীলা নাগের মাতামহ প্রকাশচন্দ্র দেব ছিলেন আসাম ডেপুটি কমিশনারের অফিসে প্রথম ভারতীয় সুপারিন্টেনডেন্ট। তিনি ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত না হলেও ওই আদর্শ মেনে চলতেন। শ্রীহট্ট ব্রাহ্মসমাজের ট্রাস্ট ডিডস এ তাঁর নামের উল্লেখ রয়েছে। "২। শ্রীযুক্ত রায় সাহেব প্রকাশচন্দ্র দেব পীং সুবিদচন্দ্র রায় চৌধুরী সং পং ঢাকা দক্ষিণ মৌজে রায়ঘড় জাতীয় কায়স্থ ব্যবসা মীরাসদারী ইত্যাদি।"[৬] (শ্রীহট্ট ব্রাহ্মসমাজের নিয়মাবলী, ১৯৪৬, পৃষ্ঠা- ১৭) লীলা নাগের মা কুঞ্জলতা দেবী চৌধুরী সে সময়ের উচ্চশিক্ষিতা মেয়ে ছিলেন। আসামের ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন। বাল্যকালে পিতার কাছে ব্রাহ্মধর্মের আদর্শ ও যৌবনে স্বামীর কাছে সংগ্রামী দীক্ষার সমন্বয় চিন্তা ধারায় সারা জীবন চলেছেন। ব্যক্তিস্বাধীনতার প্রতি তিনি ছিলেন খুবই শ্রদ্ধাশীল। লীলা নাগকে তিনি গান-বাজনা, রান্না-বান্না, বিভিন্ন ধরনের হস্তশিল্পের কাজ নিজেই শিখিয়েছিলেন। [৭] (মোহান্ত, ১৯৯৯, পৃষ্ঠা- ১৬)

১৯১১ সালে ঢাকা ইডেন হাইস্কুলে পড়াকালীন সময়ে লীলা নাগ হোস্টেলে থাকতেন। সেখানে তিনি হোস্টেলে থাকতেন। সুষমা সেনগুপ্তা তাঁর সম্পর্কে স্মৃতিচারণ করতে যেয়ে বলেছেন,

> আমি যখন ইডেন স্কুলে ভর্তি হলাম, লীলা তখন দশম শ্রেণীর ছাত্রী। আমার থেকে দু'বছরের সিনিয়র। তখন তাঁর সঙ্গে আলাপ ভাল করে হয়নি। দূর থেকে দেখে মেয়েটিকে চোখে পড়ত। দেখতে লীলা সুন্দর ছিল। পড়াশুনায় সে ছিল ক্লাসের প্রথমা ছাত্রী। শিক্ষিকাদের প্রিয়- কিন্তু শুধু সে জন্য নয়। তাঁর ভেতর ছিল একটা আকর্ষণীয় শক্তি, স্বভাবতই সে ছিল মেয়েদের নেত্রী। [৮] (মোহান্ত, ১৯৯৯,পৃষ্ঠা- ১৮)

সেখান থেকে ১৯১৭ সালে বৃত্তি পেয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন তিনি। ১৫ টাকা বৃত্তিসহ কলকাতার বেথুন কলেজে ভর্তি হন। সেখানে তিনি হোস্টেলে থাকতেন। কলকাতার রাজনৈতিক পরিবেশের সাথে তাঁর সরাসরি পরিচয় ঘটে সেখানে পড়তে যাওয়ার সুবাদে। লীলা নাগ সেখানকার রাজনৈতিক বলয়ের স্পর্শে তাঁর আদর্শ ও চলার পথ খুঁজে পেয়েছিলেন। তাঁর ব্যক্তিত্ব ও গুণের জন্য বেথুন কলেজে তিনি ছাত্রী-নেত্রী হয়েছিলেন। প্রীতি চট্টোপাধ্যায় লীলা নাগ সম্পর্কে বলেন,

> ... পড়াশুনায় লীলা বরাবরই ভালো ছিল, যদিও সে কোন দিনই ঠিক Studious যাকে বলে, তা ছিল না। সবই নিয়মে করতো। খেলাধুলাতেও তার যথেষ্ট উৎসাহ ছিল। টেনিস, ব্যাডমিন্টন, হাডুডু এ সবের চর্চা তো খেলার মাঠে প্রতিদিনই হোত। কলেজের যে কোন আনন্দোৎসবে সে খুবই আগ্রহের সঙ্গে অংশগ্রহণ করত। একবার একটি মূক-অভিনয়ে (Tableau)—"মদনভষ্ম" নাটকে তাকে মহাদেবের পার্ট দেওয়া হয়েছিল। অভিনয়টি খুবই সুন্দর হয়েছিল এবং "মহাদেব" সাজে তাকে অতি চমৎকার মানিয়েছিল। তার বহুমুখী প্রতিভা সদাপ্রফুল্ল মিষ্টি স্বভাবের গুণে সে সকলেরই প্রিয় ছিল।[৯] (মোহান্ত, ১৯৯৯,পৃষ্ঠা- ১৯)

বেথুন কলেজ থেকে লীলা নাগ ১৯১৯ সালে প্রথম বিভাগে আই.এ পাশ করেন। ইংরেজি বিষয়ে অনার্স নিয়ে এই কলেজেই বি.এ তে ভর্তি হয়েছিলেন। ১৯২১ সালে ইংরেজি অনার্সে মেয়েদের মধ্যে প্রথম হয়ে বি.এ পাশ করে পদ্মাবতী স্বর্ণপদক ও নগদ একশত টাকা পুরস্কার পেয়েছিলেন। [১০] (মোহান্ত, ১৯৯৯, পৃষ্ঠা- ১৮-১৯)

বেথুন কলেজ থেকে বি.এ পাশ করে উচ্চশিক্ষার জন্য তিনি ভর্তি হতে আসেন ১৯২১ সালে প্রতিষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। জন্মলগ্নে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সহশিক্ষার ব্যবস্থা ছিল না। তত্ত্বগতভাবে যদিও আইনগত বাধা ছিল না। লীলা নাগের একাগ্রতা ও দৃঢ়তা দেখে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্য শিক্ষাবিদ স্যার পি.জে হার্টগ মুগ্ধ হয়ে পরিবেশ সৃষ্টির উদ্যোগ নিয়ে তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি করেন।

> The first female student of Dhaka University was one Lila Nag. In 1921, the very year of foundation of the institution, Lila Nag joined the Department of English as a student of the 1st part of M.A. class. Earlier she had passed B.A. examination with distinction from the Bethune College at Calcutta. However, here the Dhaka University authority behaved in the same way Calcutta University did once. They refused to permit Lila Nag to join the university. But Lila Nag was bold enough to ignore all sorts of opposition and persisting in getting her admission.[১১] (The Dhaka University Studies, 1990, page- 191)

ছাত্রী হিসাবে লীলা নাগের সসম্ভ্রম গাম্ভীর্য শিক্ষক ও সহপাঠীদের সসম্মান স্বীকৃতি পায়। এর ফলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সহ-শিক্ষার পথ প্রশস্ত হয়। ১৯২৩ সালে কৃতিত্বের সাথে তিনি ইংরেজি সাহিত্যে এম.এ পাশ করেন। এর মধ্য দিয়ে সমাপ্ত হয় লীলা নাগের আনুষ্ঠানিক শিক্ষা।[১২] (শতবর্ষের শ্রদ্ধাঞ্জলি, ২০০৩, পৃষ্ঠা- ২৩)

২.২.২ লীলা নাগ: ব্যক্তিজীবনে পারিবারিক, আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রভাব

পিতা-মাতার প্রভাব

লীলা নাগের শিক্ষা জীবনের পথ যতটা মসৃণ মনে হয় বাস্তবে ততটা নয়। পারিবারিক সহযোগিতা লীলার শিক্ষা জীবনে প্রধান ইতিবাচক ভূমিকা পালন করলেও সমাজ সর্বদা অনুকূল ছিল না। তখনকার সময়ে মেয়েদের ঘরের বাইরে যাওয়া সমাজের চোখে স্বাভাবিক কোন ঘটনা ছিল না। পুরুষের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে মেয়েরা স্কুল-কলেজে যেয়ে পড়াশুনা করবে এই ঘটনা সাধারণ হিন্দু পরিবারগুলোতেও নিতান্ত স্বাভাবিক ছিল না। লীলা নাগের পরিবার সরাসরি ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত না হলেও ব্রাহ্মধর্মের আদর্শ মেনে চলতো। তাই নারী শিক্ষার বিষয়ে সমাজের দৃষ্টিভঙ্গির সাথে লড়াই করার মনোবল সাধারণ হিন্দু পরিবারের চেয়ে বেশি ছিল। সমাজের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে বাড়ি থেকে দূরে হোস্টেলে রেখে লীলা নাগকে পড়াশুনা

করান তাঁর পরিবার। তখনকার দিনে এ ব্যবস্থা খুব একটা দেখা যেত না। শুধু পড়াশোনাই নয়, লীলা নাগ তাঁর জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে পিতা মাতা তথা পরিবারের পূর্ণ সমর্থন পেয়েছিলেন। সংগ্রামী জীবনে চলার পথে তাঁর পথিক সঙ্গীরা তাঁকে ত্যাগ করলেও তাঁর পরিবার তাঁর পাশে ছিল সর্বদা। তাঁর স্বামী অনিল রায় তাঁর কাজের ক্ষেত্রে সহায়তা করেছেন সবসময়।

তাঁর সংগ্রামী জীবন নিয়ে আরও বিস্তারিত আলোচনা করার পূর্বে তাঁর পিতা-মাতা, পারিবারিক সদস্য এবং আত্মীয়দের সম্পর্কে আলোচনা করা প্রাসঙ্গিক। কারণ বাল্যকাল থেকেই শিশু লীলার জীবনে তাঁদের প্রভাব কখনো প্রত্যক্ষভাবে কখনো পরোক্ষভাবে পড়েছিল। লীলা নাগের বেড়ে ওঠার ক্ষেত্রে তাঁদের দূরদর্শী পদক্ষেপ লীলার জীবনের ভিত গড়ে তুলেছিল। লীলা নাগের পিতামহ গঙ্গাগোবিন্দ নাগ আঠারো শতকের মানুষ হলেও চিন্তায় ছিলেন অগ্রসর। রাজা রামমোহন রায়ের সহযোগী ও 'সম্বাদ ভাস্কর' পত্রিকার সম্পাদক গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্যের বাড়ি ছিল গঙ্গাগোবিন্দ নাগের বাড়ির খুব নিকটে। ফলে প্রগতিশীল চিন্তার স্পর্শ লাগা স্বাভাবিক ছিল। গঙ্গাগোবিন্দ অর্থনৈতিক কারণে বেশি অগ্রসর হতে পারলেও তাঁর একমাত্র পুত্র গিরিশচন্দ্র নাগকে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত করেছিলেন। লীলা নাগ শৈশবের দিন থেকেই বাড়িতে পেয়েছেন জাতীয়তা ও স্বদেশিকতার ভাবাদর্শে উদ্বুদ্ধ এক পরিমণ্ডল। "১৯০৫ সাল থেকেই দেখতেন বাড়িতে বিলিতী কাপড় বর্জন এবং 'বঙ্গলক্ষ্মীর' মোটা কাপড় বরাদ্দ হয়েছে। ক্ষুদিরামের ফাঁসির দিনে অশ্রু ও অরন্ধনের মধ্য দিয়ে এই পরিবার বাংলার সেই প্রথম শহিদের প্রতি তাঁদের শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।"[১৩] (দাশগুপ্ত, ১৯৬৩, পৃষ্ঠা- ৮১)

শৈশবে ও কৈশোরে লীলা নাগের চারদিকে ছিল শিক্ষা গ্রহণের অপরিহার্য সব উপাদান। তাঁর পিতা শোনাতেন দেশি-বিদেশি গল্প, মা বলতেন রামায়ণ, মহাভারতের কাহিনী। মাতামহ শোনাতেন স্বদেশপ্রেমী যোদ্ধা নেপলিয়ান বোনাপার্ট, ম্যাটসিনি, গ্যারিবোল্ডি প্রমুখের ইতিহাস। ফলে লীলার শিশু মনে শুরু থেকেই দেশপ্রেম, মানুষের পাশে সর্বাত্মক সহযোগিতা নিয়ে পাশে দাঁড়ানো, সমাজের কুসংস্কার পরিত্যাগ করা, ব্যক্তিস্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করার মনোভাব গড়ে উঠেছিল ধীরে ধীরে। লীলা নাগের চারিত্রিক দৃঢ়তা তিনি অনেকটা উত্তরাধিকার সূত্রে তাঁর পিতা মাতার কাছ থেকে পেয়েছিলেন। তার সাথে শিক্ষার আলো তাঁকে আরও পরিশীলিত, দৃঢ় আর সচেতন করে তুলেছে।

লীলা নাগের এ সকল গুণাবলির পেছনে রয়েছে লীলা নাগের মা কুঞ্জলতা নাগের নিষ্ঠা ও শ্রম। তিনি নিজেই লীলাকে গান বাজনা, রান্না এবং হাতের কাজ শিখিয়েছিলেন। ছোটবেলা থেকেই পড়ে শোনাতেন রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থের নানা উপাখ্যান ও দর্শন।

গবেষণায় কুঞ্জলতা নাগের আগামী দিন সম্পর্কে চিন্তার গভীরতার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর ব্রাহ্ম মহিলা সমাবেশে দেওয়া ভাষণ থেকে।

> প্রকৃতি যেমন শত শত পার্থক্যের ভিতর দিয়াও সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলিয়াছে, মানবকেও সেইরূপ এইসকল প্রকৃতিগত বিভিন্নতার মধ্য দিয়া সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলিতে হইবে। প্রেমই এই সকল বিভিন্নতার মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে সমর্থ বলিয়া মনে হয়। প্রত্যেক অণুপরমাণুতে যেমন আকর্ষণ শক্তি বর্তমান, প্রত্যেক মানবে সেইরূপ প্রেমের অঙ্কুর বর্তমান। কিন্তু জড়ের এই আকর্ষণ শক্তি যেমন স্থূল দৃষ্টিতে পরিলক্ষিত হয় না, স্থল বিশেষ এবং প্রক্রিয়া বিশেষে যেমন ইহার কার্য অধিকতর পরিস্ফুট হইয়া থাকে সেমত সেইরূপ প্রচ্ছন্নভাবে মানবে বর্তমান থাকিলেও স্থান বিশেষে এবং সাধনার তারতম্য অনুসারে ইহার বিকাশের তারতম্য হইয়া থাকে। ইচ্ছা করিলেই প্রেমিক হওয়া যায় না।

মা কুঞ্জলতা নাগের এই গভীর ভাবনার ছায়ায় লালিত লীলা নাগ যে আগামী দিনে কাজ করার জন্য নিজেকে উজাড় করে দিতে ব্রতী হবেন তা সহজেই অনুমেয়। ত্যাগের মধ্য দিয়েই যে সেবায় ব্রতী হতে হয় সেই দীক্ষা কুঞ্জলতা নাগ তাঁর কন্যা লীলা নাগের মনে গেঁথে দিয়েছিলেন। মায়ের শিক্ষায় মহৎ জীবনের আদর্শ কন্যাকে সকল কর্মে প্রবুদ্ধ করতো মনের গভীর থেকে।

জীবনসঙ্গীর প্রভাব

১৯৩৯ সালে লীলা নাগ তাঁর সহপাঠী, বিপ্লবী পথের সহযাত্রী, প্রেরণাদাতা, দিক-নির্দেশক অনিল রায়-কে জীবনসঙ্গী রূপে গ্রহণ করেন। বিপ্লবী জীবনে লীলা নাগ এবং অনিল রায় কাজ করেছেন এক সঙ্গে। বিপ্লবী জীবন এবং সংসার জীবনে বন্ধুর পথে সঙ্গী হয়ে পাশে ছিলেন দুজন দুজনের।

> When she was a student of M.A. class, Lila came into contact of one Anil Roy, a devoted revolutionary of the time. Anil Roy from his college life had been a member of "Anushilon Samiti" –a secret society working in East Bengal particularly in Dhaka. In the university, as a talented student of the Department of English, Anil Roy later formed his own society – 'The Social Welfare League'—which afterwards was named 'Sri-sangha'. Lila Nag as a classmate of Anil Roy (both lived in nearby Baxibazar area) and being his 'chief disciple and lieutenant' set up a new society especially for the girls, in the name of 'Dipali Sangha'.[১৫] (The Dhaka University Studies, 1990, page- 191)

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রভাব

কর্ম জীবনে শক্তি ও প্রেরণা রূপে লীলা নাগের মানসে প্রভাব বিস্তার করেছেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। লীলা নাগ কবিগুরুর লেখা থেকে পথ চলার শক্তি সঞ্চয় করতেন। সমাজ ও রাষ্ট্রের তথাগত শৃঙ্খল ভাঙতে যেয়ে লীলা নাগ নানা ধরনের অত্যাচারের শিকার হয়েছেন। কিন্তু কখনোই তিনি ভেঙ্গে পড়েননি। দৃঢ়তা নিয়ে এগিয়ে গেছেন জীবনে চলার পথে। আর সেই পথে পাথেয় হয়েছে রবি ঠাকুরের লেখা ও দর্শন। গবেষণার মাধ্যমে জানতে পারি, দীপালি সংঘের যাত্রা এবং জয়শ্রী'র পথ চলায় কবিগুরু রবি ঠাকুরের কখনো প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ উপস্থিতি সর্বদাই লক্ষণীয়। এমনকি ১৯৩১ সালে লীলা নাগকে যখন গ্রেপ্তার করা হয়, তখন জেলে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'মহুয়া' কাব্যগ্রন্থটি সাথে নিয়ে নিয়েছিলেন। ১৩৩৮ বঙ্গাব্দে লীলা নাগের লেখা এক চিঠি থেকে জানা যায়—

> ৩০ ফাল্গুন, ১৩৩৮
>
> তারপর গ্রেপ্তার হবার পালা। দীর্ঘ ছয় বৎসর কেটে গেল কারান্তরালে। গ্রেপ্তার করতে এসে কোন বই সঙ্গে নিতে দিলনা সাহেব পুলিশ সুপারিন্টেনডেন্ট; শুধু মহুয়াখানি নেবার অনুমতি পেলাম। প্রতিদিন ভোর রাত্রে লক্ আপ খোলার

> সঙ্গে সঙ্গে মহুয়াখানি নিয়ে সেলের অল্প পরিসর উঠোনে বেড়িয়ে পড়তাম আমি ও আমার এক তরুণী সঙ্গিনী। পাল্লা দিয়ে মহুয়া মুখস্থ করে ভোর ও সকাল কেটে যেত। একমাস ঐ ভাবে কেটেছিল যতদিন না অন্য কোন বইপত্র আনবার অনুমতি জুটলো। কতবার পরস্পরকে বলেছি, "মহুয়া না থাকলে কি হতো!"[১৬] (মোহান্ত, ১৯৯৯, পৃষ্ঠা- ১২৬)

কারা মুক্তির পর কবিগুরু লীলা নাগকে চিঠি পাঠিয়েছিলেন। ব্রিটিশ শাসক শোষকদের অন্যায় অত্যাচারে মনোবল না ভেঙ্গে সামনে এগিয়ে যেতে আহ্বান জানান। গবেষণা থেকে জানা যায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আশীর্বাদ ও প্রেরণা লীলা নাগের জীবনে চলার পথ প্রত্যয়কে আরও দৃঢ় করেছে।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর প্রভাব

দেশের কাজের ক্ষেত্রে লীলা নাগ এবং নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর মতাদর্শের সাদৃশ্য গবেষণায় বিশেষভাবে জানা যায়। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা বিষয়ে চিন্তার সাদৃশ্য তাঁদের সম্পর্ককে সুদৃঢ় করে তোলে। ১৯৩৮ সালের স্বরাজ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে সুভাষচন্দ্র বসুর সাথে বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের পরিসর আরও বৃদ্ধি পায়।

> ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন ১৯৩০ সালে সশস্ত্র বিপ্লব এবং মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলন এই দু'টো ধারায় বিভক্ত হয়ে পরলে শ্রীমতী নাগ দু'ধারার আন্দোলনেই সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। কলকাতায় সুভাষ চন্দ্রের উপর লাঠি চার্জ এবং অমর শহিদ যতীন দাসের ওপর অমানবিক নির্যাতনের বিরুদ্ধে আয়োজিত বিশাল একটি মিছিলের নেতৃত্ব দেন।
>
> ১৯৩৮ সালে কংগ্রেসের সভাপতি হিসাবে নেতাজী সুভাষ বসু জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি গঠন করেন এবং তার কার্যকরী কমিটির মহিলা সাব কমিটির সদস্য মনোনীত হন লীলা নাগ। ১৯৩৯ সালে ঢাকায় তিনি অনিল রায়ের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। এরপর তিনি বাংলা প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিতে সদস্য হন এবং একই বছর জলপাইগুড়ি রাজনৈতিক সম্মেলন এবং দিল্লীস্ত ফরোয়ার্ড ব্লক কনভেনশনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৩৯ সালে ত্রিপুরার কংগ্রেস অধিবেশনের ঠিক আগে কংগ্রেসের অনুসারীদের মধ্যে আদর্শগত দ্বন্দ্ব দেখা দিলে তিনি নেতাজীর পথ অবলম্বন করেন এবং ফরোয়ার্ড ব্লক গঠন করে বামপন্থী আন্দোলনের দিকে ঝুঁকে পড়েন।[১৭] (হোসেন এবং অন্যান্য সম্পা. ১৯৯৮, পৃষ্ঠা- ৩২, ৩৩)

সুভাষচন্দ্র বসু, লীলা নাগ এবং তাঁর জীবনসঙ্গী অনিল রায় 'ফরোয়ার্ড ব্লক' গঠনের কাজে যুক্ত ছিলেন। ১৯৪১ সালে নেতাজী অন্তর্ধানের কিছুদিন আগে 'ফরোয়ার্ড ব্লক' পত্রিকার সম্পাদনার ভার অর্পণ করেন লীলা নাগের উপর। অন্তর্ধান থেকে নেতাজী আর ফিরে আসেননি কিন্তু তাঁর চিন্তা-চেতনা ও বিপ্লবী কর্মধারাকে লীলা নাগ এগিয়ে নিয়ে চলেছিলেন আজীবন।

২.২.৩ শামসুন নাহার মাহমুদ: জন্ম ও বেড়ে ওঠা

বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে দক্ষিণ পূর্ব বাংলার এক প্রত্যন্ত অঞ্চলে বাঙালি মুসলমান ঘরে এমন একজন কন্যা সন্তানের জন্ম হয়, যিনি পরবর্তী সময়ে স্বীয় প্রতিভা ও কর্মের দ্বারা খ্যাতি লাভ করেছিলেন। নোয়াখালী জেলার ফেনী মহকুমার অন্তর্গত পরশুরাম থানার উত্তর গুতুমা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন শামসুন নাহার মাহমুদ। তাঁর সঠিক জন্ম তারিখ নিয়ে কিছু মতভেদ আছে। কোন গ্রন্থে ১৯০৬, কোন গ্রন্থে ১৯১০ সালের উল্লেখ আছে। তবে ইব্রাহিম খাঁ ও শামসুন নাহার মাহমুদ সম্পাদিত

সারাহ কে বোল্টন ও সিরাজুদ্দীন হোসেন রচিত 'মহীয়সী' গ্রন্থে শামসুন নাহার মাহমুদের জন্ম সাল ১৯০৮ বলে উল্লেখ করা হয়। গ্রন্থটির সম্পাদনার কাজে শামসুন নাহার মাহমুদ যেহেতু নিজে জড়িত ছিলেন সেহেতু এই গ্রন্থে উল্লিখিত তাঁর জন্ম সালের উপর নির্ভর করা যুক্তিযুক্ত বলে গবেষক মনে করেন।[১৮] (পারভিন, ২০১২, পৃষ্ঠা- ১৭)

শামসুন নাহার মাহমুদ যে সময় জন্মগ্রহণ করেন তখন বাঙালি মুসলিম সমাজ অজ্ঞানতার অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল। কিন্তু তাঁর পরিবার ছিল তখনকার সময়ে শিক্ষার আলোকবাহী একটি শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত পরিবার। তাঁর প্রপিতামহ মুন্সী তমীজুদ্দীন ছিলেন নোয়াখালী জেলার একজন বিখ্যাত উকিল। মুন্সী তমীজুদ্দীনের জ্যেষ্ঠ পুত্র শামসুন নাহার মাহমুদের পিতামহ মৌলভী ফজলুল করিম ১৮৮৩ সালে ঢাকা কলেজ থেকে বি.এ. এবং ১৮৮৫ সালে বি.এল. পাশ করেন। কর্মজীবনে তিনি ছিলেন মুন্সেফ। মৌলভী ফজলুল করিমের জ্যেষ্ঠ পুত্র মোহাম্মদ নুরুল্লাহ ছিলেন শামসুন নাহার মাহমুদের পিতা। কর্মজীবনে তিনিও মুন্সেফ ছিলেন। শামসুন নাহার মাহমুদের মাতৃকুলও শিক্ষার আলোয় আলোকিত ছিল। শামসুন নাহারের প্রমাতামহ আমজাদ আলী ছিলেন চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনারের প্রথম পেশকার ও পরে ব্যক্তিগত সহকারী। আমজাদ আলীর পুত্র খান বাহাদুর আবদুল আজিজ ছিলেন শামসুন নাহার মাহমুদের মাতামহ। তিনি ছিলেন তৎকালীন বাঙালি মুসলমান সমাজে খ্যাতিমান পুরুষ। বাংলাদেশের প্রথম মুসলমান গ্র্যাজুয়েট এর মধ্যে তিনি একজন। তিনি সারা জীবন বাঙালি মুসলমানদের শিক্ষার আলোয় আনতে চেয়েছিলেন। মুসলমান মেয়েদের আঁধার থেকে আলোয় আনতে তিনি সদা সচেষ্ট ছিলেন। খান বাহাদুর আবদুল আজিজের স্মরণে, আমাদের দেশের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর 'সন্ধ্যা' কাব্যে লিখেছিলেন—

পোহায়নি রাত, আজান তখনো দেয়নি মুয়াজ্জিন,
মুসলমানের রাত্রি তখন, আর সকলের দিন।
অঘোর ঘুমে ঘুমায় তখন বঙ্গ মুসলমান,
সবার আগে জাগালে তুমি, গাইলে জাগার গান।[১৯]
(পারভিন, ২০১২, পৃষ্ঠা- ১৯)

শামসুন নাহার মাহমুদের ছয় মাস বয়সে তাঁর পিতা মোহাম্মদ নূরুল্লাহ চৌধুরী হঠাৎ মারা যান। বড় ভাই হবীবুল্লাহ বাহার তখন সবে তিন বছর। দুই শিশুসন্তান নিয়ে শামসুন নাহার মাহমুদের মা তাঁর পিতার কাছে চলে আসেন। সেখানেই থাকতে শুরু করেন। মাতামহের বাড়িতে বেড়ে উঠলেও শামসুন নাহার মাহমুদের পিতৃকুলের কিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। চাচা মোহাম্মদ ফজলুল্লাহর জনসেবামূলক মনোভাবের বৈশিষ্ট্য শামসুন নাহারের মধ্যে দেখা যায়।

মাতামহের কাছে শামসুন নাহার বেড়ে উঠতে লাগলেন। সেখানে তাঁর শিক্ষা জীবন শুরু হয়। মায়ের কাছে প্রাথমিক শিক্ষার সূচনা হয়। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণের জন্য খাস্তগীর বালিকা বিদ্যালয়ে তৃতীয় শ্রেণিতে ভর্তি হন। বিদ্যালয়ের পাশাপাশি বাড়িতেও পড়াশোনার অনুকূল পরিবেশ ছিল। বাড়িতে শামসুন নাহার মাহমুদ এবং বড় ভাই হবিবুল্লাহ বাহারের জন্য গৃহ শিক্ষক নিযুক্ত করা হয়েছিল। এই সময় থেকেই জ্ঞান চর্চার পাশাপাশি নিয়মানুবর্তিতা, শৃঙ্খলাবোধ সম্পর্কে সচেতন হতে শুরু করেছিলেন। মাত্র নয় বছর বয়সে সমাজের রক্ষণশীল প্রথার কারণে বিদ্যালয় ছাড়তে হয়েছিল তাঁকে। সমাজের রক্ষণশীল মনোভাব থাকার পরেও শিক্ষার প্রতি অদম্য ইচ্ছাকে লালন করে গিয়েছিলেন তিনি।

২.২.৪ শামসুন নাহার মাহমুদ: ব্যক্তিজীবনে পারিবারিক, আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রভাব

মাতার প্রভাব

শামসুন নাহার মাহমুদ ছয় মাস বয়সে তাঁর পিতাকে হারান। পিতা মারা যাওয়ার পরে তাঁর মা দুই সন্তানকে নিয়ে শামসুন নাহারের মাতামহের বাড়িতে চলে যান। সেখানে তাঁরা লালিত পালিত হন। শামসুন নাহার মাহমুদের জীবনে তাঁর মায়ের প্রভাব ছিল বেশি। তিনি তাঁর রচিত 'রোকেয়া জীবনী'র শেষাংশে 'যে প্রদীপ দিয়েছে শুধু আলো' শীর্ষক রচনায় মা আসিয়া খাতুন সম্পর্কে লিখেছেন,

> তিনি আমাদের মাতা, পিতা, শিক্ষক, আমাদের বন্ধু, আমাদের সহযোগী, সহকর্মী সব কিছুই, সতেরো বৎসর বয়সে তিনি বিধবা হন। তখন আমার ভাইয়ের বয়স তিন বৎসর আর আমার ছয় মাস। পিতৃস্নেহের আস্বাদ আমরা জীবনে পাইনি— মাকে নিয়েই ছিল আমাদের জগৎ। একেবারে ছেলেবেলা থেকে শুরু করে শেষ দিন পর্যন্ত সমস্ত কাজে, কি ঘরে কি বাইরে এমন কোন একটা কাজ নেই যাতে আমরা মাকে এড়িয়ে গেছি বা যেতে পেরেছি। যে কোন কাজ তাঁর পরামর্শ না নিয়ে সম্পূর্ণ করতে পারিনি। আর তিনি তাঁর সাহায্য সহানুভূতি পরামর্শ সবকিছু অহরহ প্রস্তুত করে রাখতেন আমাদের জন্য। ছেলেবেলায় আমাদের শাসনের জন্য কোন দিন গায়ে হাত তুলেছেন বা কঠোর ব্যবহার করেছেন, সে কথা একটুও মনে পড়ে না। মনে পড়ে বড় বড় লোকেদের জীবনী থেকে মা আমাদের গল্প শোনাতেন। শুধু হিন্দু নয়, শুধু মুসলমান নয় যে জাতিই হোক না কেন যে দেশেরই হোক না কেনও, যাঁর মধ্যেই তিনি মহত্ত্ব দেখতে পেয়েছেন তাঁরই কথা আমাদের মনে মুদ্রিত করে দেবার চেষ্টা করতেন। জর্জ ওয়াশিংটন , ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, স্যার সইয়দ আহমদ, মৌলানা মুহম্মদ আলী এই ধরনের বৃহৎ ব্যক্তিদের বিশেষ করে তাদের জননীদের জীবন থেকে মা শিক্ষা গ্রহণ করতেন। [২০] (বুলবুল, মাঘ, ১০ম সংখ্যা, পৃষ্ঠা- ৭৩৫)

মাতামহের প্রভাব

মাতামহ খানবাহাদুর আবদুল আজিজের কাছে শিক্ষার সব সুযোগ থাকার কারণে প্রাতিষ্ঠানিক তথা আনুষ্ঠানিক শিক্ষার সূচনা হয়। ১৯১৪ সালে শামসুন নাহার মাহমুদ চট্টগ্রামে খাস্তগীর বালিকা বিদ্যালয়ে তৃতীয় শ্রেণিতে ভর্তি হন। বিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট পাঠ্যক্রমের সাথে বাড়িতেও পড়াশুনার সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় ছিল। পাঠাভ্যাসের সাথে সাথে জীবনের আরও অনস্বীকার্য বিষয় যেমন- নিয়মানুবর্তিতা, আস্তিকতা ও শ্রদ্ধাবোধের সাথে পরিচয় হয় শামসুন নাহার মাহমুদের। কিন্তু বিদ্যালয়ের এই শিক্ষাধারা খুব বেশিদিন চলতে পারেনি। সমাজের কুসংস্কার নারীর শিক্ষার পথ রুদ্ধ করে দাঁড়ালো। ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ার সময়ই শুরু হয়ে গিয়েছিল পর্দাপ্রথার শাসন। মাত্র নয় বছর বয়সে সপ্তম শ্রেণির চৌকাঠ পার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর বিদ্যালয় ত্যাগ করতে হয়। তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পথ অবরুদ্ধ হয়ে গেল সমাজের অবরোধ প্রথার কাছে। তবে পর্দাপ্রথার জাল তাঁর শিক্ষা লাভের অদম্য ইচ্ছাকে আবৃত করেতে পারেনি। বিদ্যালয় ত্যাগ করার পর তিনি বাড়িতে নিজ তাগিদে বাংলা ও ইংরেজি ভাষা চর্চা করেন নিয়মিত। গ্রন্থাগার থেকে অন্যান্য বইও পড়তেন।

শামসুন নাহার মাহমুদের বিদ্যোৎসাহী ও সমাজসংস্কারক মাতামহ খানবাহাদুর আবদুল আজিজ সমাজের প্রতিকূলে যেয়ে তাঁর দৌহিত্রী শামসুন নাহার মাহমুদকে পর্দাপ্রথার আবরণ ছিন্ন করে আলোতে বের করতে পারেননি। এই দুঃখ তাঁর ছিল।

এত প্রতিকূলতার মধ্যেও ১৯২৬ সালে শামসুন নাহার মাহমুদ যখন প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসেবে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেওয়ার জন্য মনস্থির করলেন। পরীক্ষার তখন তিন মাস বাকি। বিদ্যালয়ের লেখাপড়ায় ছেদ পড়েছিল বহু আগেই, এমতাবস্থায় বিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট পাঠ্য বিষয়ে মনোনিবেশ করা নিতান্ত সহজ ছিল না। কিন্তু শামসুন নাহার মাহমুদ এই কষ্টসাধ্য পরিস্থিতির জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিলেন। তাঁর পড়াশুনার সহায়তার জন্য মাতামহ আবদুল আজিজ বাড়িতে একজন গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করলেন। তখনকার বাঙালি মুসলমান সমাজ সোমত্ত মেয়েকে পুরুষের সামনে বসে জ্ঞান অর্জনের অনুমতি দেয়নি। আবদুল আজিজ চাননি জোর করে সমাজের পর্দাপ্রথার বিপরীতে যেয়ে নারীশিক্ষার ক্ষীণ আশাটুকুও হারাতে। শামসুন নাহার মাহমুদকে পর্দার এক পাশে ও শিক্ষককে অন্য পাশে বসিয়ে পড়াশোনা করার ব্যবস্থা করেছিলেন। যাতে করে সমাজের নিয়ম না ভেঙ্গে, পর্দাপ্রথার অবমাননা না করে- শিক্ষা অর্জনে সমাজের বাধা না থাকে। পর্দার আড়াল থেকে শামসুন নাহার মাহমুদ শিক্ষকের কাছ থেকে পড়া বুঝে নিতেন। অনেক বাধা অতিক্রম করে ১৯২৬ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় তিন বিষয়ে তারকা চিহ্নসহ প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন তিনি। সমাজের বাধা পেরিয়ে কলেজে ভর্তি হয়ে শিক্ষার আরও ধাপ পার হওয়ার স্বপ্ন তাঁর চোখে। তাঁর সামনে তখন উজ্জ্বল ভবিষ্যতের হাতছানি। কিন্তু শামসুন নাহারের কলেজে পড়ার স্বপ্ন হোঁচট খায় তাঁর মাতামহের মৃত্যুতে। তাঁর মাতামহ আবদুল আজিজ যিনি শামসুন নাহারের শিক্ষাক্ষেত্রে প্রেরণা ও শক্তি ছিলেন, তিনি সেই বছরেই পরলোক গমন করেন। শামসুন নাহার হয়ে পরেন অভিভাবকহীন। তবু শামসুন নাহার মাহমুদ দেখতেন তাঁর বিদ্যালয়ের অন্য সম্প্রদায়ের সহপাঠীরা শিক্ষার দিকে অগ্রসরমান। তা থেকে তিনি উদ্বুদ্ধ হয়েছেন নিজের জীবনে শিক্ষা লাভের প্রতি, নিজের অগ্রগতির প্রতি। স্বপ্ন দেখেছেন সমাজের অবদমিত বেড়াজাল ছিন্ন করে আলোর ভূমিতে যাওয়ার। নিজের জীবনের আলোর পথ নিজেই খুঁজে গেছেন নিজের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায়।

বেগম রোকেয়ার প্রভাব

তাঁর জীবনবোধে বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের একটি আচ্ছন্ন প্রভাব লক্ষ করা যায়। তাঁর রচিত জীবনীমূলক গ্রন্থ 'রোকেয়া জীবনী' সম্পর্কে বিশিষ্ট সমালোচক শ্রী মোহিতলাল মজুমদার বলেছিলেন,

> ... এই 'জীবনী' যিনি লিখিয়াছেন তিনিও সামান্যা নহেন। তিনি যে এমন ভাবে এই চরিত্রটি গড়িয়া তুলিয়াছেন, তার কারণ তিনি এই জীবনকে মনে ও প্রাণে গ্রহণ করিতে পারিয়াছেন—আমরা যে চরিত্রখানি পাইয়াছি তাহার ছায়া-আলোকের সুষমা ও বর্ণ-বিন্যাসের পারিপাট্য তাঁহারই ধ্যান-কল্পনাময় সহানুভূতির পরিচয় দিতেছেন। এমন করিয়া একান্ত হইতে না পারিলে তিনি 'রোকেয়া জীবনী' রচনা করিতে পারিতেন না। যে আদর্শ ওই জীবনে ও চরিত্রে বিদ্যমান ছিল, সেই আদর্শকে তিনি নিজের অন্তরে চাক্ষুষ করিতে পারিয়াছেন—তাঁহার হৃদয়ও ঐ এক ছাঁচে গড়া। এই 'জীবনী' রচনায় যে আত্মপরিচয় তিনি দিয়াছেন তাহাও পাঠকের দৃষ্টি এড়াইবে না। আশা করি, ওই একটি মহৎ জীবন আরো অনেকের অন্তর্নিহিত মহত্ত্বকে উদ্বুদ্ধ করিবে; বেগম রোকেয়ার ভাবদেহ বহু সন্তানের জননী হইবে।[২১] (মনিরুজ্জামান, ২০০৫, পৃষ্ঠা-৩১৪, ৩১৫)

নারী সমাজের প্রতি বেগম রোকেয়ার করণীয় কাজ ও স্বপ্ন শামসুন নাহার মাহমুদ নিজের মধ্যে ধারণ করেছিলেন। বেগম রোকেয়া মারা যাওয়ার পর তাঁর অসম্পূর্ণ কাজ ও অপূর্ণ স্বপ্ন নিজের করে নিয়েছিলেন।

১৯৩২ সালে শামসুন নাহার মাহমুদ দুটি বিষয়ে– ইতিহাস ও উচ্চতর বাংলায় 'ডিস্টিংশন'সহ বি.এ. পাশ করেন। শামসুন নাহার মাহমুদের বি.এ. পাশের পেছনে বেগম রোকেয়ার উৎসাহও বিশেষভাবে স্মরণীয়। তাঁর আই.এ. পাশের পর উচ্চ শিক্ষার বিরতি দেখে বেগম রোকেয়া প্রায়ই অনুযোগ করতেন। তাই তাঁর এ সাফল্যে নারী জাগরণের পথিকৃৎ বেগম রোকেয়া যারপরনাই আনন্দিত হয়েছিলেন। শামসুন নাহার মাহমুদের এই সাফল্যে তিনি নারীদের ভবিষ্যতের মুক্তির পথ দেখতে পারছিলেন। 'আঞ্জুমানে খাওয়াতীনে'র উদ্যোগে সংবর্ধনা সভার আয়োজন করা হয়। বেগম রোকেয়া ছিলেন এই সভার উদ্যোক্তা। সভায় অভিনন্দন জানানো হয় শামসুন নাহার মাহমুদকে। অভিনন্দন বাণীতে বেগম রোকেয়া বলেছিলেন,

> আমার সেই বত্রিশ বৎসর পূর্বের 'মতিচুরে' কল্পিত লেডী ম্যাজিস্ট্রেট, লেডী ব্যারিস্টারের স্বপ্ন আজ বাস্তবে পরিণত হইতে চলিয়াছে—আমার এ আনন্দ রাখিবার স্থান কোথায়? অনেকেই আরম্ভ কাজের সমাপ্তি নিজের জীবনে দেখিতে পান না: যে বাদশা কুতুব মিনার আরম্ভ করিয়াছিলেন, তিনি তাহার শেষ দেখিয়া যাইতে পারেন নাই। কিন্তু আমার মিনারের সাফল্য আজ আমি স্বচক্ষে দেখিতে পাইলাম।[২২] (পারভিন, ২০১২, পৃষ্ঠা- ৩০, ৩১)

তিনি সেদিন আরও বলেছিলেন,

> নাহারের এ গৌরব শুধু তাঁর একার নয়। এ গৌরব আমাদের সমস্ত নারী সমাজের। অন্যদের সাথে নাহারের বি.এ পাশের তফাৎ আছে, কারণ সে পাশ করেছে স্বামী সন্তান ও ঘর সংসার সামলিয়ে, যা একজন নারীর পক্ষে কম কৃতিত্বের কথা নয়। আমি আশা করি সমাজের মেয়েরা নাহারের পথ অনুসরণ করে এগিয়ে আসবে।[২৩] (দাশপুরকায়স্থ, ১৯৯৯, পৃষ্ঠা- ১১৫)

এই অভিনন্দনের উত্তরে শামসুন নাহার বলেছিলেন,

> আমি এমন কোন কাজ করিনি যার জন্য আমি সংবর্ধনা পেতে পারি। সুযোগ সুবিধা পেলে পরীক্ষায় কৃতিত্ব অনেকেই দেখাতে পারেন। আমাদের মেয়েরা যে উচ্চশিক্ষার পথে অগ্রসর হতে পারছে না—প্রতিভার অভাব তার কারণ নয়, তার কারণ আত্মবিশ্বাসের অভাব। আমরা ভুগছি কঠিন রোগে—ইংরেজিতে যাকে বলে Inferiority Complex। ছোটবেলা থেকে শুনে আসছি আমরা ছোট, আমরা দুর্বল, আমাদের করবার নেই কিছু। নেতারা বলেছেন আমাদের শক্তি নেই, সামর্থ্য নেই, দাও Protection দাও Safeguard চাই Separate Electorate। অভিভাবকরা বসে আছেন কোথায় পান থেকে চুন খসেছে। শাস্ত্রকারেরা বসে আছেন ফতোয়ার ফাঁদ পেতে। এত যেখানে বাধা বিঘ্ন, সেখানে শিক্ষার কথা আসতে পারে কেমন করে? আজ গলা ফাটিয়ে বলবার সময় এসেছে, "আমরা ছোট নই, দুর্বল নই!' আমরা যদি ভাবতে পারি আমাদের শক্তি আছে, প্রতিযোগিতা করবার ক্ষমতা আছে—সাফল্য আপনিই এসে পড়বে। এ আমার স্বপ্ন নয়, কল্পনা নয়, আমার ব্যক্তিগত জীবন থেকেই এসব আমি বলছি, বি.এ. পরীক্ষায় Distinction পেয়েছি বলে আপনারা আমায় সংবর্ধিত করেছেন এতে আমার আনন্দ হচ্ছে যত, তার চেয়ে কুণ্ঠাবোধ করছি বেশি। কারণ এর চেয়ে বড় কাজ করে সংবর্ধনা পেতে পারলে খুশি হতাম। আমি সত্যকার আনন্দ অনুভব করব সেদিন, যেদিন শুধু বি.এ. পাশ করে আমরা আর সংবর্ধনা পাব না। অভিনন্দন পেতে হলে তখন বৃহত্তর ও মহত্তর কিছু করতে হবে।[২৪] (পারভিন, ২০১২, পৃষ্ঠা- ৩১)

শামসুন নাহার মাহমুদের এই কথা থেকে অনেকগুলো বিষয় উঠে এসেছে। শুধু শিক্ষার একের পর এক ধাপ পার হলেই হবে না, নিজের প্রতি বিশ্বাস সবচেয়ে জরুরি। পাশাপাশি আরও জরুরি– সমাজের বেবুনিয়াদ নিয়মের শৃঙ্খল ভেঙ্গে ফেলার শক্তি সঞ্চয় করা। শিক্ষার অর্জনের পরে সমাজে তার বাস্তবায়ন খুব প্রয়োজন।

শামসুন নাহার মাহমুদের পরীক্ষা পাশের বছরই নারী জাগরণের পথিকৃৎ বেগম রোকেয়া মারা যান। বিশেষ করে মুসলিম নারী সমাজের জন্য এই সংবাদ ছিল অত্যন্ত দুঃখজনক। বেগম রোকেয়ার মৃত্যুর পর শামসুন নাহার মাহমুদ বেগম রোকেয়ার অসম্পূর্ণ স্বপ্ন পূরণে সমাজের কাজে আত্মনিয়োগ করেন।

কাজী নজরুল ইসলামের প্রভাব

শুধু বেগম রোকেয়া নন, শামসুন নাহারের জীবন সংগ্রামে উজ্জীবন হয়ে পাশে থেকেছেন আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম। কাজী নজরুল ইসলাম সম্পর্কে তাঁর মনে যে শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা তা স্পষ্ট হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে তাঁর দেওয়া বক্তব্য থেকে—

> তোমরা জন্মেছ উজ্জ্বল আলোক প্লাবনের মধ্যে আর আমাদের জন্ম গভীর অন্ধকারে, অন্ধকারেই হয়েছে আমাদের যাত্রা শুরু। অন্ধকারকে ভেদ করে এসে উত্তীর্ণ হয়েছি আমরা আলোকের তীরে। আলো তোমাদের কাছে এসেছে সহজ, স্বাভাবিকভাবে। আর আমরা আলো জয় করে নিয়েছি। আলো হয়তো সেজন্যই আমাদের কাছে বেশি মূল্যবান। এইটুকু তফাৎ রয়েছে তোমাদের আর আমাদের যুগে। সে যুগের সেই আলোর অভিযানে যিনি আমাদের অনেকখানি এগিয়ে দিয়েছিলেন তিনি আমাদের 'কবিদা'। [২৫] (সুলতানা, ২০১৬, পৃষ্ঠা- ২৭)

বিদ্যালয় ছাড়ার পর ১৯১৭ সাল থেকে ১৯২৪ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ সাত বছরের সঞ্চিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সুবিন্যস্ত করে তিনি তাঁর 'পুণ্যময়ী' নামক গ্রন্থ রচনা করেন। কাজী নজরুল ইসলাম এই বইয়ের জন্য তাঁর আশিস বাণী দিয়েছিলেন।

> বদ্ধ কারার প্রাকারে তুলেছে বন্দিনীদের জয়নিশান
> অবরোধ রোধ করিয়াছে দেহ, পারেনি রুধিতে কণ্ঠে গান। [২৬]
> (দাশপুরকায়স্থ, ১৯৯৯, পৃষ্ঠা- ১১৫)

১৯২৫ সালে এই গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। তাঁর মধ্যে জ্ঞান অর্জনের যে পিপাসা এবং যে অমিত সম্ভাবনা তার প্রকাশ হয় এই রচনার মাধ্যমে।

শামসুন নাহার শিক্ষার প্রতি অদম্য ইচ্ছাকে পরাজিত হতে দেননি। সমাজ ও পরিবারের পশ্চাদপদ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তিনি হাঙ্গার স্ট্রাইক বা অনশন ধর্মঘট শুরু করেছিলেন। এমনি করেই দিনগুলো কাটছিল শামসুন নাহারের। হঠাৎ করে কাজী নজরুল ইসলামের লেখা একটি চিঠি আসলো শামসুন নাহারের কাছে। এই চিঠির কথন থেকে শামসুন নাহারের পারিবারিক টানাপোড়েনের আভাস পাওয়া যায়।

> ছেলেমানুষ তুমি পড়তে না পেরে তুমি এখনো কাঁদো।.. তোমারও যে কি হবে বলতে পারিনে। তার কারণ তোমায় চিনলেই তো চলবে না, তোমায় চালাবার দাবি নিয়ে জন্মেছেন যাঁরা তাঁদের আজও চিনিনি। আমার কেন যেন মনে হ'ল বাহার তোমার অভিভাবক নয়। ভুল যদি না করে থাকি, তা হলেই মঙ্গল। অভিভাবক যিনিই হন তোমার, তিনি যেন বিংশ শতাব্দীর আলোর ছোঁয়া পাননি বলেই মনে হল। তোমার যে আজ কাঁদতে হয় বসে বসে কলেজে পড়তে যাবার জন্যে, এও হয়তো সেই কারণেই। [২৭] (পারভিন, ২০১২, পৃষ্ঠা- ২৯)

হাবীবুল্লাহ বাহারের প্রভাব

শামসুন নাহারের বড় ভাই হবীবুল্লাহ বাহার ছোট বোনকে শিক্ষা থেকে শুরু করে সব বিষয়ে সহায়তা করতেন। শামসুন নাহার তাঁর বড় ভাইকে নিজের পথ প্রদর্শক বলে অভিহিত করেছেন তাঁর গ্রন্থের উৎসর্গপত্রে—

যাকে দিয়ে নজরুলের সঙ্গে পরিচয়
আমার জীবনের পথ প্রদর্শক, আবাল্য সহচর
সেই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বাহারকে দিলাম। [২৮]
(পারভিন, ২০১২, পৃষ্ঠা- ২৪)

এ প্রসঙ্গে সৈয়দ আলী আহসানের একটি উক্তি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক, "বাহার* না থাকলে নাহার* হতো না।"[২৯] (পারভিন, ২০১২, পৃষ্ঠা- ২১)

তাঁর বড় ভাই হবীবুল্লাহ বাহার তখন সবে কলেজে পড়ছিলেন। পরিবারে সিদ্ধান্ত দেওয়ার মতো বয়স তাঁর ছিল না। বোনের অবস্থা বুঝেও সমাজের বিরুদ্ধে লড়াই করার শক্তি তাঁর ছিল না। তাঁদের মা তখন তাঁদের দুজনেরই অভিভাবক। শিক্ষার প্রতি মেয়ের অদম্য ইচ্ছা জেনেও তাঁর মা সমাজের বিরুদ্ধে গিয়ে মেয়েকে শিক্ষার জন্য কলেজে পাঠাতে সাহস করে উঠতে পারেননি। যদিও পরিবারের সবার ইচ্ছা ছিল যে শামসুন নাহার মাহমুদ কলেজে ভর্তি হোক। কিন্তু বিধবা একজন নারী তখনকার সময়ে দাঁড়িয়ে গোঁড়া কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজের বিরুদ্ধে যাওয়ার শক্তি জোটাতে পারেননি। কিন্তু তিনি তাঁর মেয়ের মনের ইচ্ছা ও অবস্থা জানতেন।

জীবনসঙ্গীর প্রভাব

শিক্ষার প্রতি শামসুন নাহারের এই প্রবল ঝোঁক ও জেদ দেখে তাঁর বিচক্ষণ মা একটা উপায় বের করলেন। শামসুন নাহারের বিয়ের ব্যবস্থা করা হল। কিন্তু একটি শর্ত ছিল বিয়েতে। বিয়ের আগে পাত্রকে তাঁদের সাথে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হতে হয়েছিলো যেভাবেই হোক মেয়ের পড়াশোনার ব্যবস্থা করবেন। বিয়ের পর ডাক্তার ওয়াহিদ উদ্দিন মাহমুদ তাঁর দেওয়া কথা রেখেছিলেন। যদিও শামসুন নাহার বিয়ের কিছুদিন আগেই কলকাতা ডায়োসিসন কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন। চট্টগ্রাম থেকেই নিয়মিত মানি অর্ডারে বেতন পাঠাতেন কলেজে। বিয়ের পর প্রথমবার যখন তিনি কলেজে যান তখন কলেজের প্রথম বার্ষিক পরীক্ষার দুই মাস বাকি। শেষ সময় তাঁর এই উপস্থিতিতে পড়াশোনার কথা বিবেচনা করে কলেজের অধ্যক্ষ একেবারে পরের বছর থেকে কলেজে আসা শুরু করতে বললেন। তখন শামসুন নাহার মাহমুদ অধ্যক্ষ মহোদয়াকে অনুরোধ করেন যাতে তাঁকে এবছরেই কলেজে আসা ও পরীক্ষায় বসার অনুমতি দেওয়া হয়। তাঁর অনুরোধ অধ্যক্ষ মহোদয়া মঞ্জুর করেন। [৩০] (জামান (সম্পা), ২০০০, পৃষ্ঠা- ২১৭)

তখনকার সময়ে কলকাতা শহরের নামকরা ডায়োসিসন কলেজে পড়তে আসা এক মফস্বলের মেয়েকে নানান উপহাস সহ্য করতে হয়েছে। শামসুন নাহার মাহমুদ কলেজে বোরখা পরে যেতেন। এটা নিয়েও সহপাঠীদের মধ্যে চলতো নানা কৌতুক। কিন্তু একজন গৃহিণীর এরকম ভালো ফলাফল সবাইকে তাক লাগিয়ে দেয়। শামসুন নাহার মাহমুদ ১৯২৮ সালে আই.এ. পরীক্ষায় বিশ্ববিদ্যালয়ে বিংশতিতম স্থান অধিকার করেন। এই ফলাফল তাঁর সাফল্য ও মেধাশক্তির প্রমাণ। শিক্ষা জীবনের পাশাপাশি শামসুন নাহার মাহমুদের সংসার জীবনেও আরেক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। এই বছরেই তিনি প্রথম মা হন। তবে এসময় তাঁর স্বাস্থ্যের খুবই অবনতি হয়। ভগ্ন স্বাস্থ্য উদ্ধার ও সন্তান পালনের জন্য শিক্ষা জীবনে পুনরায় কিছুকাল ছেদ পড়েছিল। কিন্তু তাতে তাঁর শিক্ষা জীবনে কৃতিত্বের তেমন কোন পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়নি। পরবর্তী পরীক্ষায়ও তিনি তাঁর মেধার স্বাক্ষর রেখেছিলেন। শামসুন নাহার মাহমুদের এই সাফল্যে আড়াল থেকে যিনি প্রেরণা ও শক্তি যুগিয়েছিলেন তিনি

তাঁর স্বামী ডাক্তার ওয়াহিদ উদ্দিন মাহমুদ। বিয়ের সময় তাঁর দেওয়া কথা পালনে তিনি সর্বতোভাবে সচেষ্ট ছিলেন। বিয়ের পূর্বে শামসুন নাহারের মাতামহ আবদুল আজিজ এবং বড় ভাই হবীবুল্লাহ বাহার তাঁর শিক্ষা ও সাহিত্যের পথে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছিলেন। ১৯৩৯ সালে কলকাতায় তৎকালীন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী এ.কে. ফজলুল হকের প্রচেষ্টায় মুসলমান মেয়েদের উচ্চশিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হয় 'লেডী ব্রেবোর্ন কলেজ'। এ বছরই শামসুন নাহার মাহমুদকে প্রস্তাব দেওয়া হয় এই কলেজের বাংলার অধ্যাপক পদে যোগদান করার জন্য; কিন্তু সমস্যা ছিল তাঁর ডিগ্রি নিয়ে। তিনি ছিলেন বি.এ. পাশ; কলেজের শিক্ষকের এম.এ. ডিগ্রি থাকা আবশ্যক ছিল। 'লেডী ব্রেবোর্ন কলেজ' প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো বাঙালি মুসলমান মেয়েদের মধ্যে নিজস্ব সংস্কৃতি ও জীবনবোধ সম্পর্কে নতুনতর চেতনা সৃষ্টির যে মহান উদ্দেশ্য নিয়ে, সেই লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য স্বভাবত একজন বাঙালি মুসলমান শিক্ষকের প্রয়োজন দেখা দিয়েছিলো। ডিগ্রি না থাকার পরেও শামসুন নাহার মাহমুদকে এই পদে নিয়োগ দেওয়া হয় একটি শর্তে। শর্তটি ছিল– কলেজে শিক্ষকতায় যোগদান করার তিন বছরের মধ্যে তাঁকে এম.এ পাশ করতে হবে। তাছাড়া তাঁর সাহিত্যানুরাগ, সমাজসেবা প্রভৃতি গুণ থাকার কারণে তিনি এক্ষেত্রে প্রাধান্য পান।[৩১] (দাশপুরকায়স্থ, ১৯৯৯, পৃষ্ঠা- ১১৫)

শিক্ষকতা করার সময় শামসুন নাহার নিজেই এম.এ. ডিগ্রির প্রয়োজন অনুভব করলেন। বি.এ. পাশ করার দশ বছর পর তিনি এম.এ. ডিগ্রি নেওয়ার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলেন। যদিও তা কলেজ কর্তৃপক্ষের শর্ত সাপেক্ষ ছিল না। ১৯৪২ সালে প্রাইভেট এ পরীক্ষা দিয়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে কৃতিত্বের সাথে এম.এ. পাশ করেন। শামসুন নাহার মাহমুদের জীবনের শুরুতে সমাজের বাধা অতিক্রম করে মাতামহ খান বাহাদুর আবদুল আজিজ তাঁর শিক্ষার পথে দিশারী হয়েছিলেন। পাশাপাশি বড় ভাই হবীবুল্লাহ বাহার সর্বদা ছোট বোনের শিক্ষা ও সাহিত্য চর্চায় সর্বদা সহায়ক ছিলেন। আর বিয়ের পর শামসুন নাহারের সহধর্মী ওয়াহিদ উদ্দীন মাহমুদ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁর পাশে ছিলেন শক্তি হয়ে। শামসুন নাহার মাহমুদের জীবনে সরাসরি প্রেরণা হয়ে ছিলেন তিনি। শামসুন নাহার মাহমুদ বার বার তাঁর অবদান ও প্রেরণার কথা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করেছেন, "একমাত্র তাঁর জন্যই আমি আর দশজন শামসুন নাহারের মধ্যে মিশে যাই নাই।"[৩২] (পারভিন, ২০১২, পৃষ্ঠা- ২৪)

২.২.৫ সুফিয়া কামাল: জন্ম ও বেড়ে ওঠা

বাংলার মাটিতে ক্ষণজন্মা নারী জননী সাহসিকা সুফিয়া কামালের জন্ম হয়েছিল ১০ আষাঢ় ১৩১৮ বঙ্গাব্দ, ২০ জুন ১৯১১ খৃষ্টাব্দে। বরিশাল জেলার শায়েস্তাবাদ পরগনার নবাব পরিবার তথা নানার বাড়িতে প্রথম পৃথিবীর আলো দেখেন তিনি। 'একালে আমাদের কাল' গ্রন্থে নিজের জন্মদিন প্রসঙ্গে সুফিয়া কামাল বলেছেন, '১৯১১ সালের ২০ জুন আমার জন্মদিন। বাংলা আষাঢ় মাস। সেকালে জমিদার বাড়িতে 'পুণ্যাহ' বলে একটি পর্ব অনুষ্ঠিত হতো। আনন্দ কলরবে আমার জন্মক্ষণটি উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল বলে শুনেছি।[৩৩] (কামাল(সম্পা.), ২০০২, পৃষ্ঠা-৫৫৯)। 'সুফিসাধক নানা তাঁর নাম রেখেছিলেন সুফিয়া খাতুন। সাহিত্যিক জীবনের প্রাথমিক পর্বে প্রথম স্বামী মামাতো ভাই সৈয়দ নেহাল হোসেনের নাম অনুসারে হন সুফিয়া এন. হোসেন। এ নামটি বেগম রোকেয়ার লেখক নাম দ্বারা প্রভাবিত। প্রথম স্বামীর মৃত্যু পরে কামাল উদ্দীনের সাথে বিয়ের পর নাম হয় সুফিয়া কামাল। এ নামেই তিনি দেশ-বিদেশে পরিচিত। কখনও বেগম সুফিয়া কামালও লেখা হয়।[৩৪] (আশরাফ, ২০১০, পৃষ্ঠা- ১২ ও ১৩)

সুফিয়া কামালের জন্মের সময়টি ছিল শৃঙ্খল ভেঙে অধিকার আদায় করে নেবার, সাহসের সাথে মাথা তুলে দাঁড়াবার। ব্রিটিশ শোষকদের অত্যাচার, হিন্দু-মুসলমানের ভেদাভেদ যেদিকে ধাবিত হচ্ছিল, বলিষ্ঠ প্রতিবাদ ছিল তখন সময়ের দাবি। পাক-ভারত উপমহাদেশে ব্রিটিশ শাসকদের অত্যাচার, হিন্দু-মুসলমানের অন্তর্দ্বন্দ্ব, টানাপোড়েন, দুটি সম্প্রদায়ের মধ্যকার সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্ব— সব মিলিয়ে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের সূচনা হয় এই সময়। সমগ্র বিশ্বজুড়ে তখন একইসাথে অনেকগুলো আবহের প্রকাশ দেখা যায়– প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, রুশ বিপ্লব, বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিষ্কার, সাহিত্য-সংস্কৃতিতে নবরূপের উন্মোচন, স্বদেশী আন্দোলন, ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন, মুসলিম লীগের জন্ম, বঙ্গভঙ্গ রদ, বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্র-নজরুল এর আবির্ভাব এসব একই সুত্রে গাঁথা ছিল।

তৎকালীন সমাজে একজন নারী ছিল পদে পদে শৃঙ্খলিত। শত প্রতিবন্ধকতা উপেক্ষা করে একজন নারী সমাজের সামনে এসে দাঁড়াবে- এমন নারীমূর্তি সে সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে স্বাভাবিক কোন চিত্র নয়। শিক্ষার আলোকবর্তিকা হাতে নারীদের অসূর্যম্পর্শী অন্তঃপুরে প্রবেশ ছিল অত্যন্ত দুরূহ কাজ। যদিও শিক্ষার একটি অত্যন্ত সংকীর্ণ গণ্ডিতে পদচারণার অধিকার তাদের ছিল। তবে সেক্ষেত্রেও কথা থাকে, সম্ভ্রান্ত পরিবারের নারীদের ক্ষেত্রে এ চিত্র দৃষ্টিগোচর হয় বেশি। আর এত প্রতিবন্ধকতা, চারিদিকে শৃঙ্খল পরিবেষ্টিত সময়েই সুফিয়া কামালের জন্ম হয়েছিল। এ বিষয় নিয়ে সুফিয়া কামালের নিজের ভাষ্য বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য—

> আমরা জন্মেছিলাম পৃথিবীর এক আশ্চর্যময় রূপায়ণের কালে। প্রথম মহাযুদ্ধ, স্বাধীনতা আন্দোলন, মুসলিম রেনেসাঁর পুনরুত্থান, রাশিয়ান বিপ্লব, বিজ্ঞান জগতের নতুন নতুন আবিষ্কার, সাহিত্য ও সংস্কৃতির নবরূপ সূচনা, এ সবের শুরু থেকে যে অভাবের মধ্যে শৈশব কেটেছে তারই আদর্শ আমাদের মনে ছাপ রেখেছে সুগভীর করে।[৩৫] (কামাল (সম্পা), ২০০২, পৃষ্ঠা- ৫৭৮)

সুফিয়া কামালের পিতা ও মাতা দু'জনই ছিলেন সৈয়দ বংশের। পিতা সৈয়দ আবদুল বারী ছিলেন কুমিল্লার বিখ্যাত সৈয়দ পরিবারের। মা ছিলেন বরিশালের শায়েস্তাবাদের সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেনের কনিষ্ঠ কন্যা সৈয়দা সাবেরা খাতুন। সুফিয়া কামাল তাঁর পিতার লেখা আত্মজীবনীতে উল্লেখ করেছেন, 'সারা বাংলাদেশে বরিশাল জেলার শায়েস্তাবাদ নওয়াব পরিবারের তখন খ্যাতি। মাতামহ সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেনের কনিষ্ঠা কন্যা সৈয়দা সাবেরা খাতুন আমার মা। ত্রিপুরা জেলার শিলাউর গ্রামের সৈয়দ আবদুল বারী বি.এল আমার বাবা। আমরা এক ভাই এক বোন। আমার ভাই সৈয়দ আবদুল ওয়ালী আমার তিন বছরের বড়।'[৩৬] (হক, ২০১৩, পৃষ্ঠা- ১৬)

সুফিয়া কামালের পিতা সৈয়দ আবদুল বারী কুমিল্লা ও বাজিতপুরে আইন ব্যবসা করতেন। ওকালতিতে তিনি খ্যাতিও অর্জন করেন। ব্যবসার পাশাপাশি তিনি ছিলেন ধর্মপ্রাণ। আধ্যাত্মিক সাধনায় মগ্ন হয়ে থাকতেন তিনি। ঈশ্বর সাধনায় ধীরে ধীরে তিনি নিজেকে এতই নিবিষ্ট করেছিলেন যে সংসারে তাঁর মন লাগছিল না। হঠাৎ একদিন নিরুদ্দেশ যাত্রায় বেরিয়ে পড়েন। তখন সুফিয়া কামালের বয়স মাত্র সাত মাস। সাত আট বছর পর জানা যায় সাধকদের সাথে তিনি মক্কাশরীফ চলে গিয়েছিলেন। সেখানে আধ্যাত্মিক সাধনা করছেন। আর এদিকে স্বামীর আকস্মিক নিরুদ্দেশ যাত্রা স্ত্রী সৈয়দা সাবেরা খাতুনের জীবনে বয়ে আনে অন্ধকারময় এক অধ্যায়। দুটি সন্তান নিয়ে তিনি পিতার সংসারে আশ্রয় নিতে বাধ্য হন।

সুফিয়া কামালের শৈশব অতিবাহিত হয়েছে মাতুলালয়ে। তিনি তাঁর আত্মজীবনীতে স্মৃতিচারণ করেছেন, 'শায়েস্তাবাদের পরিবার তখন মানে-সম্মানে ধনে-জনে ঐশ্বর্যে-শিক্ষায়-সোহবতে তমিজ-তওজ্জায় বিখ্যাত। অন্দরমহলে পুরোপুরি মোগলাই আদব-কায়দা, হালচাল, শিক্ষা-সংস্কৃতি। বাইরে ইঙ্গ-বঙ্গ ফ্যাশন, কেতাদুরস্ত হালচাল। মামারা ব্যারিস্টার, ডেপুটি

ম্যাজিস্ট্রেট, নিমকের দেওয়ান, পুলিশের বড় কর্মকর্তা।[৩৭] (হক, ২০১৩, পৃষ্ঠা-২০) পরিবারের পুরুষেরা শিক্ষিত থাকার ফলে বাড়িতে ছিল গ্রন্থাগার। অভিভাবক মামা ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গা থেকে বই সংগ্রহ করে নিজের পাঠাগার সমৃদ্ধ করতেন। সাহিত্যানুরাগী মামার কাছেই অন্দরের মেয়েরা বাইরের দুনিয়া তথা সাহিত্যের খবরাখবর জানতে পারতেন। মামা রাতে বাড়ির মেয়েদের বাংলা উপন্যাস পড়ে শোনাতেন। তখনকার সময় অভিজাত মুসলিম পরিবারের পারিবারিক ভাষা ছিল উর্দু। মামার পরিবারেও তার ব্যত্যয় ঘটেনি, তাঁদের অন্দরমহলের ভাষা ছিল উর্দু। বাংলা ভাষা তেমন ব্যবহার করা হতো না। যদিও বাংলা ভাষায় গল্প-উপন্যাস পড়ে শোনানো হতো কিন্তু বাংলা ভাষার ব্যবহার পরিবারে সর্বতো ছিল না। বাংলা ভাষা ব্যবহারে তাঁদের পরিবার তথা অভিজাত মুসলিম পরিবারে ভাষিক রক্ষণশীলতা ছিল উল্লেখযোগ্য। এই ভাষিক রক্ষণশীলতার সাথে নারীদের প্রতি পারিবারিক ও সামাজিক রক্ষণশীলতাও ছিল যথেষ্ট। সুফিয়া কামালকেও মুখোমুখি হতে হয়েছে রক্ষণশীলতার, পর্দা প্রথার। মুসলিম পরিবারের কঠোর পর্দা প্রথার বাধা পার হয়ে বিদ্যালয়ে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণ করার সুযোগ ছিল না, অন্দরমহলে যৎসামান্য অক্ষরজ্ঞান পর্যন্তই সীমিত ছিল নারীদের শিক্ষার গণ্ডি। সুফিয়া কামাল তাঁর মা'র সাহায্যে বাংলা ভাষা শিখেছিলেন এবং মামার পাঠাগার থেকে বই নিয়ে পড়তেন। বাড়িতে আসতো তখনকার সাহিত্য পত্রিকা। সংস্কৃতিমনস্ক ও উদারচেতা মামার পাঠাগারের বিভিন্ন গল্প-উপন্যাস, আখ্যান, সাহিত্য পত্রিকা পড়ার মধ্য দিয়ে সাহিত্যের প্রতি ভালোলাগা তৈরি হয়েছিলো। তৈরি হয়েছিলো সাহিত্য পাঠের রুচিবোধ, উন্মোচিত হয়েছিলো চিন্তা করার নতুন দিগন্ত। পরিচিত হয়েছিলেন কাজী নজরুল ইসলামের কবিতা ও তাঁর লেখায় তারুণ্যের উদ্দামতার সাথে। তাঁর রচিত দেশাত্মবোধক রচনা থেকে সুফিয়া কামাল দেশপ্রেমের দীক্ষা নিয়েছিলেন। এমনকি কাজী নজরুল ইসলামের লেখা গল্প পড়ে সুফিয়া কামালের মনে সাধ হল তিনিও একটি গল্প লিখবেন। তিনি লিখেছিলেন তাঁর প্রথম গল্প 'সৈনিক বধূ'। পরে এই গল্পটি 'কেয়ার কাঁটা' গল্প সংগ্রহে প্রকাশিত হয়েছিলো। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা পড়ে তিনি কবিতার প্রতি ঝুঁকে পড়েন। তখন বেগম রোকেয়া, মতাহেরা বানু, সারা তৈফুর প্রমুখও লিখছেন। তাঁদের লেখা ছিল সুফিয়া কামালের লেখার অনুপ্রেরণা।

নবাব বাড়ির অনুশাসন ভাঙার পর সম্ভ্রান্ত রক্ষণশীল মুসলিম পরিবারের পুত্রবধূ হয়ে সামাজিক কাজে ঘরের বাইরে যাওয়ার পরিণতি নেতিবাচক হওয়ার আশঙ্কাই বেশি ছিল, সুফিয়া কামালের তা অজানা ছিল না। এ সকল ভয়ের বাধা তাঁকে বিরত রাখতে পারেনি মানুষের পাশে দাঁড়ানোর মতো মানবিক কাজ থেকে। সুফিয়া কামাল নিজে তাঁর সামাজিক কাজের সূচনা সম্পর্কে 'একালে আমাদের কাল' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন—

> বরিশালে ফিরে এলাম। তখন লেখাও চলল আর শুরু হলো সেই সময়েই সামান্য করে সমাজ সেবার কাজ। সুকুমার দত্তের স্ত্রী বি-এ পাশ করে বরিশাল এলেন- মাতৃমঙ্গল, শিশুসদন, সমিতি করলেন। বরিশাল বালিকা বিদ্যালয়ের মধ্যে সভা হত, বোরখা পরে বদ্ধ ঘোড়ার গাড়ী করে সাবিত্রী দিদির সাথে যেতাম। কী হাস্যকর সে যাত্রা। তবুও কী অসীম তৃপ্তি লাভ করতাম অসহায়া, অশিক্ষিতা মায়েদের শিশুদের সাথে। আরও হিন্দু মহিলারা ছিলেন। আমার তখনও কৈশোর কাটেনি।[৩৮] (কামাল(সম্পা), ২০০২, পৃষ্ঠা-৫৮০)

সুফিয়া কামাল শুধু সমাজের এ ধরনের কাজেই অংশগ্রহণ করেননি, রাজনৈতিক দিক দিয়েও সচেতন ছিলেন তিনি। মহাত্মা গান্ধী ১৯২৫ সালে বরিশালে চরকা কাটতে আসেন। সুফিয়া কামালেরও খুব ইচ্ছে হল চরকা কাটবেন, কিন্তু প্রকাশ্য সভায় যাওয়া তাঁর জন্য এতটা সহজ ছিল না। তাঁর প্রবল ইচ্ছার কাছে সব বাধা তুচ্ছ হয়ে গেল, তাঁর সহকর্মীরা নিয়ে গেলেন সভায়। তারপর নিজ হাতে সুতা কেটে গান্ধীজীর হাতে দিয়েছিলেন।

সুফিয়া কামাল সমাজকর্মের পাশাপাশি রাজনৈতিকভাবে সচেতন ছিলেন এবং রাজনৈতিক কাজে অংশগ্রহণও করেছেন। নিখিল ভারত কংগ্রেসের অধিবেশনে একমাত্র মুসলিম মহিলা সদস্য হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সুফিয়া কামাল। এ প্রসঙ্গে মালেকা বেগম তাঁর 'রাজপথে জনপথে সুফিয়া কামাল' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন—

> ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় নিখিল ভারত কংগ্রেসের অধিবেশন বসলো। ৩২ ঘোড়ার টানা গাড়িতে চড়ে সভাপতি শ্রী মতিলাল নেহেরু এসে নামলেন সভা প্রাঙ্গণে। অভ্যর্থনা সমিতির একমাত্র মুসলিম মহিলা সদস্য হিসেবে সুফিয়াকে (সুফিয়া কামাল) পরিচয় করিয়ে দেয়া হলো কংগ্রেস সভাপতির সঙ্গে। সেখানে লেডি অবলাবসু, সরলা দত্ত, বিজয় লক্ষ্মী পণ্ডিত ছিলেন।[৩৯] (বেগম (সম্পা), ১৯৯৭, পৃষ্ঠা-৩১)

সুফিয়া কামাল ছিলেন প্রথম বাঙালি মুসলিম নারী যিনি এরোপ্লেনে চড়েছিলেন। এ জন্য বেগম রোকেয়া তাঁকে নিজ বাড়িতে অনেক গণ্য-মান্য মানুষের সামনে সম্বর্ধনা দিয়েছিলেন। এ বিষয়ে তিনি তাঁর 'একালে আমাদের কাল' গ্রন্থে স্মৃতিচারণ করেছেন—

> আমাকে বললেন 'ফুলকবি' তুইত এখন আসমানে উঠতে শিখেছিস, তোকে ত একটা মালা দিতে হয়, এই বলে আমার গলায় একটা মালা দিলেন। এই ওনার বাড়ীতে প্রথম সম্বর্ধনা অনুষ্ঠান হয়। কত মানুষ ছিলেন, লেডী গজনবী ছিলেন। রেণু চক্রবর্তীর মা ছিলেন। এরা সবাই ছিলেন। সবাইকে দাওয়াত টাওয়াত দিয়ে একত্রিত করে আমাদের একেকজনকে মালা পরালেন উনি। বললেন যে আমার জীবনে যা পারি নাই তা তোরা করবি, আমি এইটা আশা করি।[৪০] (কামাল (সম্পা), ২০০২, পৃষ্ঠা- ৫৮৭)

স্বামী-কন্যা নিয়ে সুখের সংসার বেশিদিন সুফিয়া কামালের নিয়তিতে ছিল না। নেহাল হোসেন আকস্মিক ক্ষয় রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। তখন ক্ষয় রোগের চিকিৎসা ছিল না। বহু চেষ্টার পরেও নেহাল হোসেনের স্বাস্থ্যের কোন উন্নতি হয়নি; সুফিয়া কামাল তখন হতাশায় বিপর্যস্ত। তারপর ১৯৩২ সালের ১১ ডিসেম্বর সৈয়দ নেহাল হোসেনের মৃত্যু হয়। স্বামীর অকাল মৃত্যুতে সুফিয়া কামালের সংসার জীবন তছনছ করে দিয়েছিলো। বাল্যকালে পিতৃহীন সুফিয়া কামাল বিয়ের পর নেহাল হোসেনের সাথে জীবনকে নতুনভাবে দেখতে শুরু করেছিলেন, কিন্তু তখনই নেহাল হোসেন চলে গেলেন চিরতরে। যেন পায়ের নিচের মাটি সরে গেছে। ২১ বছরের বিধবা সুফিয়া কামাল কলকাতা ছেড়ে শিশু কন্যাকে নিয়ে চলে এলেন শায়েস্তাবাগে। কিন্তু সেখানে তিনি দিনে দিনে তাঁদের গলগ্রহ হয়ে উঠলেন। তাঁর উপস্থিতি সবার কাছে ছিল অনভিপ্রেত। মায়ের জীবনের প্রতিচ্ছবি দেখতে পেলেন নিজের জীবনে। অপমান আর করুণায় দুঃসহ করে তুলেছিল তাঁর জীবন। দ্বিতীয়বার বিয়ের জন্য পরিবার থেকে চাপ দেওয়া হচ্ছিলো। এ অবস্থায় তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন শিশু কন্যা ও মাকে নিয়ে কলকাতায় চলে যাবেন। সেখানে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে নিজের মতো করে বাঁচবেন। কলকাতায় চলে এলেন তিনি; শুরু করলেন কঠোর জীবন সংগ্রাম। এই জীবন যুদ্ধের মধ্য দিয়ে তৈরি হচ্ছিল জীবনের মজবুত ভিত্তি। পরবর্তীতে এই সংগ্রামের যোদ্ধারূপে প্রত্যক্ষ হয় তাঁর দৃঢ়, ঋজু, অটল এক ব্যক্তিত্ব। কলকাতা করপরেশনে সামান্য মাইনের কাজ করে সংসার চালান। এরপর কাজ নিলেন এক স্কুলে। সেখানেও তাঁর সংগ্রাম চলেছে নিরন্তর। নিজের সাথেই নিজেকে গড়ে তোলার এক লড়াই। কিন্তু দারিদ্রের কশাঘাত আর নিঃসঙ্গ জীবন তাঁকে শারীরিক ও মানসিকভাবে ক্লান্ত করে তুলেছিল। সুফিয়া কামালের শুভানুধ্যায়ী মীজানুর রহমান উদ্যোগী হয়ে প্রগতিবাদী সাহিত্যিক কামাল উদ্দিন খান কে সুফিয়াকে বিয়ে করার জন্য অনুরোধ করেন, কামাল উদ্দিন খান সুফিয়ার সাহিত্য প্রতিভার অনুরক্ত পাঠক ছিলেন। সুফিয়ার চরিত্রের দৃঢ়তা ও জীবন সংগ্রামকে তিনি শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। তিনি সুফিয়াকে বিয়ে করতে সম্মত হলেন। কামাল উদ্দিনের সাথেও সুফিয়া কামালের দাম্পত্য জীবন পূর্বের মতই ছিল। পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা আর জীবনের প্রতি আধুনিক ও উদার মানসিকতা ছিল তাঁদের দাম্পত্যের মূলে। দু'জনের বন্ধন আজীবন এমনি ছিল।

২.২.৬ সুফিয়া কামাল: ব্যক্তিজীবনে পারিবারিক, আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রভাব

মাতার প্রভাব

সুফিয়া কামাল দেখেছেন তাঁর মা অস্তিত্বের জন্য লড়াই করে চলছিলেন নানাভাবে। স্বামীর নিরুদ্দেশযাত্রা তাঁর ও তাঁর সন্তানের জীবনকে ফেলে দেয় অনিশ্চয়তার মধ্যে। মামার অভিভাবকত্বে বেড়ে উঠলেও সুফিয়া কামালকে তাঁর পিতার অভাব পীড়া দিত। তাঁর পিতা না থাকায় মাকে দেখেছেন বৈরি পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে। দেখেছেন বিরূপ অবস্থায় কিভাবে তাঁর মা দৃঢ়ভাবে অবিচল থেকে সাহসের সাথে ধৈর্য ধরেছেন এবং সহনশীল থেকেছেন। সুফিয়া কামালের জীবনে মায়ের প্রভাব অসীম। তাঁর মায়ের জীবন থেকেই তিনি তাঁর চরিত্রের দৃঢ়তা, ধৈর্য ও সহনশীলতার পাঠ নিয়েছিলেন। তিনি মায়ের সম্পর্কে বলেছেন, "মাটিকে বাদ দিয়ে ফুলগাছের যেমন কোন অস্তিত্ব নেই, আমার মাকে বাদ দিয়ে আমারও তেমন কোনো কথা নেই।"[৪১] (হক, ২০১৩, পৃষ্ঠা- ২১)

জীবনসঙ্গীর প্রভাব

(সৈয়দ নেহাল হোসেন)

সুফিয়া কামালের প্রথম গল্প লেখার দুঃসাহস মামার বাড়ির অন্দরমহলে থেকে হলেও তার প্রকাশ ঘটে বিয়ের পরে শায়েস্তাবাদ ছেড়ে বরিশাল যাওয়ার কারণে। মামাতো ভাই সৈয়দ নেহাল হোসেনের সাথে সুফিয়া কামালের বিয়ে হয় বারো বছর বয়সে। সৈয়দ নেহাল হোসেন তখন কলকাতায় আইনের ছাত্র ছিলেন। কলকাতার শিক্ষাদীক্ষায় জীবনকে সুন্দর ও বৃহৎ পরিসরে দেখার ঔদার্য তাঁর ছিল। তিনি ছিলেন আধুনিক চেতনাসম্পন্ন ও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ। তাঁদের দাম্পত্য জীবনেও তিনি তাঁর আধুনিক ও উদারমনস্কতার সঞ্চার করেছিলেন। পরস্পরের প্রতি তাঁরা ছিলেন শ্রদ্ধাশীল। তিনি তাঁর স্ত্রীর সাহিত্যের প্রতি ভালোলাগা ও তাঁর ইচ্ছাকে মূল্যায়ন করতেন। তিনি নিজেই সুফিয়া কামালের লেখাটি নিয়ে যান 'তরুণ' পত্রিকার সম্পাদকের কাছে এবং তাঁর উদ্যোগেই লেখাটি ছাপানো হয়। সুফিয়া কামালের লেখালেখির যাত্রা শুরু হয় তাঁর প্রেরণাতেই। তখনকার সময় নবাব বাড়ির রক্ষণশীলতা পার করে মেয়েদের লেখা পত্রিকায় ছাপানোর বিষয়টি প্রায় এক অভাবনীয় বিষয় ছিল। সে অবস্থায়, নবাব বাড়িতে বেড়ে ওঠা একটি মেয়ে নবাব বাড়িরই অনুশাসন ভাঙার স্পর্ধা দেখিয়েছে তাঁর স্বামীর সহযোগিতায়। লেখাটি পত্রিকায় প্রকাশ হলে সুফিয়া কামালের বড় মামা তথা শ্বশুর প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হয়ে তাঁদের ডেকে পাঠান বরিশালে। পরিবারের নিয়ম কানুন উপেক্ষা করে পুত্রবধূর এহেন স্পর্ধা তাঁকে ক্রুদ্ধ করেছিলো। শ্বশুরবাড়ির সেই বিরূপ অবস্থা থেকে সুফিয়া কামালকে আগলে রেখেছিলেন তাঁর স্বামী নেহাল হোসেন। এই ঝঞ্ঝায় তিনি বর্ম হয়ে তাঁর স্ত্রীর সাথে ছিলেন। পরিবারের বিরূপ প্রতিক্রিয়ায় হয়তো সুফিয়া কামালের সাহিত্য চর্চা বন্ধ হয়ে যেত কিন্তু নেহাল হোসেন চাননি সুফিয়া কামালের সাহিত্য চর্চা বন্ধ হয়ে যাক। তিনি আজীবন সাহিত্য চর্চায় উৎসাহ দিয়েছেন ও সহায়তা করে গেছেন তাঁর স্ত্রীকে। দেশের রাজনীতি ও পরাধীন অবস্থা নিয়ে নেহাল হোসেন কথা বলতেন স্ত্রীর সাথে। তাঁকে সচেতন করতেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অত্যাচার-অধীনতার বিরুদ্ধে।

বরিশালে থাকার সময় সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে আড়াল থেকে সর্বদা সহায়তা করে গেছেন সৈয়দ নেহাল হোসেন। তাঁর সম্মতি, সাহায্য ও উৎসাহ ছাড়া সুফিয়া কামাল নবাব পরিবার ও সমাজের রক্ষণশীলতাকে পার করে এতসব কাজে সম্পৃক্ত হতে পারতেন না। কিছু কাল পর নেহাল দম্পতি বরিশাল থেকে কলকাতায় চলে আসেন। সেখানে সুফিয়া কামাল আবার নবোদ্যমে সাহিত্য চর্চা শুরু করেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মদিনে শুভেচ্ছা চিঠি পাঠানো, সুফিয়া কামালের লেখার প্রশংসা করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্র থেকে শুরু করে, কবি গুরুর আমন্ত্রণে জোড়াসাঁকোতে যেয়ে দেখা করার ক্ষেত্রে সর্বদা সুফিয়া কামালের পাশে ছিলেন স্বামী নেহাল হোসেন।

(কামাল উদ্দিন খান)

সৈয়দ নেহাল হোসেনের অকাল প্রয়াণে সমাজ সংসারের যুদ্ধ, দারিদ্র্যের কষাঘাত, নিঃসঙ্গতার যন্ত্রণায় তখন সুফিয়া নেহাল হোসেন প্রায় শ্রান্ত। এক সময়ে তিনি শারীরিক ও মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে বেশ কিছুদিন শয্যাশায়ী ছিলেন। শুভানুধ্যায়ী মীজানুর রহমান উদ্যোগী হয়ে সুফিয়া এন হোসেনের দ্বিতীয় বিয়ের জন্য চেষ্টা করেন। তখন তাঁর পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন প্রগতিবাদী সাহিত্যিক কামাল উদ্দিন খান। কামাল উদ্দিন খান সুফিয়া এন হোসেনের কাব্য প্রতিভার প্রতি অনুরক্ত ও শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। জীবন সংগ্রামে অকুতোভয় সুফিয়া কামালের চরিত্রিক দৃঢ়তা তাঁকে আকর্ষণ করেছিলো। বিয়ের পর সুফিয়া নেহাল হোসেন সুফিয়া কামাল নাম ধারণ করেন।

আধুনিক বিজ্ঞানমনস্ক যুক্তিবাদী এবং সর্বোপরি মানবতাবাদী একজন মানুষ ছিলেন কামাল উদ্দিন খান। সুফিয়া কামালের সামাজিক কর্মযজ্ঞ, সাংস্কৃতিক চেতনা, দেশের কাজ এবং কাব্য চর্চা– প্রত্যেক কাজে তিনি পাশে ছিলেন। কামাল উদ্দিন খান সরকারি চাকরি করতেন। সুফিয়া কামালের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও দেশের কাজের প্রেক্ষিতে পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর রোষানলে পড়তে হয়েছে একাধিকবার। ষাটের দশকে আইয়ুব শাসকগোষ্ঠী তাঁর উপর চাপ সৃষ্টি করেছিলো। কিন্তু পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর সাথে তিনি কখনো আপস করেননি। বহুবছর তাঁর পদোন্নতি হয়নি সে কারণে। তিনি ব্যক্তিস্বাধীনতায় বিশ্বাস করতেন। তিনি সুফিয়া কামালকে তাঁর সকল কাজে উৎসাহ ও প্রেরণা জুগিয়ে গেছেন নিজেকে অগোচরে রেখে। এমনকি নিজের সাহিত্য চর্চাও উৎসর্গ করেছিলেন যেন সুফিয়া কামালের সাহিত্য জীবনের ঔজ্জ্বল্য যেন এতটুকুও ক্ষীণ না হয় সে কথা ভেবে। দেশ ও সমাজ-সংস্কৃতির সব কাজে তিনি সুফিয়া কামালের সহায়তা করেছেন। উপলব্ধি করেছেন দেশ ও সমাজের ইতিবাচক পরিবর্তনে এসব কাজের গুরুত্ব অপরিসীম।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রভাব

সুফিয়া কামালের জীবনে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব শৈশব থেকেই। কবিগুরু তাঁর মনে সবসময় এক আলাদা আসনে আসীন ছিলেন। ১৯৩৭ সালে তিনি রবি ঠাকুরের ৭৬ তম জন্মজয়ন্তীতে 'পঁচিশে বৈশাখ' কবিতাটি উপহার পাঠান। কবিগুরু এ কবিতার কৃতজ্ঞতাস্বরূপ একটি পত্র-কাব্য উপহার দেন তরুণী সুফিয়া কামালকে।

বিদায় বেলায় রবির পানে
বনশ্রী যে অর্ঘ্য আনে
অশোক ফুলের করুণ অঞ্জলি।
আভাস তারি রঙীন মেঘে
শেষ নিমেষে রইবে লেগে
রবি যখন অস্তে যাবে চলি।[৪২]
(হক, নাসিমা, ২০১৩, পৃষ্ঠা- ৩৫)

কবিগুরুর এই উপহার সাহিত্য রচনার পথে সুফিয়া কামালকে উৎসাহ দিয়েছে। পরের বছর ১৯৩৮ সালে প্রকাশিত হয় সুফিয়া কামালের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'সাঁঝের মায়া'। 'সাঁঝের মায়া' কাব্যগ্রন্থের প্রকাশক বেনজীর আহমদ রবীন্দ্রনাথকে এই গ্রন্থের একটি কপি পাঠান। বিশ্বকবি এ কাব্যগ্রন্থকে স্বাগত জানিয়ে চিঠি লিখেন। "তোমার কবিত্ব আমাকে বিস্মিত করে। বাংলা সাহিত্যে তোমার স্থান উচ্চে এবং ধ্রুব তোমার প্রতিষ্ঠা। আমার আশীর্বাদ গ্রহণ করো।"[৪৩] (হক, নাসিমা, ২০১৩, পৃষ্ঠা- ৩৪)

কবিগুরুর আশীর্বাদ সুফিয়া কামালের জীবনে সার্থক হয়েছে। বাংলাসাহিত্যে ধ্রুব আসন করে নিতে সক্ষম হয়েছেন তিনি। রবি ঠাকুরের এই ধারণা হয়তো তরুণ কবির আত্মবিশ্বাস দৃঢ় করতে সাহায্য করেছে। এতো সময় ধরে বাংলা সাহিত্যে কোন নারী সাহিত্য রচনা করেছেন বলে জানা যায়নি। তাঁর রচনায় কল্পনাচিত্র, গভীর ধ্যানমগ্নতা, প্রকৃতির ছোঁয়া ও মুগ্ধতা খুঁজে পাওয়া যায়; যেখানে গবেষকের মনে হয়েছে অনেকক্ষেত্রে তিনি কবিগুরুর লেখার ও চিন্তা ধারার প্রচ্ছন্ন প্রভাবে প্রভাবিত হয়েছেন।

কাজী নজরুল ইসলামের প্রভাব

সুফিয়া কামাল সাহিত্য রচনার প্রথম প্রেরণা পান জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের 'হেনা' গল্প পড়ার মধ্য দিয়ে। পরবর্তীকালে কাজী নজরুল ইসলামের সান্নিধ্য ও উৎসাহ-প্রেরণায় সুফিয়া কামালের সাহিত্যবোধ ধীরে ধীরে প্রস্ফুটিত হয়েছে। সুফিয়া কামাল নিজে তা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করেছেন-

> আমার জীবনে অগ্নিবীণার বিদ্রোহী কবি নজরুল এসেছিলেন অনাবিল আনন্দ-আলোকের মতো, তাঁর মমতা-মধুর স্নেহোজ্জ্বল দৃষ্টি আমার দিকে পরেছিল বলে আজ সকলের কাছে পরিচিত হতে পেরেছি। নয়তো সেই পরদানশীন খান্দানী ঘরের অন্তরাল হতে বাইরে আসার পথ আমি বুঝতে পেতাম না।[৪৪] (সুলতানা, ২০১১, পৃষ্ঠা- ৯২)

বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম সুফিয়া কামালের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'সাঁঝের মায়া'র ভূমিকা লিখে দিয়েছিলেন। সুফিয়া কামালকে তিনি সাহস জুগিয়েছেন– চিরায়ত প্রথার বাইরে এসে তাঁর যোগ্যতাকে বিশ্বের সামনে তুলে ধরার জন্য।

> কবি এন. হোসেন বাঙলার কাব্যগগনে উদয়তারা। অস্ততোরণ হতে আমি তাঁকে যে বিস্মিত মুগ্ধচিত্তে আমার অভিবন্দনা জানাতে পারলাম, এ আনন্দ আমার স্মরণীয় হয়ে থাকবে।[৪৫] (হক, ২০১৩, পৃষ্ঠা- ৩৪)

কবি সুফিয়া কামাল কাজী নজরুল ইসলামকে নিয়ে অনেক কবিতা লিখেছেন। তাঁর 'মায়া কাজল' কাব্যগ্রন্থটি তিনি বিদ্রোহী কবিকে উৎসর্গ করেছিলেন। 'উদাত্ত পৃথিবী' কাব্যগ্রন্থের 'বিষের বাঁশীর কবি' কবিতায় কাজী নজরুল ইসলামের প্রশস্তি গেয়েছেন সুফিয়া কামাল—

তোমারে ভোলেনি, ভুলিবে না কেহ, তোমার জনম-তিথি
উৎসব করে তোমারে স্মরিয়া, শ্রদ্ধা ভকতি-প্রীতি
এনেছে তোমারে ভালোবেসে দিতে চিত্ত উজাড় করি
আর অকপট মঙ্গলাশিস তোমার জীবন ভরি। [৪৬]
(সুফিয়া কামাল কবিতা সমগ্র, ২০১৩, পৃষ্ঠা- ৯০)

কবি তাঁর লেখায় ও জীবনে অন্যায়ের বিরুদ্ধে, উৎপীড়নের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর প্রেরণা পেয়েছেন নজরুল ইসলামের লেখা থেকে। সমাজে স্বেচ্ছাচার, জোরজুলুম, ব্যভিচারের বিরুদ্ধে দৃপ্ত কণ্ঠে প্রতিবাদ জানিয়েছেন মসির মাধ্যমে।

রবীন্দ্রনাথ এবং কাজী নজরুল ইসলাম এই দুই মহান মানুষের সান্নিধ্য ও উৎসাহ সুফিয়া কামালকে পথ চলতে সাহায্য করেছে। তাঁদের রচনার বিষয়, ভাব, দৃষ্টি এসব কিছুই সুফিয়া কামালের লেখায় ও তাঁর জীবনে অখণ্ডভাবে প্রভাব রেখেছে। একই সাথে তাঁকে মুগ্ধ ও অভিভূত করেছে।

বেগম রোকেয়ার প্রভাব

কবি সুফিয়া কামালের জীবনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কাজী নজরুল ইসলাম ছাড়াও যাঁর প্রভাব উল্লেখযোগ্য তিনি হচ্ছেন বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন। তাঁর লেখায়, চিন্তা চেতনায় বেগম রোকেয়ার ভাবাদর্শ বিশেষভাবে প্রভাব ফেলেছে। বেগম রোকেয়াকে তিনি তাঁর 'মৃত্তিকার ঘ্রাণ' কাব্যগ্রন্থটি উৎসর্গ করেছেন। তাঁকে নিয়ে লিখেছেন নানা কবিতা। তাঁর লেখার মধ্য দিয়ে বেগম রোকেয়ার প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা, মুগ্ধতা, অনুরাগ ইত্যাদি বিষয় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। নারী জাগরণের পথিকৃৎ-দিশারী বেগম রোকেয়া ছিলেন কবি সুফিয়া কামালের জীবনে আলো, যে আলো অন্ধকারে পথের দিশা দেয়। তাই সুফিয়া কামাল কখনো তাঁকে বলেছেন 'আলোর দুহিতা' কখনো বলেছেন 'আলোর ঝর্ণা' কখনো বলেছেন 'অমৃত কন্যা'।

বন্দিনী যত নন্দিনী তব
মুক্ত আলোর লভুক স্বাদ,
জাগায়ে তুলিল প্রাণের বন্যা
টুটাল আঁধার তিমির বাঁধ।
(আলোর দুহিতা/ উদাত্ত পৃথিবী)[৪৭]
(সুফিয়া কামাল কবিতা সমগ্র, ২০১৩, পৃ-৮৯)

বেগম রোকেয়া সমাজের প্রতিটি মানুষ বিশেষ করে নারীদের অন্ধকারের আলোর দিশা হয়ে থাকবেন সর্বকালে, কালোত্তীর্ণ হয়ে। বেগম রোকেয়ার স্বপ্ন মানুষকে নিয়ে যাবে আলোর পথে কবি সুফিয়া কামালের প্রত্যাশা এই, তাই তিনি বলেছেন-

তোমার নামের দিব্য বিভার জ্যোতিতে উঠেছে ভরে।

নিত্য কালের স্মরণীয়া হয়ে নিত্য দিনের মাঝে
তোমার সে নাম মহীয়সী হয়ে বাজে।
অন্ধ ঘরে বন্ধনে এক আলোক পিয়াসী পাখি
একদা সে এক আলোক দূতীর সঙ্কেতে উঠি ডাকি।
(আলোর ঝরনা/ প্রশস্তি ও প্রার্থনা)[৪৮]
(সুফিয়া কামাল কবিতা সমগ্র, ২০১৩, পৃষ্ঠা- ১৯৫)

জীবনসঙ্গীর প্রভাব (কামাল উদ্দিন)

সুফিয়া কামালের সামাজিক কর্মকাণ্ড, দেশের কাজ, কাব্যচর্চা প্রত্যেক কাজে কামাল উদ্দিন তাঁর স্ত্রীর প্রেরণা ছিলেন। সামাজিক ও দেশের কাজে সুফিয়া কামাল অনেকসময় সংসারে সময় দিতে পারেননি তখন কামাল উদ্দিন সামলে নিয়েছেন কোন রকম অভিযোগ ছাড়া। কামাল উদ্দিন ছিলেন সরকারি চাকুরে। সুফিয়া কামালের সামাজিক কর্মকাণ্ডের ফলে সরকারের রোষানলে পড়তে হয়েছিলো তাঁকে। ষাটের দশকে আইয়ুব শাসনামলে কামাল উদ্দিন খান কে চাপ সৃষ্টি করা হয়েছিলো। বলা হয় তাঁর স্ত্রীকে সামাজিক কর্মকাণ্ড থেকে নিবৃত্ত করতে না হলে তাঁর চাকরি ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হবে। কিন্তু কামাল উদ্দিন খান তাঁর স্ত্রীর কাজে বাধা দেননি; তিনি ব্যক্তিস্বাধীনতায় বিশ্বাস করতেন। তাঁর চাকরি ক্ষেত্রে অসুবিধা হওয়ার পরেও তিনি এই বিষয়ে সরকার পক্ষের সাথে আপস করেননি। এত বাধা বিপত্তির মধ্যেও সুফিয়া কামালের পাশে সব সময় পাশে ছিলেন নীরবে নিভৃতে।

২.৩ লীলা নাগ, শামসুন নাহার মাহমুদ ও সুফিয়া কামাল: সমসাময়িক সমাজ প্রেক্ষাপট

১৯০০ সাল থেকে ১৯১১ সালের মধ্যে লীলা নাগ, শামসুন নাহার ও সুফিয়া কামালের জন্ম হয়েছিলো একই ভূখণ্ডে। তাই তিনজনের সমসাময়িক সামাজিক প্রেক্ষাপট প্রায় একই। এখানে সামগ্রিকভাবে তাঁদের সমসাময়িক সমাজ চিত্র ও প্রেক্ষাপট নিয়ে আলোচনা করা হল।

বিশ শতকের শুরু থেকেই সারা পৃথিবী জুড়েই পরিবর্তনের ছোঁয়া লেগেছিল। তখন ভারতবর্ষও নানা চড়াই উৎরাই পার হয়ে ধাবিত হচ্ছে পরিবর্তনের দিকে। ১৯০০ সালের দিকের এতদঞ্চলের ভূ-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট লক্ষ করলে আমরা দেখতে পাই আজকের এই বাংলাদেশ নামে কোন স্বাধীন ভূখণ্ড তখন ছিল না। পূর্ব বাংলা নামে একটি প্রদেশ ছিল। ব্রিটিশ শাসকদের হাতে ছিল এর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের মাধ্যমে ব্রিটিশ শাসকবর্গ এ দেশের মানুষের মধ্যে ভাঙ্গন ধরাতে চেয়েছিল। তবে ১৭৬৫ সালের পর থেকেই বিহার ও উড়িষ্যা বাংলার অন্তর্ভুক্ত ছিল। ফলে বৃটিশ সরকারের নিকট সরকার প্রশাসনিক এলাকা হিসেবে বাংলা অতিরিক্ত বড় মনে হয়েছিলো এবং বৃটিশ সরকারের পক্ষে এটির সুষ্ঠু শাসনক্রিয়া পরিচালনা করা দুরূহ হয়ে পড়ে। বঙ্গভঙ্গের সূত্রপাত এখান থেকেই। মূলত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য— বাংলা প্রেসিডেন্সি ভেঙে বাংলাকে দুর্বল করার চেষ্টা করা হয়। বিশেষ করে বাংলার আন্দোলনরত জাতীয়তাবাদী স্বদেশী আন্দোলনের শক্তিকে বৃটিশশক্তি হুমকি হিসাবে নিয়েছিল। বৃটিশদের আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদস্বরূপ বৃটিশ পণ্য বয়কটের প্রস্তাব গৃহীত হয়। ক্রমান্বয়ে এই আন্দোলন বৃটিশ-বিরোধী জাতীয়তাবাদী অন্দোলনে রূপ লাভ করে। এই সময় ভারতের

অন্যান্য প্রদেশে এর প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে। এ ক্ষেত্রে ব্রিটিশ বিভেদ নীতি দিয়ে মুসলমানদেরকে এই আন্দোলন থেকে সরিয়ে রাখার চেষ্টা করে ব্রিটিশরা ব্যর্থ হয়। ১৯১১ সালে এদেশের মানুষের তীব্র আন্দোলনের ফলে তা সম্ভব হয় নি, বঙ্গভঙ্গ রদ করতে হয়েছিল।

ব্রিটিশ সরকারের সিদ্ধান্তের বিপরীতে যেয়ে বঙ্গভঙ্গ রদ করানো, এ ধরনের জাতীয় সাফল্য চলমান বিবিধ আন্দোলনকে তথা নারী আন্দোলনকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-১৯১৮), প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠা, দক্ষিণ আফ্রিকার অহিংস সত্যাগ্রহ আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়ে মহাত্মা গান্ধীর ভারতে ফেরা এবং জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্ব লাভ— এ সমস্ত বিষয়ের প্রভাবে দেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থা বদলে যেতে থাকে। পাশাপাশি সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টাতে শুরু করে। নারীজাতিকে পুরুষের পাশে সমানভাবে মেনে নিতে না পারলেও নারীকে এবার অবগুণ্ঠন ছিন্ন করে আলোতে আসতে বাধা দেয়া সহজ হবে না, এটা পুরুষ জাতি বুঝতে শুরু করেছিল। পুরুষ সমাজ বুঝতে শুরু করেছিল তাদের নিজেদের স্বার্থেই। নারী জাতি যদি তাদের যোগ্যতা নিয়ে সমাজের কাজে আসে তবে সম্মিলিত প্রচেষ্টায় কাজকে আরও সুন্দর করে তোলা যাবে। এ উপলব্ধি থেকেই নারী জাতির দুঃখ-দুর্দশা, পশ্চাদপদতা নিয়ে রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর শত প্রতিকূলতার বিরুদ্ধস্রোতে দাঁড়িয়ে আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন। বিধবা বিবাহ আইন, সতীদাহ প্রথা উচ্ছেদ এ ক্ষেত্রে উল্লেখ্য পদক্ষেপ। নারীজাতির উপর পুরুষসমাজ আরোপিত যে ভিত্তিহীন শৃঙ্খলের ঘেরাও, যে বর্বরতা— তা তাঁদের লজ্জার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। মানবিক বোধসম্পন্ন সচেতন মানুষ হিসেবে ব্যক্তিগত দায়িত্ববোধ তাঁদেরকে তাড়িত করেছে।

নারী সমাজের প্রতি হেয় মন্তব্য ও প্রচলিত সংস্কারের বিরুদ্ধে প্রথম রাজা রামমোহন রায় সোচ্চার হয়ে বলেন,

> স্ত্রীলোকদিগের বুদ্ধির পরীক্ষা কোন কালে লইয়াছেন যে, তাহাদিগকে অল্পবুদ্ধি কহেন? আপনারা বিদ্যাশিক্ষা, জ্ঞানোপদেশ স্ত্রীলোককে প্রায়ই দেন নাই, তবে তাহারা বুদ্ধিহীন হয় ইহা কীরূপে নিশ্চয় করেন? নারী বিশ্বাসঘাতক বলে শাস্ত্রে যে কথা রয়েছে সে বিষয়ে রামমোহন রায় বলেছেন, 'এ দোষ পুরুষে অধিক কি স্ত্রীতে অধিক উভয়ের চরিত্র দৃষ্টি করিলে বিদিত হইবেক।' নারীর হেয় সামাজিক অবস্থানের প্রসঙ্গে তিনি ক্ষুব্ধ হয়ে বলেছেন, 'একজন নারী একাধারে রাঁধুনি, শয্যাসঙ্গিনী এবং বিশ্বস্ত গৃহরক্ষী মাত্র'। বাংলার পচনশীল কৌলীন্য প্রথা জর্জরিত পারিবারিক পরিবেশে নারীর অবস্থা বর্ণনা করতে যেয়ে তিনি বলেছেন, 'নারীর সহ্যশক্তির মূলে আছে ধর্ম ভীতি। অসহায় নারীর সহিষ্ণুতার সুযোগে সমাজ নারীর প্রতি পশুসুলভ ব্যবহার করে।' স্পষ্ট ভাষায় তিনি বলেছেন, 'সকলের স্ত্রী দাস্যবৃত্তি করে।' সমাজকে শুধু দোষারোপ করেই তিনি চুপ থাকেননি। নারী নির্যাতনের মূল কারণ খোঁজ করে দেখিয়েছেন অর্থনৈতিকভাবে নারী অন্যের উপর নির্ভরশীল বলেই নারীর অধিকার থেকে বঞ্চিত থাকছে। বলেছেন, নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য দরকার অর্থনৈতিকভাবে নারীকে স্বাবলম্বী করা।[৪৯] (বেগম, ১৯৮৯, পৃষ্ঠা- ১৪)

'রামমোহন যুগের শেষে ইয়ং বেংগল গোষ্ঠীর আবির্ভাব। ইয়ং বেংগল গোষ্ঠীর নেতা হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও বলেছেন, শিক্ষার সাহায্যেই মেয়েরা নির্যাতনের হাত থেকে মুক্তি পাবে। তাঁর সহযোগিতায় বাঙালিদের উদ্যোগে প্রথম ইংরেজি পত্রিকা *পার্থেনন*- এ বন্দিনী নারীদের মুক্তির জন্য আকাঙ্ক্ষার লক্ষ্যে নারী শিক্ষা বিষয়ে বক্তব্যের প্রচার দেখা যায়।[৫০] (বেগম, ১৯৮৯, পৃষ্ঠা- ১৮)

সে যুগে নারীজাতির জন্য ঘরের বাইরে শিক্ষাগ্রহণ অসম্ভব কাজ তো ছিলই, ঘরের ভিতরে পর্দার আড়ালে থেকেও শিক্ষার অনুমতি যতটুকু ছিল তা অত্যন্ত সংকীর্ণ ও সীমিত। নারীরা ঘরের কাজ করবে, সন্তান উৎপাদন করবে, রান্নাবান্না করবে- এটাই ছিল নারীর জন্য উপযুক্ত কাজ; অন্তঃপুরের আলোহীন বৈচিত্র্যহীন জীবনই ছিল তার যোগ্য প্রাপ্তি। কিন্তু দিন যত যাচ্ছিল রাষ্ট্র, অর্থনীতি, রাজনীতি সবই নতুনরূপে সমাজকে, সমাজের মানুষকে পরিবর্তনের দিকে ধাবিত করছিল। নারীর

যে আর ঘরের মধ্যে অন্ধকারে থাকা চলবে না, তারই শঙ্খনিনাদ চারিদিকে ধ্বনিত হতে লাগলো। যে সমাজপতিরা এই শঙ্খধ্বনিকে ধর্মের নিয়ম, আবহমান কালের চিরন্তন প্রথা বলে তখনো নারীর শিক্ষাকে অবদমিত করার চেষ্টা করছিল, আন্দোলনের ফলে তাদের এই মিথ্যা বাধা অতিক্রম করে নারীরা শিক্ষার আলোতে এসেছেন। নারীদের জন্য বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা করা হল, বিদ্যালয়গুলো ছিল বৃটিশ সরকারের উদ্যোগে, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের উদ্যোগে, এবং বিশিষ্ট বিদ্যানুরাগী ব্যক্তিবর্গের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায়। [৫১] (বেগম, ১৯৮৯, পৃষ্ঠা ৬২)

তখনকার নারীর শিক্ষা অবদমনের এই সমাজে লীলা নাগ শিক্ষার সুযোগ পেয়েছিলেন তাঁর পরিবার ও তাঁদের মতাদর্শের কারণে। তখনকার সময়ে লীলা নাগের পরিবার প্রগতিশীল মতাদর্শ তথা ব্রাহ্ম সমাজের দর্শনে বিশ্বাসী ছিল। কিন্তু তখনকার অধিকাংশ পরিবার নারীর শিক্ষা নিয়ে, করণীয় নিয়ে প্রগতিশীল চিন্তা ধারায় ভাবতে পারেনি। পরিবারের পূর্ণ সম্মতি ও সহযোগিতা থাকার পরেও তিনি সমাজের কাছে নানা সময় বাধা প্রাপ্ত হন। তৎকালীন সমাজে মেয়েদের ঘরকন্যা করার যে সময়, সে সময় বই নিয়ে স্কুল কলেজে যাওয়া সমাজ ভালো চোখে দেখেনি। তারপরেও শত বাধা উপেক্ষা করে লীলা নাগ তাঁর শিক্ষা জীবনে ছেদ পড়তে দেননি। ১৯২১ সালে তিনি উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসলে তাঁকে প্রথমে ভর্তি করা হয়নি। আইনে নারীদের ভর্তির সুযোগ থাকলেও নারীদের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ ছিল না। শিক্ষার প্রতি তাঁর একাগ্রতা দেখে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বাধ্য হয় নারীদের শিক্ষার উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করতে এবং তাঁকে ভর্তি করতে। পূর্ব বাংলায় উচ্চ শিক্ষায় ভর্তির ক্ষেত্রে নারীদের পথ সুগম করেছিলেন তিনি। শিক্ষা অর্জন করেছিলেন বলেই লীলা নাগ নারীদের প্রতি সমাজের ভালো-মন্দ সিদ্ধান্তগুলো বুঝতে শিখেছিলেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রী থাকাকালীন ঢাকায় তৈরি করেন 'দীপালি সংঘ'। নারীদের শিক্ষা ও হাতের কাজের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছিলো এই দীপালি সংঘের মাধ্যমে। নারীর ভোটাধিকার অর্জন ছিল দীপালি সংঘের প্রধান কার্যক্রম। নারীদের শিক্ষার জন্য গড়ে তুলেছিলেন ১২টি বিদ্যালয়। দেশভাগের পর পাকিস্তান শাসনামলে 'নারী শিক্ষা মন্দির' বিদ্যালয়টির নাম বদলে রাখা হয়েছে শের-এ-বাংলা মহিলা মহাবিদ্যালয়, ও 'দীপালি হাইস্কুলে'র নাম বদলে করা হয়েছে কামরুন্নেসা বিদ্যালয়। এই নামে অদ্যাবধি শিক্ষা বিস্তারে অবদান রেখে চলছে লীলা নাগের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত সেই বিদ্যালয়গুলো। আমাদের সমাজে একজন নারীর শিক্ষা লাভের দ্বার উন্মোচন হওয়া মানে আরও নারীর জন্য সে পথ সুগম হওয়া। শুধু শিক্ষার ক্ষেত্রে নয়, ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধেও সোচ্চার কণ্ঠে নারীরা সামনে এসেছিল, এই চিত্রও বিরল।

ছাত্রী অবস্থাতেই শুরু হয়েছিলো লীলা নাগের বিপ্লবী জীবন। ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে তিনি স্বক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিলেন। ১৯২৮ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেস সম্মেলনে বাংলার বিপ্লবী সংগঠনের দলনেতারা যোগদান করেন। লীলা নাগও গিয়েছিলেন সেখানে। ১৯৩০ সালে তাঁর নেতৃত্বে গড়ে ওঠে 'মহিলা সত্যাগ্রহ কমিটি'। তাঁর উদ্যোগে ঢাকায় মহিলারা মহাত্মা গান্ধীর লবণ সত্যাগ্রহ আন্দোলনে যোগদান করে। এছাড়াও ১৯৩০ সালে মাস্টারদা সূর্যসেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের মামলার জন্য ঢাকা থেকে তিনি প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করে পাঠান। ভারতের প্রথম বিপ্লবী শহিদ প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার তাঁর দীপালি সংঘতে প্রথম বিপ্লবী পাঠ গ্রহণ করেন। ১৯৩১ সালে তিনি গ্রেফতার হন। মুক্তি পান ১৯৩৭ সালে। তাঁর সামাজিক কাজ থেমে থাকেনি, নতুন করে শুরু করেছিলেন ছাড়া পেয়ে। ১৯৪১ সালে ঢাকায় ভয়াবহ দাঙ্গায় নির্যাতিত মানুষের পাশে সবসময় ছিলেন তিনি।

বিশ শতকের গোড়া থেকেই পরিবর্তনের ঢেউ উঠেছিল সর্বত্র। পরিবর্তনের সেই ঢেউয়ের একটা ঝাপটা ভারতবর্ষের বুকেও লাগে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার সংগ্রাম রূপ নিয়েছিল অন্য এক ভয়ানক অবয়বে। দ্বিজাতিতত্ত্বের

ভিত্তিতে ভারত ও পাকিস্তানের জন্ম ভারতবর্ষকে দ্বিখণ্ডিত করে। ১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্ট মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর 'Direct Action Day' তে কলকাতা, ঢাকা ও নোয়াখালী অঞ্চলে হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয়। এতে অগণিত মানুষ প্রাণ হারায়, নির্যাতিত হয়। লীলা নাগ নিজের জীবনের পরোয়া না করে হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে নির্যাতিত মানুষের জীবন বাঁচানোর জন্য, নিরাপদ আশ্রয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। সেখানে মহাত্মা গান্ধীর সাথে তাঁর দেখা হয়। মহাত্মা গান্ধী লীলা নাগের জীবনী শক্তিকে সেদিন প্রত্যক্ষ করেছিলেন। দেশভাগের ক্ষত ভারতবর্ষের মানুষকে দাঁড় করিয়েছিল একে অপরের বিরুদ্ধে। ১৯৪৭ সালে পাঞ্জাব ও বাংলা ভেঙ্গে ভারত পাকিস্তান হওয়ার সময় আবার শুরু হয় দাঙ্গা। সংখ্যালঘুদের দেশত্যাগের পালা শুরু হয়ে গেছিল আগে থেকেই। এই দাঙ্গায় প্রাণ হারায় হাজার হাজার মানুষ। দাঙ্গা কবলিত নির্যাতিত নারীদের আশ্রয়, ভিটা-মাটিহীন উদ্বাস্তু মানুষদের পাশে দাঁড়ানোর আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন তিনি। দেশভাগের সময় কলকাতা থেকে অনেক মানুষ ঢাকায় চলে আসে। তাঁদের মধ্যে সুফিয়া কামাল ছিলেন। তাঁকে সেসময় নিরাপদ আশ্রয় দিয়ে সাহায্য করেছিলেন লীলা নাগ।[৫২] (শত বর্ষের শ্রদ্ধাঞ্জলি(সম্পা), ২০০৩, পৃষ্ঠা-১২-১৪)

নারী আন্দোলনে প্রথম পর্যায় থেকে হিন্দুসমাজের নারীদেরকে যতটা সম্মুখে দেখা গেছে, মুসলিম নারীসমাজ ততটা নয়। মুসলিম নারীসমাজের এই পশ্চাদপদতা নিয়ে যিনি প্রথম ভেবেছিলেন তিনি প্রাতঃস্মরণীয় বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন। প্রথম নিখিল ভারত মুসলিম নারী সম্মেলন হয়েছিল ১৯১৫ সালে। যেখানে উপস্থিত ছিলেন মুসলিম সমাজের প্রগতিবাদী শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীদের স্ত্রী এবং আত্মীয় মহিলারা। নারীজাতির জন্য শিক্ষার আলো যে কতটা জরুরি এ বিষয়টি ছিল সম্মেলনের প্রতিপাদ্য বিষয়। বঙ্গীয় নারীদের তথা সমগ্র মুসলিম নারীজাতির অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বেগম রোকেয়া নিরলস সংগ্রাম করে গেছেন। তাঁর এই শুভ প্রয়াসকে শুধু কোন একটি জাতি বা সম্প্রদায়ে গণ্ডিবদ্ধ করা যাবে না। তিনি শুধু একজন উদ্যোক্তা নন, তিনি হলেন প্রেরণা, আশা।[৫৩] (বেগম, ১৯৮৯, পৃষ্ঠা ৭১ ও ৭২)

১৯০৮ সালে শামসুন নাহার মাহমুদ জন্ম গ্রহণ করেন নোয়াখালী জেলায়। তাঁর পিতা মারা যাওয়ার পর তিনি তাঁর মায়ের সাথে মাতামহের বাড়িতে চলে আসেন। তখন সেখানে মুসলমান মেয়েদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সুযোগ ছিল না। পর্দা প্রথার কারণে মুসলিম মেয়েরা ছিল অসূর্যস্পর্শী। বাড়ির বাইরে যেয়ে মেয়েদের লেখাপড়া করার অনুমতি ছিল না। পর্দা প্রথার আওতায় থেকে মেয়েরা অন্দরমহলে যৎসামান্য শিক্ষার সুযোগ পেত। এমতাবস্থায় পরিবারের সহযোগিতা থাকার পরেও সমাজের প্রথা ভেঙ্গে বাড়ির মেয়েদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা যায়নি। এমনটাই ঘটেছিল শামসুন নাহার মাহমুদের সাথে। মাতামহ শিক্ষানুরাগী এবং সমাজসেবী হলেও বাড়ির মেয়েদের বাইরে যেয়ে শিক্ষার বিষয়ে সমাজের বিরোধিতা করতে পারেননি। শামসুন নাহার মাহমুদ যখন মাত্র নয় বছর বয়সী তখন তাঁকে বিদ্যালয় ত্যাগ করে চলে আসতে হয়। তাঁর পরিবার সমাজের রক্ত চক্ষুকে উপেক্ষা করতে পারেননি। নিজের অদম্য ইচ্ছা শক্তির জোরে শামসুন নাহার মাহমুদ তাঁর শিক্ষা চালিয়ে যান। মাতামহের লাইব্রেরি থেকে বই নিয়ে নিজের মতো করে লেখাপড়া করেছেন। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় ছেদ পড়ার অনেক পরে তিনি প্রাইভেটে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেওয়ার যে কঠিন সংকল্প নিয়েছিলেন, তা সামাজিক প্রতিবন্ধকতার কারণে প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছিলো। পর্দার আড়ালে বসে শিক্ষকের কাছে পড়াশোনা করতে হয়েছে। এমনকি গণিতের জ্যামিতিও পর্দার আড়াল থেকে বুঝে নিতে হয়েছিলো শামসুন নাহারকে। তবু সমাজের কঠোর অনমনীয় প্রথার বিরুদ্ধে তিনি জয়ী হয়েছিলেন। প্রবেশিকা পরীক্ষায় তিনি কৃতিত্বের সাথেই পাশ করেছিলেন।

তৎকালীন সমাজের কাছে মেয়েদের ভালো ফলাফল কোন উল্লাসের বিষয় ছিল না। মেয়েরা থাকবে ঘরকন্যার কাজে। বাইরে যেয়ে কাজ তাদের সাজে না। তাই কলেজে ভর্তির সময় যখন এলো তখনো শামসুন নাহার মাহমুদ বাধা পেয়েছেন

পরিবার ও সমাজের কাছে। সমাজের নিয়ম ভাঙার সাহস তখন খুব কম মানুষেরই ছিল। শিক্ষার প্রতি নিজের স্পৃহাকে হারতে দেননি শামসুন নাহার মাহমুদ। জেদ করে হলেও তাঁর পথে তিনি চলেছিলেন। যদিও বিয়ে না হলে তাঁর পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়া আরও কঠিন হয়ে পড়তো। তবু তিনি হার মেনে নেননি সমাজের কাছে।

বিয়ের পরে তাঁর লড়াইয়ে পাশে পেয়েছিলেন তাঁর স্বামীকে। ওয়াহিদ উদ্দিন মাহমুদ তাঁর স্ত্রীর শিক্ষার কাজে সব সময় সহায়ক ভূমিকা রেখেছিলেন। ঘর সংসার সামলে লেখাপড়া করে তাঁর প্রেরণাতেই শামসুন নাহার মাহমুদ বি.এ পাশ করেছিলেন। এরপর কলেজে শিক্ষকতা শুরু করেন তিনি। প্রায় দশ বছর পরে তিনি এম.এ পাশ করেছিলেন। পাশাপাশি তাঁর সাহিত্য চর্চাও এগিয়ে চলেছিল।

তৎকালীন বিখ্যাত মাসিক 'সওগাত'— এ বলা হয়েছিল,

> শামসুন নাহারের ন্যায় প্রতিভাশালিনী বিদূষী মহিলা সাহিত্য ক্ষেত্রে দেখা দিয়েছেন, ইহা মুসলিম বঙ্গ সাহিত্যের বিশেষ আশার কথা। বঙ্গ সাহিত্য তরুণী লেখিকার অবদানে যথেষ্ট পরিমাণে সমৃদ্ধ হইবার আশা রাখে।[৫৪] (পারভিন, ২০১২, পৃষ্ঠা- ৪০)

শামসুন নাহারের জীবনে শিক্ষা, সাহিত্য ও কাজের প্রেরণা হিসেবে কাজী নজরুল ইসলামের প্রভাব ছিল অসামান্য। কবি তাঁর লেখা বিভিন্ন চিঠিতে শামসুন নাহারকে প্রেরণা দিতেন অন্ধকারে নিমজ্জিত নারী সমাজকে শিক্ষার আলোয় নিয়ে আসার জন্য। কবির লেখা সেই চিঠিতে ফুটে উঠেছে তখনকার সমাজে নারীদের প্রতি অবিচারের চিত্র।

> আমাদের দেশের মেয়েরা বড় হতভাগিনী। কত মেয়েকে দেখলাম কত প্রতিভা নিয়ে জন্মাতে, কিন্তু সব সম্ভাবনা তাদের শুকিয়ে গেল সমাজের প্রয়োজনের দাবিতে। ঘরের প্রয়োজন তাদের বন্দিনী করে রেখেছে। এত বিপুল বাহির যাদের চায়, তাদের ঘিরে রেখেছে বার হাত লম্বা আট হাত চওড়া দেয়াল। বাহিরের আঘাত ঐ দেয়ালে বারবার প্রতিহত হয়ে ফিরল; এর বুঝি ভাঙন নেই অন্দর হতে মার না খেলে। তাই নারীদের বিদ্রোহিনী হতে বলি। তারা ভেতর হতে দ্বার চেপে ধরে বলছে—আমরা 'বন্দিনী'। দ্বার খোলার দুঃসাহসিকতা আজ কোথায়? তাকেই চাইছেন যুগদেবতা।[৫৫] (পারভিন, ২০১২, পৃষ্ঠা- ৫২)

১৯১১ সনে যখন সুফিয়া কামালের জন্ম তখন বরিশালে একজন মুসলমান মেয়েও প্রাতিষ্ঠানিকভাবে শিক্ষিত ছিল না। নারীসমাজ ছিল অবরোধবাসিনী, কুসংস্কার ও অজ্ঞানতার অন্ধকারে নিমজ্জিত।[৫৬] (জাহাঙ্গীর, ১৯৯৯, পৃষ্ঠা ৩১) কিন্তু তারও আগে থেকেই বেজে উঠতে শুরু করেছিল নারী আন্দোলনের দামামা। ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই নারীরা কংগ্রেসের সদস্য হতে থাকে। কংগ্রেসের প্রথম নারী সদস্যদের মধ্যে স্বর্ণকুমারী দেবী, কাদম্বিনী দেবী, পণ্ডিত রমাবাঈ প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। তবে নারীদের সদস্য করা হলেও প্রতিনিধি করা হত না। ১৮৮৯ সালে কংগ্রেসের পঞ্চম অধিবেশনে বোম্বাই শহরে ছয়জন মহিলা ডেলিগেট যোগদান করেন। ১৮৯০ সালে কংগ্রেসের ষষ্ঠ অধিবেশনে মহিলা প্রতিনিধিদের প্রস্তাব উত্থাপন ও আলোচনা করার অধিকার স্বীকৃত হয়। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, খোদ ইংল্যান্ডে তখনো রাজনৈতিক দলে নারীর এধরনের রাজনৈতিক অধিকার স্বীকৃত ছিল না। সেদিক থেকে এই পাক-ভারত উপমহাদেশের নারী সমাজের অবস্থান নিঃসন্দেহে সমৃদ্ধ ছিল মানতে হবে। এবং এই পদক্ষেপে পুরুষের সহায়ক মনোভাব না থাকলে নারীর এ উদ্যোগ সফলকাম হতে পারত না। জাতীয় কংগ্রেসের এই পদক্ষেপের ক্ষেত্রে দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।[৫৭] (বেগম, ১৯৮৯, পৃষ্ঠা ৬৩)

এ বিষয়ে ভারতের নারী আন্দোলনের অন্যতম নেত্রী অ্যানি বেসান্ত যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য দিয়েছেন তা উদ্ধৃত করছি:

> One of the delegates Mrs. Kadambini Ganguly was called on to move the vote of thanks to the chairman, the first woman who spoke from the Congress platform, a symbol that Indian's freedom would uplift India's womanhood.[৫৮] (বেগম, ১৯৮৯, পৃষ্ঠা ৬৩)

নারীরা রাজনৈতিক সচেতনতা নিয়ে রাজনৈতিক সংগ্রামের পাশাপাশি নারীসমাজের মুক্তির জন্য সংগঠন ও আন্দোলন করেছেন। কিন্তু সমাজ সংস্কারমূলক আন্দোলনের ফলে নারীর যতটুকু অধিকার অর্জন সম্ভব হয়েছিল, বাস্তবে তা প্রয়োগ করা যাচ্ছিল না। অধিকার সচেতন কয়েকজন নারী এ সংকটের বিষয়টি অনুধাবন করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য হচ্ছেন স্বর্ণকুমারী দেবী (১৮৫২-১৯৩২), কৃষ্ণভাবিনী দাস, সরলাদেবী চৌধুরানি (১৮৭২-১৯৪৫), বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন (১৮৮০-১৯৩২) প্রমুখ।[৫৯] (বেগম, ১৯৮৯, পৃষ্ঠা ৬৩)

নারীসমাজ নানাধরনের নির্যাতন, নিপীড়ন, নিষ্পেষণের বিষাক্ত নাগপাশ ছিন্ন করার জন্য মুক্তির আশায় প্রবলভাবে আলোড়িত-আন্দোলিত হলেও অর্থনৈতিকভাবে পরনির্ভরশীলতার কারণে নির্যাতন সহ্য করতে হয় তাদের। অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা ও মুক্তি না আসলে সামাজিক ও পারিবারিক নির্যাতন-নিষ্পেষণ থেকে মুক্তি সম্ভবপর নয়। তাই নারী জাতিকে পরাধীনতা ও শৃঙ্খলিত অবস্থা থেকে মুক্ত করার লক্ষ্যে অর্থনৈতিক মুক্তি তথা তার কর্মসংস্থানের প্রতি গুরুত্ব দেয়া শুরু হয়।

সমাজের নারীদের যখন এরকম কোণঠাসা অবস্থা, তখন বঙ্গীয় মুসলিম নারীসমাজ তথা সমগ্র নারীসমাজের প্রতিনিধি হয়ে সম্মুখে এলেন সুফিয়া কামাল। সমাজ ও পরিবারের বৈরি মনোভাব উপেক্ষা করে নিজেকে সামনে এগিয়ে নিয়ে গেছেন আলোর দিশারী হয়ে। পারিবারিক কঠোর শাসন ও রক্তচক্ষু কখনোই তাঁর সাহিত্য চর্চা, সামাজিক কাজে অংশগ্রহণ, নারী আন্দোলন, রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ ইত্যাদি কাজকর্মকে দমিয়ে রাখতে পারে নি। বরিশালে থাকার সময় যুক্ত ছিলেন সুকুমার দত্তের স্ত্রী সাবিত্রী দেবীর শিশুসদন ও মাতৃমঙ্গল সমিতির সঙ্গে। একটি মুসলিম কিশোরী মেয়ে সমাজের অসহায় মানুষদের জন্য নিবেদিত হয়ে কাজ করছে, তখনকার সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে এটি একটি বিরল ঘটনা। এই কাজের মধ্য নিয়ে সুফিয়া কামাল সমাজকর্মে দীক্ষিত হন। ১৯২৫ সালে মহাত্মা গান্ধী যখন বরিশালে এসেছিলেন তখন তিনি মুসলিম পরিবারের গৃহবধু হয়েও হিন্দু গৃহবধূর মত সেজে চরকায় সূতা কেটে প্রকাশ্য জনসভায় গান্ধীজীর হাতে সূতা তুলে দেন। এই সুখস্মৃতির কথা তিনি তাঁর 'একালে আমাদের কাল' গ্রন্থে বলে গেছেন—

> এর পরে গান্ধীজীর চরকা কাটার ধুম, চরকাও কাটলাম, গান্ধী এলেন বরিশালে। তাকে দেখবার কি আগ্রহ, কিন্তু প্রকাশ্য সভায় যাওয়া আমার পক্ষে যে কত অসম্ভব। রজনী কাকীমা, নলিনী কাকীমারা খুব পর্দানশীন না হলেও প্রকাশ্য সভায় যাওয়া নিয়ে বহু ভাবনা চিন্তা করে আমাকেও তাদের মতো কাপড় পরিয়ে সিঁদুর পরিয়ে সাথে নিয়ে গেলেন। তবে রক্ষা যে পরদায় থাকতাম বলে বাইরের কেউ আমাকে চিনত না। দেখলাম সেই সময় গান্ধী মহাত্মাকে। নিজের হাতের কাটা সুতা তাঁর হাতে দিতে পেরে সেদিন কী যে আনন্দ ও গৌরব বোধ করেছিলাম। সেই দিনের সে সব স্মৃতি অক্ষয় সম্পদ আমার।[৬০] (কামাল (সম্পা), ২০০২, পৃষ্ঠা- ৫৮০)

একজন মুসলিম মেয়ে তথা মুসলিম গৃহবধূ হিসেবে এই ছদ্মবেশের পরিণাম কতটা নেতিবাচক হতে পারে তা তিনি ভালোভাবেই অবগত ছিলেন। তারপরও প্রকাশ্যে এই দুঃসাহসিক কাজ করতে পেরেছিলেন সমাজ ও দেশের প্রতি তাঁর ভালোবাসা ও কর্তব্যবোধ প্রগাঢ় ছিল বলেই। সমাজের প্রতি, দেশের প্রতি নারীদের করণীয় সম্পর্কে কৈশোর থেকেই তাঁর মনোভাব দৃঢ়ভাবে গড়ে ওঠে। পরিবারের পরিবেশ, তাঁর মায়ের ব্যক্তিত্ব, পারিবারিক কৌলীন্য সবকিছুই তাঁর মানস গঠনে প্রভাব বিস্তার করে। কলকাতায় বেগম রোকেয়ার সান্নিধ্য লাভ করা সুফিয়া কামালের জীবনে একটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ দিক। তাঁর কিশোরী মনে বেগম রোকেয়ার ব্যক্তিত্ব ও তাঁর কাজ গভীরভাবে রেখাপাত করে যায়। তাই বেগম রোকেয়ার আদর্শ ধারণ করে অনগ্রসর মানুষের মুক্তির জন্য সারাজীবন তিনি কাজ করে গেছেন নিরলসভাবে। সুফিয়া কামালকেই গণ্য

করা হয় বেগম রোকেয়ার যোগ্য উত্তরসূরি হিসেবে। মুসলিম নারী জাগরণের সূচনালগ্নে যাঁদের আবির্ভাব লক্ষ করা যায় তাঁদের মধ্যে সুফিয়া কামাল সর্বকনিষ্ঠ। তিনিই বাংলার নারীসমাজের জন্য বেগম রোকেয়ার তৈরি পথে এতটা দূর পর্যন্ত পাড়ি দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। এবং এই পথ পাড়ি দেওয়া মোটেও সহজ ছিল না।[৬১] (বেগম, ১৯৮৯, পৃষ্ঠা ৭৮)

সেই সময়ে কোন মুসলিম নারী সাহিত্য চর্চা করবে এটা একটা বিস্ময়কর ব্যাপার ছিল। তাও বাংলাভাষায় সাহিত্য চর্চা! যা পরবর্তী সময়ে প্রশংসার দাবি রাখে। বাংলা ভাষার প্রতি সুফিয়া কামালের গভীর ভালোবাসা ছিল। মায়ের মুখে শোনা বাংলাসাহিত্যের গল্প-কবিতাগুলো তাঁর মনে স্থান করে নেয়। তাঁর লেখা প্রথম রচনা 'সৈনিক বধূ' গল্পটি তাঁর স্বামী সৈয়দ নেহাল হোসেন 'তরুণ' পত্রিকায় ছাপার ব্যবস্থা করেন। স্বামীর প্রেরণায় সুফিয়া কামালের মনের ঐকান্তিক ইচ্ছাসমূহ বাস্তবে রূপ পাবার পথ করে নেয়। যে কোনো পরিস্থিতিতে সাহিত্য চর্চার বিষয়ে তাঁর স্বামী সর্বদা তাঁর পাশে ছিলেন। লেখালেখির কথা জানাজানি হলে নেহাল দম্পতিকে অনেক তিরস্কার ও দুর্ব্যবহারের সম্মুখীন হতে হয়। কিন্তু তাঁরা পিছিয়ে যান নি কখনো। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিমন্ত্রণে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে সুফিয়া কামালকে সাথে নিয়ে যান সৈয়দ নেহাল হোসেন। স্বামী যদি তাঁকে পাশে থেকে কাজে উৎসাহ ও প্রেরণা না দিতেন তাহলে হয়তো সুফিয়া কামালের পক্ষে এতটা পথ পাড়ি দেওয়া সম্ভব হত না। বেগম রোকেয়ার ক্ষেত্রেও আমরা দেখতে পাই তাঁর স্বামী সাখাওয়াত হোসেনও রোকেয়ার কাজে সহযোগিতার মনোভাব পোষণ করতেন। এটা সত্য- নারী আন্দোলন, সমাজে নারীর যোগ্য অবস্থান অধিকার করার জন্য যে লড়াই ছিল নারীর, সে লড়াইয়ে পুরুষ যদি পরোক্ষভাবেও পাশে না থাকত তবে কোন নারীর পক্ষে একা একা এটা সম্ভব হত না। একজন সফল পুরুষের সাফল্যের পিছনে যেমন একজন নারী থাকেন, তেমনি একজন সফল নারীর পিছনেও থাকেন একজন পুরুষ। সমাজের রূপ- বর্তমান হোক বা অতীত; এ সত্য সব সময় ধ্রুব। আর পুরুষের সাহায্য নারীর এগিয়ে যাওয়ার পথে যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা বেগম রোকেয়া উপলব্ধি করেছিলেন। সুফিয়া কামাল তাঁর স্মৃতিচারণায় উল্লেখ করেছেন একই প্রসঙ্গ। পুরুষের মুক্তবুদ্ধি বিষয়ে বেগম রোকেয়া বলতেন, "পুরুষরাও যদি এগিয়ে দেয় তাহলে মেয়েদের অশিক্ষা দূর হয়। ....."[৬২] (কামাল (সম্পা), ২০০২, পৃষ্ঠা ৫৮৯)

বেগম রোকেয়া জানতেন, নারী আর পুরুষ একত্রে কাজ করলে কাজটি সর্বাঙ্গীণ সুন্দর হয়ে উঠবে। তাই তিনি পুরুষকে নারীর পাশাপাশি পথ চলার আহ্বান জানিয়েছেন উদাত্ত কণ্ঠে। "তোমরা পথটাকে সুগম করে দাও। তোমাদের বাদ দিয়ে ত আমরা চলতে পারি না।"[৬৩] (কামাল (সম্পা), ২০০২, পৃষ্ঠা ৫৮৯)

বাংলার জাতীয় জাগরণ ও স্বদেশী আন্দোলন তথা ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনের পটভূমিকায় এদেশে যে নারী জাগরণের উন্মেষ হলো সে বিষয়ে আলোচনায় এটাই বলতে হয় যে, সীমিত সুযোগ ও পরিবেশে বা সামাজিক পশ্চাৎপদ অবস্থাতেও এই জাগরণের মধ্য দিয়ে বেশ কিছুসংখ্যক ব্যক্তিত্বের দেখা পাওয়া গেছে। তাদের কেউ কেউ নারীর অধিকার, মানুষ হিসেবে তার মর্যাদা প্রতিষ্ঠা, অবরোধ প্রথা দূর করা, স্ত্রী শিক্ষা বিস্তার করা- এসব নিয়ে আন্দোলন করেছেন, পাশাপাশি অন্যেরা সামগ্রিকভাবে নারীমুক্তি ও প্রগতির আন্দোলনকে এগিয়ে নেয়ার জন্য রাজনৈতিক সচেতনতা সৃষ্টির জন্য কাজ করেছিলেন। এই দুই ধারার মাধ্যমেই বাংলার নারী জাগরণের বিষয়টি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

এই যুগেই রবীন্দ্রনাথের 'সাধারণ মেয়ে' শরৎচন্দ্রের কাছে অনুরোধ করেছিলো বাংলার অন্তঃপুরের শিক্ষাদীক্ষা-বর্জিত মেয়েকে কলমের আঁচড়ে বিদুষী করে তুলতে।[৬৪] (বেগম, ১৯৮৫, পৃষ্ঠা ৯০) জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামও গান

গেয়ে, কবিতা লিখে নারীসমাজকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। নারীর অবরোধের প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে তিনি তাঁর 'নারী' কবিতায় বলেছিলেন:

নর যদি রাখে নারীরে বন্দী, তবে এর পর যুগে,
আপনারি রচা ঐ কারাগারে পুরুষ মরিবে ভুগে। [৬৫]
(বেগম, ১৯৮৫, পৃষ্ঠা ৯০ ও ৯১)

নারীদের কোন কাজে পুরুষসমাজের যারা যারা উৎসাহী হয়েছেন বা পাশে থেকেছেন তাঁদের ভাগ্যে জুটেছে পরিবার ও সমাজের ধিক্কার-তিরস্কার। নারীকে শুধু চার দেয়ালের মধ্যে আটকে রাখলে সমাজের যে ক্ষতি হবে— সে ক্ষতি সহজে পূরণীয় নয়। এ কথা তাঁরা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, তাই নারীকে ঘরের বাইরে বেরিয়ে আসার ও তাদের নিজেদের মতামত প্রকাশ করার ক্ষেত্রে পুরুষসমাজ সচেষ্ট হয়েছিলেন। মুক্তবুদ্ধির আন্দোলনের, গোঁড়ামি ও কুসংস্কারমুক্ত চেতনার অন্যতম সংগঠক, মুসলিম নারী জাগরণের অন্যতম সহায়ক প্রবীণ সাংবাদিক সাহিত্যিক জনাব মোহাম্মদ নাসিরুদ্দীন নারীসমাজের সংগ্রামের পথে এগিয়ে এসেছিলেন। তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, নারীসমাজের এই অন্ধ পশ্চাদপদতা সমাজকে নিমজ্জিত করবে রসাতলে। তিনি তাঁর একটি প্রবন্ধে বলেছিলেন,

> যে সময়ে প্রতিবেশী হিন্দু সমাজের মেয়েরা শিক্ষা, সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞান ইত্যাদি প্রতি স্তরে এগিয়ে চলেছে, সে মুহূর্তে মুসলমান মেয়েদের এই করুণ অবস্থা কেবলমাত্র তাদের দুর্দশা নয়, গোটা সমাজের অগ্রগতির পক্ষে এক চরম প্রতিবন্ধকতা। আমি এটা সুস্পষ্ট বুঝতে পেরেছিলাম যে, এক পা দিয়ে মানুষ যেমন দৌড়াতে পারে না, তেমনি এক অংশকে অন্ধকারে ফেলে রেখে একটি সমাজ এগিয়ে যেতে পারে না। আর সে কারণেই সওগাত প্রকাশনার সূচনা-লগ্ন থেকেই নারী-সমাজের প্রাপ্য যথার্থ সম্মান আমি প্রদর্শন করছি। অনেকেই শুনে হয়তো অবাক হবেন যে, অবহেলিত মুসলিম নারীদের সেই কঠোর বন্দী জীবন যাপনের যুগেই প্রথম সংখ্যা সওগাতের প্রথম লেখাটি ছিল একজন মুসলিম মহিলার- বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের 'সওগাত' শীর্ষক একটি কবিতা। [৬৬] (নাসিরউদ্দীন, ১৯৮৫, পৃষ্ঠা ৩৮৭)

নারীসমাজকে সহযোগিতা করবে পুরুষসমাজ কিন্তু অধিকার আদায়ে সংগ্রাম করে যেতে হবে নারীদেরকেই। নারীকে পদে পদে বেধেছে ধর্মের নামে উদ্ভট কিছু নিয়ম। আমাদের সমাজে যারা কট্টর ধর্মীয় মৌলবাদী তারা নারীর উপর এই নির্মম বাক্যবাণ ছুঁড়ে দেন। নারী জাতির জন্য এই অন্ধ মৌলবাদী সত্তা ও তাদের ভিত্তিহীন শৃঙ্খল পর্বতসম হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এই বাধার পর্বত অতিক্রম করা নারীসমাজের জন্য সহজসাধ্য কোন কাজ ছিল না, যার ভয়াবহতা অদ্যাবধি বর্তমান। নারীর মানসিক অবস্থাই শুধু বিপর্যস্ত হয়নি, তার শারীরিক অবস্থাও ক্রমে অধোগতির দিকে ধাবিত হয়। আলো-বাতাসের অভাবে অন্ধকার স্যাঁতস্যাঁতে পরিবেশে নারীদের অধিকাংশই তখন যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হতো। এ প্রসঙ্গে মুসলিম সমাজের প্রথম প্রগতিবাদী মানসের অধিকারি এবং 'সওগাত' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন উল্লেখ করেছেন, "আমাদের পথে মোল্লারা যদি হন বিন্ধ্যাচল, তাহা হইলে অবরোধ-প্রথা হইতেছে হিমালয়।"[৬৭] (নাসিরউদ্দীন, ১৯৮৫, পৃষ্ঠা ২২১)

মৌলবাদীদের ধর্মান্ধতা আর অবরোধ প্রথা নারীর জীবনকে এমন একটি পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিলো যেখানে নারীদের মুক্ত করে দিলেও বাইরের আলো-বাতাসে যেতে সে ভয় পেত। নারীর চিন্তাশক্তিকে নষ্ট করে দিয়েছিল সমাজের প্রতিক্রিয়াশীল অংশটির এ ধরনের আচরণ। তাদের জীবনের মূল আস্থার জায়গাটি পঙ্গু হয়ে গিয়েছিল।

'সওগাত' সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদক মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিনের একটি প্রবন্ধে তৎকালীন নারীসমাজের একটি চিত্র আমরা দেখতে পাই। বর্ণনাটি এমন—

যুগ যুগ ধরে বাংলাদেশের মুসলিম নারীদের জীবন নানা অত্যাচার-অবিচার, অশিক্ষা, কুশিক্ষা ও কুসংস্কারের পংকিলে নিমজ্জিত ছিল। পৃথিবীর অন্য কোন সভ্য দেশের নারীর অবস্থা এরূপ শোচনীয় ছিল কি-না সন্দেহ।

সওগাতের প্রতিষ্ঠাযুগে আমরা দেখেছি:-

- নারীদের জীবন্ত সত্তার স্বীকৃতি না দিয়ে সংস্কারবদ্ধ সমাজ তাদের দেহ ও মনকে জড়পিণ্ডবৎ করে রেখেছিল।
- মেয়েদের লেখাপড়া শিক্ষাদান নিষিদ্ধ ছিল। তাদের বাংলা শিক্ষার বিরুদ্ধেও সমাজের কঠোর নির্দেশ বলবৎ ছিল। মেয়েদের বাংলাশিক্ষা দানকে অনেক মুসলমান ধর্মবিরোধী কাজ বলে মনে করতেন।
- অশিক্ষা, কুসংস্কার ও ভ্রান্ত বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে মুসলিম পরিবারে কঠোর অবরোধ প্রথার প্রচলন করা হয়। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মুক্ত আকাশ, মুক্ত বাতাস মুসলিম নারীর জন্য ছিল চিররুদ্ধ। ধর্মের দোহাই দিয়ে অবরোধের কঠোরতা এদের কর্মশক্তিকে পঙ্গু করে রেখেছিল। মেয়ের বয়স পাঁচ বছর হলেই ঘরের বের হতে দেওয়া হ'ত না। বাড়ীতে কেউ প্রবেশ করলে পাঁচ বছরের মেয়েটিকে পর্যন্ত লুকিয়ে থাকতে হতো।
- বাল্যবিবাহ প্রথা অত্যাধিক পরিমাণে চালু ছিল। ফলে অকাল মাতৃত্বের জন্য মেয়েরা স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্যহীন হয়ে পড়তো।
- গুরুতররূপে অসুস্থ হলেও মেয়েদের ডাক্তার বা কবিরাজ দেখানো হ'ত না পর্দা নষ্ট হওয়ার এবং দোজখে যাবার ভয়ে। রোগাক্রান্ত নারীরা কংকালসার হয়ে থাকতো অথবা রোগে তাদের জীবনের অবসান ঘটতো।
- খান্দানী এবং অর্থশালী লোকের পত্নীরা ছিল তাদের ভোগের বস্তু, এরা সংখ্যায় ছিল নগণ্য। আর গরীব লোকের স্ত্রীরা ছিল ক্রীতদাসেরও অধম। পরিবারে তাদের কোনো মর্যাদাই ছিল না। তাদের দিয়ে কঠোর শারীরিক পরিশ্রমের কাজ করানো হ'ত। তাদের উপর চলতো নিত্যদিন অমানুষিক অত্যাচার।
- কঠোর অবরোধের নিগ্রহ ছাড়াও উৎপীড়ন, অবজ্ঞা আর লাঞ্ছনা ছিল সে যুগের নারীদের সারা জীবনের সংগী। প্রতিবাদের ভাষা তাদের জন্য ছিল নিষিদ্ধ। অজ্ঞানতার অন্ধকারে আজীবন অবস্থান করার ফলে নিজেদের দুর্গতি অনুভব করার শক্তিও তারা হারিয়ে ফেলেছিল।
- মুসলিম সমাজে নারীদের জন্য ইসলামের বিধান ছিল কার্যতঃ অচল। সমাজে তারা গৃহপালিত এবং গৃহে আবদ্ধ জীববিশেষরূপে পরিগণিত ছিল। ইসলাম নারীকে যে মর্যাদা ও স্বাধীনতা দিয়েছে বাংলার মুসলিম সমাজ সে অধিকার থেকে জোরপূর্বক তাদের বঞ্চিত রেখেছিল। [৬৮]

(নাসিরউদ্দীন, ১৯৮৫, পৃষ্ঠা ২২৫)

নারীসমাজের প্রতি এমন ঘৃণ্য আচরণ কোন সভ্য সমাজে নজিরবিহীন। বাংলার মাটিতে সেসময় মুসলিম নারীসমাজের প্রতি যে ধরনের আচরণের উল্লেখ পাওয়া যায়, তা মধ্যযুগীয় আচরণকেও হার মানায়। নারীদের প্রতি পুরুষসমাজের দৃষ্টিভঙ্গি অত্যন্ত ন্যাক্কারজনক ছিল, এর চেয়ে বাড়ির পোষা প্রাণীর আধিকারও বোধহয় বেশি ছিল। মৌলিক চাহিদা থেকে নারী জাতিকে বঞ্চিত করে রেখেছিল পুরুষশাসিত পশ্চাদপদ সমাজব্যবস্থা। খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ও শিক্ষা থেকে তো বঞ্চিত রেখেছিলোই, এমনকি সৃষ্টিকর্তার দেওয়া আলো-বাতাস থেকেও তাদেরকে বঞ্চিত করে রেখেছিলো। বলা যায় সে যুগে নারী ছিল পুরুষের হাতের পুতুল।

নারীদের জন্য পারিবারিক ও সামাজিক এতো বাধার পরেও সুফিয়া কামাল সেই সময় ঘরের বাইরে বেরিয়েছিলেন মানুষের জন্য কাজের তাগিদে। বরিশালে সাবিত্রী দেবীর সাথে মাতৃমঙ্গল ও শিশুসদনে কাজ করেছেন। সামাজিক কাজের সূচনা সেখান থেকেই। পরে বরিশাল থেকে কলকাতায় গিয়ে বেগম রোকেয়ার হাতে গড়া সংগঠন 'আঞ্জুমানে খাওয়াতীন ইসলাম'-এ ১৯২৭ সাল থেকে ১৯৩২ সাল পর্যন্ত তিনি একনিষ্ঠভাবে কাজ করেছেন। সে সময়ে তিনি বেগম রোকেয়ার ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য লাভের সুযোগ পান। সমাজের আরোপিত বিধি নিষেধ উপেক্ষা করে বস্তিতে বসবাসকারী নারীদের উন্নয়নের জন্য কাজ করে যান নিরলসভাবে। তখন যে নারীরা বস্তিতে বসবাস করতো তাদের জীবন ছিল আরও দুর্বিষহ। বস্তিতে ঘুরেঘুরে এই পিছিয়ে থাকা মানবেতর জীবনযাপনকারী নারীদের স্বাবলম্বী, স্বাক্ষর ও স্বাস্থ্যবিষয়ে সচেতন হওয়ার জন্য

শিক্ষা দিয়েছেন, কাজ করেছেন। সুফিয়া কামাল তাঁর এক সাক্ষাৎকারে কলকাতার বস্তির তৎকালীন নারীদের অবস্থা সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন,

> কলকাতার বস্তিতে বস্তিতে আমরা কাজ করেছি। কী রকম অসহায় ! ওরা জানে না তার স্বামী কী এনে দেবে- কী খাবে, সে কথা- তার বাচ্চা আছে। ঘরের মধ্যেই আবদ্ধ। তারপর ঘরের বাইরে যে একটা দুনিয়া আছে, তা জানে না।[৬৯] (চৌধুরী, ২০১০, পৃষ্ঠা ৬৩)

সমাজের সব শৃঙ্খল ভেদ করে এই অসহায় নারীদের পাশে জীবনের শুরু থেকে দাঁড়িয়েছিলেন সুফিয়া কামাল। দেশ ভাগের পর কলকাতা থেকে ঢাকায় চলে আসেন মাতৃভূমির টানে। কিন্তু তাঁর সামাজিক কর্মকাণ্ড থেমে থাকেনি। যেখানেই অবস্থান করেছেন সে অবস্থায় তিনি তাঁর কাজ চালিয়ে গেছেন। কাজ থেকে তাঁকে বিচ্যুত করতে পারেনি পরিবার, সমাজ ও দেশের কোন বাধা।

২.৪ জীবনবোধ ও মানসগঠন

নারীর শিক্ষা ও ক্ষমতায়নের বিষয়টি কোন একটি দিনের ঘটনা নয় যাকে কেন্দ্র করে লীলা নাগ, শামসুননাহার মাহমুদ এবং সুফিয়া কামালের জীবনবোধ ও মানস গঠন হয়েছিল। জন্মের পর থেকে মানুষ যে পরিবেশের মধ্য দিয়ে বেড়ে ওঠে, তার একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে জীবনে। পিতা বা ভাই বা স্বামীর ছায়া মাথার উপর না থাকলে শিক্ষাহীন, অর্থ উপার্জনহীন, অন্তপুরবাসি নারীর জীবন কতটা দুর্বিষহ ও পরোমুখাপেক্ষী হয়ে ওঠে তা তিনজন ব্যক্তিত্ব বাল্যকাল থেকে প্রত্যক্ষ করেছেন। আর প্রত্যক্ষ করেছেন বলেই নারীর জীবনের সংকটগুলো কোথায় এবং সেই সংকট থেকে বের হওয়ার উপায় কি তা নিয়ে তিনজনই কাজ করে গেছেন আজীবন।

২.৪.১ লীলা নাগের জীবনবোধ ও মানস

লীলা নাগের জন্ম থেকে শুরু করে তাঁর বেড়ে ওঠার দিকে তাকালে প্রথমেই চোখে পরে এমন একটি পরিমণ্ডল যেখানে ছিল ব্রাহ্ম ধর্মের অসাম্প্রদায়িক চেতনাধারা, প্রগতিশীল আদর্শনিষ্ঠ ভাবনা আর দেশপ্রেমের ছায়া। যেখানে তিনি বাল্যকাল থেকে প্রত্যক্ষ করেছেন 'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই' এই চিরন্তন সৌম্যবাণী। ব্যক্তিত্বের একাগ্রতা, দৃঢ়তা এবং ঋজুতার উৎস সেখান থেকেই। জীবনের শুরু থেকেই শিক্ষার প্রতি তাঁর একাগ্রতা ও অদম্য স্পৃহা ছিল। মাত্র আট বছরে বয়সে তিনি পিতা মাতার স্নেহছায়া ছেড়ে ইডেন হাইস্কুলের হোস্টেলে পড়াশোনার জন্য চলে আসেন। পড়াশোনার প্রতি অদম্য ইচ্ছা থাকার ফলেই তিনি ১৯১৭ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। শিক্ষার প্রতি একাগ্রতার পরিচায়ক হয়ে আছে তাঁর এই সাফল্য। এরপর বেথুন কলেজে ভর্তি হয়ে সেখানেও কৃতিত্বের পরিচয় রেখেছেন তিনি। বি.এ পরীক্ষায় মেয়েদের মধ্যে প্রথম হয়ে তিনি পদ্মাবতী স্বর্ণপদকে ভূষিত হয়েছিলেন। শিক্ষার প্রতি তাঁর একাগ্রতা আর অবিচল দৃঢ়তার আরও উৎকৃষ্ট প্রমাণ মেলে এম.এ- তে ভর্তি হওয়ার ক্ষেত্রে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম নারী শিক্ষার্থী তিনি। সহ-শিক্ষার অবরুদ্ধ পথের আগল খুলে দিয়েছিলেন তিনি।[৭০] (শতবর্ষের শ্রদ্ধাঞ্জলি(সম্পা), ২০০৩, পৃষ্ঠা- ২২-২৩)

সুশৃঙ্খল জীবন প্রণালি

সরল-সুশৃঙ্খল জীবন প্রণালি ও চারিত্রিক সৌন্দর্য লীলা নাগের ব্যক্তিত্ব, জীবনবোধ ও মানসের আরেকটি অন্যতম দিক। শৈশব থেকেই সহপাঠীদের মধ্যে তিনি সুন্দর ও দৃঢ় স্বভাবের মেয়ে হিসেবে পরিচিত ছিলেন। কৈশোরেও ইডেন স্কুলের হোস্টেলে তিনি সুপরিচিত ছিলেন তাঁর চারিত্রিক গুণাবলির কারণে। সেখানে তিনি ছিলেন সবার প্রিয় 'লীলাদি'। [৭১] (মোহান্ত, ১৯৯৯, পৃষ্ঠা- ১৮) বেথুন কলেজে পড়ার সময় তাঁর মধ্যে এই সরল জীবন প্রণালি ও ব্যক্তিত্ব সৌন্দর্যের সাথে আরও একটি দিক যুক্ত হচ্ছিলো। তা হল দেশ ও সমাজ সম্পর্কে তাঁর সচেতনতা। দেশ ও দশের প্রতি করণীয় সম্পর্কে বোধ জাগ্রত হচ্ছিল তাঁর। ১৯২০ সালে কলকাতায় অসহযোগ আন্দোলনে কলেজ ত্যাগ করা ছাত্রীদের তিনি বুঝিয়েছিলেন, দেশের জন্য কাজ করতে হলে কলেজ ছাড়তে হয় না। স্বাধীনতার পথে শিক্ষা কখনই বাধা হতে পারে না, বরং সহায়ক শক্তি হয়ে ওঠে। তাঁর জীবনে শিক্ষা সত্যিই শক্তি হয়ে উঠেছিল। তাঁর কাজে তাঁর শিক্ষা ও সুশৃঙ্খল জীবনযাত্রার স্পষ্ট ছাপ মেলে। 'দীপালি সংঘে'র সভা আয়োজনে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রশংসা বাণীতে তা আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে আমাদের সামনে, "সমগ্র এশিয়ায় এরকম সুশৃঙ্খল মহিলা সভা আর দেখিনি।"[৭২] (রায়, ১৯৭২, পৃষ্ঠা- ১১৫)

সাংগঠনিক দূরদর্শিতা

নারীর জাগরণের পাশাপাশি নারীর অর্জিত শিক্ষাকে কাজে লাগানোর উদ্দেশ্যে ১৯২৬ সালে প্রতিষ্ঠা করেন ভারতবর্ষের প্রথম ছাত্রী সংগঠন 'দীপালি ছাত্রী সঙ্ঘ'। শিক্ষিত মেয়েদের নিজেদের পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে বের হয়ে স্বদেশের পরাধীন অবস্থা ঘুচানোর বিষয়েও সচেতন ও সোচ্চার হতে হবে। তাঁর মনে হয়েছিলো, নারীদের শক্তিকে কাজে না লাগানো গেলে ভারতবর্ষের প্রকৃত স্বাধীনতা আসবে না। সমাজ তখনো ঘরের বাইরে মেয়েদের সক্রিয় অংশগ্রহণ মেনে নিতে পারেনি। লীলা নাগ নারীর প্রতি সমাজের এই দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন চেয়েছিলেন। নারীর ভোটাধিকার, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকার নিয়ে তিনি আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা রেখেছিলেন।

দেশ ও দশের প্রতি তাঁর এই অনুভূতি ছিল মানসপটে তাঁর মানবতাবাদী ব্যক্তিত্বের প্রকাশ। মানুষের প্রতি ভালোবাসা তাঁকে উজ্জীবিত করেছে শত ঝঞ্ঝার মাঝেও। মাত্র সতেরো বছর বয়সে পিতার কাছে লেখা চিঠি তাঁর সাক্ষ্য বহন করে।

> আমার ক্ষুদ্র শক্তি যদি একটি লোকের উপকার করতে পারতো, তবে নিজেকে ধন্য মনে করতুম। সত্যি বলছি—এ আমার বক্তৃতা নয়, এটা আমার প্রাণের কথা এই আমার Ideal–আশীর্বাদ করো যদি এ জন্মে কিছু না করতে পারি, আবার যেন এই আমার প্রিয় ভারতবর্ষেই জন্মগ্রহণ করি, একে সেবা করে এ জন্মের আশা মিটাতে।[৭৩] (শতবর্ষের শ্রদ্ধাঞ্জলি(সম্পা), ২০০৩, পৃষ্ঠা- ২২, ২৩)

সপ্তদশ জন্মদিনে তিনি পিতার কাছে আশীর্বাদ চেয়েছেন নিজেকে উৎসর্গ করার এবং দেশ ও দশের কাজে ব্রতী হওয়ার বাসনায়। এ যেন কিশোর কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের লেখা দুর্বার 'আঠারো'র আহ্বান।

লীলা নাগ তাঁর ব্রতী জীবনের চলার পথে শুধু পিতা-মাতার আশীর্বাদই পাননি। তিনি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহচর্য ও আশীর্বচন লাভ করেছিলেন। দেশ, সমাজ ও মানুষের জন্য তাঁর কাজ দেখে কবিগুরু রবি ঠাকুর তাঁকে তাঁর আশ্রম

শান্তিনিকেতনের দেখভালের দায়িত্ব নিতে বলেছিলেন। কিন্তু লীলা নাগের পক্ষে পূর্ববঙ্গের কাজ ছেড়ে যাওয়া সম্ভব হয়ে ওঠেনি। তারপরে ১৯৩৭ সালে দীর্ঘ কারাবাস থেকে মুক্তির পরে কবিগুরু লীলা নাগকে চিঠি লিখেছিলেন,

> কারাবাস থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে তুমি বেরিয়ে এসেছো শুনে আরাম বোধ করলুম। মানুষের হিংস্র বর্বরতার অভিজ্ঞতা তুমি পেয়েছ। আশা করি এর একটা মূল্য আছে, এটা তোমার কল্যাণ সাধনাকে আরও বেশি বল দেবে। কর্তৃপক্ষ চেষ্টা করে পাশব বলে মনুষ্যত্বকে চিরকালের মতো পিষ্ট করে দেবে, কিন্তু মনুষ্যত্বের মহিমার জোরেই সেটা সত্য না হোক। পশুশক্তির উর্ধ্বে জয়ী হোক তোমার আত্মার শক্তি।[৭৪] (মোহান্ত, ১৯৯৯, পৃষ্ঠা- ১৭০)

আদর্শিক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য

লীলা নাগের ব্রতী ও বিপ্লবী জীবনে বিনয়, ধৈর্য ও আনুগত্যের প্রতিফলনও দেখতে পাই। তিনি মানুষের প্রতি ছিলেন বিনয়ী, ধৈর্যশীল ও মমতাপূর্ণ, একই সাথে আদর্শের প্রতি ছিল তাঁর গভীর আনুগত্য। আনুগত্যই তাঁকে বজ্র কঠিন ব্যক্তিত্ব প্রদান করেছিলো। সুফিয়া কামাল তাঁর এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন,

> ... কান্নায় কান্না মিশিয়ে, হাসিতে হাসি মিশিয়ে দুঃখের কাহিনী শুনে শুনে কত প্রহর, কত গভীর রাত গত হয়ে গেছে। অসীম ধৈর্য ছিল লীলাদির। বলতেন, ওদের সাথে না মিশলে সমব্যথী না হলে ওরা আমাদের কথা শুনবে কেন? এই একটি শিক্ষা তার কাছে থেকে পেয়েছি এবং আজও সেই শিক্ষার জন্যই আমি আন্তরিক, যতটুকু পারি সমাজ সেবায় অংশ নিয়ে দুঃখীদের সাথে, দরিদ্রের সাথে মিশতে পারি।[৭৫] (মোহান্ত, ১৯৯৯, পৃষ্ঠা- ৫১)

কারাবাসের পাশব নির্যাতন তাঁকে ভাঙ্গতে পারেনি। পারেনি কোন একটি দলমতাদর্শের সাথে আপস করাতে। তাঁর কাছে মানুষের কল্যাণ, সমাজ তথা দেশের কল্যাণ ছিল সবার আগে।

লীলা নাগ তাঁর আত্মার শক্তিতেই এগিয়ে গিয়েছিলেন প্রতিটি ক্ষেত্রে। তাঁর কাছে তাঁর বিবেক এবং আদর্শ ছিল সবচেয়ে বড়। শত প্রতিকূলতা ডিঙ্গিয়ে তিনি তাঁর পথে এগিয়ে যেতেন। কখনো সঙ্গী পেতেন আবার কখনো স্বতন্ত্র, নিঃসঙ্গ চলেছেন সেই পথে। তিনি তাঁর পিতার কাছে এক চিঠিতে লেখেন,

> আমি চাই স্বাতন্ত্র্য রেখে চলতে কিন্তু অনেক বাধা পাই। তারপর আমি যেটা ভাল বলে বুঝি সেটা আমি সর্বদা করি। আর সে জন্যই সকলের সব কথা আমার পক্ষে রাখা অসম্ভব হয়; এটাকে লোকে অবাধ্যতা ভেবে নেয়। তা ভাবুক। আমি বলি না যে, যা আমি ভাল মনে করি তা সত্যি সত্যিই ভাল। কিন্তু এটা ঠিক যে আমি ভাল মনে করেই করে থাকি। বিবেকের আদেশ বলেই করে থাকি। আমি এতে যদি সকলের দুঃখের কারণ হই তা হলে আমারও দুঃখ হয় কিন্তু তাই বলে আমার বিবেককে পায়ে ঠেলতে পারব না।[৭৬] (মোহান্ত, ১৯৯৯, পৃষ্ঠা- ৬৮)

অসাম্প্রদায়িক চেতনা ও মানবতার আদর্শ তাঁকে মানুষের কাছাকাছি নিয়ে গিয়েছিলো। ১৯৪১, ১৯৪৬, ১৯৪৭ ও পরবর্তী সময়ের দাঙ্গায় তাঁর প্রাণপণ ঝাঁপিয়ে পড়া, জীবনের ঝুঁকি নিয়ে দুর্গত এলাকা থেকে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে মানুষকে নিরাপদ আশ্রয় স্থলে নিয়ে আসার প্রচেষ্টা ছিল অসাম্প্রদায়িকতা ও মানবতার প্রতি তাঁর পূর্ণ সমর্পণ। দেশ ভাগের পর শরণার্থী ও বাস্তুহারাদের পুনর্বাসনের জন্য তিনি আপ্রাণ কাজ করেছিলেন। সুফিয়া কামাল তাঁর এক সাক্ষাৎকারে বলেন,

> ...এরপর দেশ বিভাগের সংকট এলো। চলে এলাম ঢাকায়, ৪৭-এর নভেম্বর মাসে। সলিমুল্লাহ এতিমখানায় রইলাম। লীলা নাগ (রায়) খুঁজে খুঁজে আমাকে সেখানে যোগাযোগ করলেন। তিনি শুনেছিলেন সমিতি করা এক মুসলিম মহিলা এসেছেন। তাঁর সহযোগিতায় (সেই কষ্টের সময় যখন বাড়ি ভাড়া পাওয়া যেত না) বাড়ি পেয়েছিলাম। তাঁর আহ্বানে 'ওয়ারী মহিলা সমিতি গড়া হলো...।[৭৭] (মোহান্ত, ১৯৯৯, পৃষ্ঠা- ৫০)

অসাম্প্রদায়িক চেতনা

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার জন্য তিনি গঠন করেছিলেন 'শান্তি কমিটি'। সমিতির কর্মীরা পুনর্বাসনের কাজ করতেন। সুফিয়া কামাল তাঁর স্মৃতিচারণমূলক গ্রন্থ 'একালে আমাদের কাল' গ্রন্থে লিখেছেন, "যখন ঢাকায় এলাম 'নারী শিক্ষা মন্দির'-এর প্রতিষ্ঠাত্রী স্বনামধন্যা লীলা নাগ (লীলা রায়), আমাদের লীলাদি তখন হিন্দু মুসলমান মহিলাদের নিয়ে গড়ে তুলেছেন 'শান্তি কমিটি'। তাঁর ডাকে তাঁর সাথে যোগ দিলাম।"[৭৮] (কামাল(সম্পা), ২০০২, পৃষ্ঠা ৫৯২) তাঁর বিপ্লবী জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সাম্প্রদায়িক বিষয়টিকে তিনি কখনো প্রশ্রয় দেননি। তিনি কাজ করেছেন মানুষের জন্য, দেশের জন্য।

দেশপ্রেম ও মানবপ্রেম

লীলা নাগের জীবনে দেশপ্রেম আর মানব প্রেম অঙ্গাঙ্গীভাবে মিশে আছে। দেশ ও দেশের মানুষ তাঁর জীবনে একই মহিমায় প্রাধান্য পেয়েছে। দেশের জন্য শুরু থেকেই তিনি সকল অত্যাচারের সাথে অকুতোভয় মানসিকতা নিয়ে লড়াই করে গেছেন। ব্রিটিশ শাসনামলে তিনি বিনা বিচারে প্রথম বন্দিনী।

> এতদিন সরকারী চর ও অন্যান্য সরকারী ভৃত্যরা কেবল তাদের সন্দেহভাজন পুরুষদেরই বিনা বিচারে বন্দীদশা ঘটাইত। শুধু এইরূপ পুরুষদিগকে আটক রাখিলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য নিরাপদ থাকিবে না, এখন তাদের সিদ্ধান্ত এইরূপ হইয়াছে। এই সিদ্ধান্তের প্রথম ফল কুমারী লীলা নাগ এম-এ ও কুমারী রেণুকা সেন বি-এর গ্রেপ্তার। তাঁহার মধ্যে কুমারী লীলা নাগ কে অনির্দিষ্টকালের জন্য আটক করিয়া রাখার হুকুম হইয়া গিয়াছে।[৭৯] (প্রবাসী, ১৩৩৮, পৃষ্ঠা- ৫৯০)

এছাড়া বিপ্লবী জীবনে দেশভাগের বিষয়টি তাঁকে শুরু থেকেই পীড়া দিয়েছে। দেশভাগের সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের জন্য তিনি মহাত্মা গান্ধী ও জহারলাল নেহেরুকে নিজে অনুরোধ করেছেন কিন্তু কোন ফল হয়নি। জওহরলাল নেহেরুর নিরুত্তাপ উত্তর ছিল, "It is impossible now, everything is settled; we are going to accept partition. You start a movement under your own leadership." আর মহাত্মা গান্ধীর ছিল বেদনাসিক্ত উত্তর, "I am much more against partition than you are. My lips are sealed." অবশ্যম্ভাবী দেশভাগের বাস্তবতা মেনে নিয়ে তিনি 'জয়শ্রী'-তে লিখলেন, "ভয়বিমুক্ত শোকগম্ভীর চিত্তে আমরা ১৫ আগস্টকে স্বীকৃতি জানাব।"[৮০] (শতবর্ষের শ্রদ্ধাঞ্জলি, ২০০৩, পৃষ্ঠা- ১৪) দেশভাগের খড়্গ কৃপাণ তাঁর জীবনকে ক্ষত-বিক্ষত করে দিয়ে গিয়েছিলো। কিছুকাল পরে ধর্মের দোহাই দিয়ে ১৯৪৮ সালে তাঁকে তাঁর মাতৃভূমি থেকেও বিতাড়িত করা হয়। কিছুই করার ছিল না তাঁর। সেদিন দেশ ত্যাগের ব্যথা নিয়ে চলে যেতে হয়েছিলো তাঁকে। তাই বলে তিনি মানুষের জন্য কাজ করা বন্ধ করেননি। যেকোনো বিপদে মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন তিনি। দাঙ্গায় নির্যাতিত মানুষ, উদ্বাস্তু মানুষ সবার পাশে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি।

নেতৃত্ব

তাঁর ব্যক্তি মানসে নেতৃত্বের যে দক্ষতা ছিল তা সত্যি আমাদের প্রাণিত করে। কলেজ থেকেই তাঁর নেতৃত্বের দক্ষতা প্রকাশিত হতে থাকে। মানুষকে সংগঠিত করার এক অদ্ভুত শক্তি ছিল তাঁর। নেতৃত্ব ও অদম্য মানসিক শক্তি তাঁকে তাঁর কাজকে লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। ছাত্রী অবস্থায় 'দীপালি সংঘ' তাঁর উৎকৃষ্ট উদাহরণ। তিনি নারীদের মুক্তির জন্য কাজ করেছেন বহু কিন্তু তাঁকে নারীবাদী বলে গণ্ডিবদ্ধ করা যায় না। তাঁর কর্ম যজ্ঞের দিকে আলোকপাত করলে দেখতে পাই তিনি নারী পুরুষ নির্বিশেষে মানুষকে রেখেছেন সবার ঊর্ধ্বে। নারী শিক্ষা ও জাগরণের পাশাপাশি বিপ্লবী কর্মকাণ্ড, রাজনৈতিক অবস্থান, দেশের জন্য আন্দোলন, সাময়িকপত্র সম্পাদনা, বিভিন্ন সংগঠন ও কমিটি পরিচালনা প্রভৃতি কাজ তাঁর নেতৃত্ব দক্ষতা ও কাজের প্রতি তাঁর মানসিক শক্তিকে তুলে ধরে আমাদের সামনে।

রাজনৈতিক সচেতনতা

তাঁর রাজনীতি সচেতনতার বিষয়টি তাঁর জীবনবোধ ও মানসে গুরুত্বপূর্ণ একটি দিক। দেশের জন্য বিভিন্ন বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে নারীদের অংশগ্রহণ তখনো ততটা দেখা যায়নি যতটা সময়ের প্রয়োজন ছিল। তিনি তাঁর এই সচেতনতা এবং চিন্তা ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন নারী সমাজ তথা সবার মাঝে। নারী সমাজে স্বদেশের প্রতি সচেতনতা জাগিয়ে তোলা ছিল তখনকার সময়ের দাবি। নারী পুরুষের সম অংশগ্রহণে স্বাধীনতার আন্দোলন আরও বেগবান ও ফলপ্রসূ হবে তা লীলা নাগ তাঁর দূরদৃষ্টি দ্বারা উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি স্বদেশের প্রতি স্বাধীনতা আন্দোলনের আদর্শ ও কর্মকাণ্ড সম্পর্কে নারীদের সোচ্চার করার লক্ষ্যে ১৯৩১ সালের মে মাসে 'জয়শ্রী' সম্পাদনা শুরু করলেন। পূর্ব বাংলায় 'জয়শ্রী'ই প্রথম মহিলা মাসিক পত্রিকা যার নামকরণ করেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এর প্রচ্ছদ তৈরি করেন শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু। কবিগুরু পত্রিকার জন্য একটি আশীর্বাণী পাঠিয়েছিলেন।

> বিজয়িনী নাই তব ভয়
> দুঃখে ও বাধায় তব জয়।
> অন্যায়ের অপমান
> সম্মান করিছে দান
> জয়শ্রীর এই পরিচয়।[৮১]
> (শতবর্ষের শ্রদ্ধাঞ্জলি (সম্পা), ২০০৩, পৃষ্ঠা- ২৭)

তখনকার সময়ে নারীর ভোটাধিকার ছিল না। দেশের কাজে নারী সমাজের সচেতনতা ও অংশগ্রহণ স্বীকৃতি লাভ করবে নারীর ভোটাধিকারের মাধ্যমে। দেশের কাজে নারীর মতামত প্রাধান্য পাবে তার ভোটের মধ্য দিয়ে। ১৯২১ সালে বঙ্গীয় আইন সভায় নারীর ভোটাধিকার সংক্রান্ত বিলটি গৃহীত হয় না। এর ফলে নারী সমাজে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। এ আন্দোলনের সম্মুখভাগে ছিলেন লীলা নাগ। ১৯২১ সালে তিনি 'নিখিল বঙ্গ ভোটাধিকার কমিটি'র সহ-সম্পাদিকা হিসেবে নারীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকার সম্পর্কে জনমত গড়ে তোলার জন্য নানা সভাসমিতির আয়োজন করেছিলেন। ইডেন স্কুলের অধ্যক্ষ স্বর্ণলতা দাসের সভাপতিত্বে ঢাকায় এই সংগঠনের মহিলা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া লীলা নাগের উদ্যোগে ঢাকায় কেন্দ্রীয় পরিষদে নারীদের ভোটাধিকারের বিরূপ সমালোচনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করে প্রস্তাব গৃহীত

করে। এই কমিটি শুধু নারীর ভোটাধিকার নয়, নারীর অন্যান্য সামাজিক অধিকারের জন্য আন্দোলন গড়ে তোলে।[৮২] (মোহান্ত, ১৯৯৯, পৃষ্ঠা- ২৫, ২৬)

নান্দনিক চেতনা

বিপ্লবী জীবনের মাঝে লীলা নাগের ব্যক্তিত্বে নান্দনিক চেতনাও পরিলক্ষিত হয়। ছবি আঁকার প্রতি তাঁর গভীর ভালোলাগা ছিল। রঙ আর তুলি দিয়ে হয়তো মুছে দিতে চেয়েছিলেন সমাজ ও দেশের বুকে আঁকা দাগগুলি। ভালোলাগা বা প্রাণের টান থাকলেও বিপ্লবী জীবনে রঙ তুলি ক্যানভাসের কাছে যাওয়ার তেমন সৌভাগ্য হয়নি। সংগ্রামী জীবনে নিজের কর্ম দিয়ে সমাজ ও দেশকে রাঙানোর চেষ্টা করে গেছেন আজীবন।

নিসর্গ চেতনা

তিনি নিসর্গকে বরাবরই ভালোবেসেছেন। সংগ্রামী জীবনে যখনি সুযোগ পেয়েছেন তখনি ভালোবেসে ছুটে গেছেন প্রকৃতির কাছে। জেলে বন্দী অবস্থায় তিনি বাগান করতে ভালবাসতেন। এছাড়াও সাগর ছিল তাঁর ভীষণ প্রিয়। তিনি বারবার ছুটে যেতেন সাগরের কাছে; যেন জীবনী শক্তির ভাণ্ডার থেকে দু হাত ভরে শক্তি নিয়ে আসা যায় বাধাহীনভাবে। তিনি বলতেন, "তবে সমুদ্র কি পুরনো হতে পারে? যাদের মন বিকল তাদের নিকট ছাড়া কারো নিকট সমুদ্র পুরনো হতে পারে না।"[৮৩] (মোহান্ত, ১৯৯৯, পৃষ্ঠা- ৭৩)

জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত তাঁর জীবনী শক্তি ছিল অফুরন্ত। মানুষের কাছ থেকে দূরে তিনি থাকতে পারতেন না। ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে নিভৃত পল্লীতে বাস করতে গেলেন, তাঁর বাড়ির নাম রাখলেন 'শ্রী', সেখানেও মানুষ এসে তাদের দুর্দশার কথা বলেছে। তিনি অসুস্থ শরীর নিয়েও নতুন উদ্যমে কাজ করতে চাইতেন। নিষেধ করলে তিনি বলতেন, "মানুষকে বিমুখ করা পাপ।"[৮৪] (মোহান্ত, ১৯৯৯, পৃষ্ঠা- ৭১) তাঁর মধ্যে অদ্ভুত এক শক্তি ছিল। সেখানেই আবার গড়ে উঠল শিল্পশিক্ষা কেন্দ্র, বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রও, ডিসপেনসারি ইত্যাদি। রোগ তাঁর রক্ত মাংসের শরীরকে জব্দ করতে পারলেও মানুষের প্রতি মমতা তাঁর জীবনী শক্তিকে, কর্ম স্পৃহাকে কখনই গ্রাস করতে পারেনি। ১৯৬৭ সালে শেষবারের মতো সংজ্ঞাহীন হওয়ার কয়েক মাস পূর্বে তিনি বলেছিলেন, "জয় পরাজয়, সাংসারিক সার্থকতা ব্যর্থতা এসবে কি মানুষের কিছু পরিচয় আছে? আছে তার চিন্তায়, ব্যবহারে, সংগ্রামে।"[৮৫] (শতবর্ষের শ্রদ্ধাঞ্জলি(সম্পা), ২০০৩, পৃষ্ঠা- ৩১)

২.৪.২ শামসুন নাহার মাহমুদের জীবনবোধ ও মানস

অদম্য স্পৃহা ও নিবেদিত মন

শামসুন নাহার মাহমুদ তাঁর জীবনের অনেকটা সময় কাটিয়েছেন চারদেয়ালের মাঝে। তিনি মুক্তির স্বাদ পেয়েছেন অনেক ত্যাগ-তিতিক্ষার মধ্য দিয়ে। তাঁর চলার পথ কখনোই মসৃণ ছিল না। তাঁকে লড়াই করে যেতে হয়েছে সমাজের অন্ধত্বের সাথে, বদ্ধমূল চিন্তার সাথে। তিনি কখনোই হার মেনে নেননি। তাঁর ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষা পূরণে পার হতে হয়েছে অনেক বাধা। তবু তিনি মনের জোর হারাননি। এগিয়ে গেছেন ধীর কিন্তু অবিচল পদক্ষেপে। তাঁর এই বন্ধুর পথ পরিক্রমার দিকে তাকালে প্রতিভাত হয় তাঁর জীবনবোধ ও মানস। প্রথমেই বলতে হয় শামসুন নাহারের শিক্ষার প্রতি অদম্য স্পৃহা ও নিবেদিত মন। বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে মাত্র আট বছর বয়সে বিদ্যালয় ত্যাগ করতে হল। বন্দী হতে হল ঘরের চার দেয়ালে। শিক্ষার আলো যেখানে নিষ্প্রয়োজন ছিল সেসময়। কিন্তু তিনি নিজের ইচ্ছাশক্তির জোরে সমাজকে দেখিয়ে দিয়েছিলেন শিক্ষার প্রতি তাঁর অদম্য ইচ্ছার জয় কিভাবে হয়েছিল। সমাজ যে শিক্ষাকে পর্দার আড়াল করে রাখতে চেয়েছিল, পর্দার আড়াল সরিয়ে সেই আলোর জয় হয়েছিল। তাঁর শিক্ষার পথে সময়ের বিরাম চোখে পড়ে কিন্তু তাঁর সাফল্য গাঁথায় সে ছেদ-বিরাম ম্লান হয়ে গেছে।

মায়ের ছায়া

গবেষণায় জানা যায়, শামসুন নাহার মাহমুদ তাঁর চলার পথে মায়ের দ্বারা প্রভাবিত। এ কথা তিনি তাঁর লেখায় উল্লেখ করেছেন দৃঢ়ভাবে। ছয় মাস বয়সে পিতাকে হারান শামসুন নাহার। মাত্র সতেরো বছর বয়সে বিধবা মায়ের জীবনের সংগ্রাম তাঁকে সাহায্য করেছে তাঁর পথ চলার প্রেরণা হয়ে। তাঁর মায়ের ইচ্ছা ছিল মেয়েও যেন এই বন্দী জীবনে আবদ্ধ না থাকে। সমাজের করাল প্রথার কাছে তিনি মাথা তুলতে পারেননি। কিন্তু সন্তানদের তিনি নিজের সাধ্যমতো শিক্ষার আলো দিতে সচেষ্ট ছিলেন। তিনি বিভিন্ন মনীষীদের জীবনদর্শন এবং তাঁদের জীবনে মায়ের ভূমিকা তুলে ধরতেন সন্তানদের কাছে। ছোটবেলা থেকে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার বাইরে থাকলেও শামসুন নাহার শিক্ষা অনুরাগী পরিবেশেই ছিলেন। তাঁর জীবনে মা অনেক বড় ভূমিকা রেখেছে। শামসুন নাহার তাঁর মায়ের ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে নিজের অভিজ্ঞতা তুলে ধরেছিলেন এভাবে,

> কলকাতায় মাত্র পাঁচ বছর তিনি স্থায়ীভাবে ছিলেন। বিদ্যার জোরে নয়, পাণ্ডিত্যের গুণে নয় বেশি করে তাঁর স্বভাবের সহজ আন্তরিকতা ও দরদের জন্যই তিনি এই অল্প সময়ের মধ্যে লেডী মুহম্মদ শফী, বেগম শাহনওয়াজ, বেগম মুহম্মদ আলী থেকে শুরু করে একেবারে খোলার ঘরের বস্তির বৌ-ঝিদের সঙ্গে পর্যন্ত ভাব করতে পেরেছিলেন। বেগম রোকেয়ার আকস্মিক মৃত্যুর পর 'আঞ্জুমানে খাওয়াতীনে ইসলাম'-এর কাজকর্ম গুছিয়ে নিয়ে আবার নূতন উদ্যমে কাজ শুরু করবার জন্য মাকেই অগ্রণী হতে দেখা গিয়েছিল। আঞ্জুমানের সমস্ত কর্মতৎপরতার অন্তরালে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি ছিলেন শক্তি, সাহস, উৎসাহ, বুদ্ধি ও দরদের এক অফুরন্ত উৎস। কলকাতার বিভিন্ন অংশে সম্ভ্রান্ত গোড়া মুসলমান পরিবারের মেয়েদের মধ্যে সমিতির উদ্দেশ্য প্রচার করে তাঁদের দলে টেনে আনার ব্যাপারে মায়ের সমকক্ষ কেউ ছিল না।[৮৬] (পারভিন, ২০১২, পৃষ্ঠা- ২২)

শামসুন নাহারের মা চার দেয়ালের মধ্যে থেকেও যেমন জীবনের দিশা দিতে চেয়েছিলেন সন্তানদের, তেমনি ঘরের বাইরে কাজ কীভাবে করতে হয় তাও মায়ের কাছে হাতে কলমে জেনেছেন শামসুন নাহার মাহমুদ। বেগম রোকেয়ার সাথে পরিচয়

ঘটে মায়ের মাধ্যমেই। মায়ের প্রত্যক্ষ প্রভাব ছাড়াও মাতামহ খান বাহাদুর আবদুল আজিজ যেমন আগলে রেখেছিলেন সমাজের যেকোনো বিরূপ পরিস্থিতিতে, তেমনি তাঁর বড় ভাই হবীবুল্লাহ বাহারও তাঁর বোনের জীবনে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন সর্বদা।

মুক্ত চিন্তক

শামসুন নাহার মাহমুদ ছিলেন মুক্ত চিন্তক ও অসাম্প্রদায়িক। তাঁর জীবনে বেগম রোকেয়া এবং কাজী নজরুলের প্রভাব তাঁকে মুক্ত চিন্তা করার দিগন্ত দিয়েছিলো। মানুষের সংকটে সবসময় তাঁরা নিঃস্বার্থভাবে পাশে থেকেছেন। ধর্ম-বর্ণ দিয়ে চিন্তা করেননি কখনো। বেগম রোকেয়া যেমন তার লেখা ও আন্দোলনের মধ্য দিয়ে মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন তেমনি কাজী নজরুল ইসলাম লেখনী হাতে নারী সমাজের পাশে ছিলেন। শামসুন নাহার মাহমুদ তাঁদের মননে প্রভাবিত হয়েছিলেন অনেক বেশি। তাঁর মুক্ত চিন্তাকে সবার মাঝে প্রকাশ করার লক্ষ্যে শুরু করলেন সাময়িকপত্র 'বুলবুল'। 'বুলবুল' ছিল শামসুন নাহার ও হবীবুল্লাহ বাহারের সম্মিলিত সাধনার ফল। 'বুলবুল' প্রকাশের আগেই কাজী নজরুলের শিশু পুত্র বুলবুলের মৃত্যুতে কাজী নজরুল ভীষণ বিচলিত হয়ে উঠেছিলেন। নজরুল ইসলামের গভীর সান্নিধ্য ধন্য বাহার ও নাহার নজরুলের প্রয়াত ছেলের স্মরণেই পত্রিকার নাম দেন 'বুলবুল'। আধুনিক ও মুক্তচিন্তা, প্রগতিপন্থী মুসলমান সমাজের মুখপত্র হিসেবে 'বুলবুল' তার বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখেছিলো। পাশাপাশি ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে এই পত্রিকায় তাঁদের চিন্তা প্রকাশ করার উদাত্ত আহ্বান করেছিলেন শামসুন নাহার মাহমুদ। যদিও শুরুর প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যায় একপেশে মুসলমান লেখকদের লেখাই ছাপা হয়েছিল, পরবর্তীতে তাঁর পরিবর্তন ঘটে। নারী জাগরণের বাণী দ্বারে দ্বারে পৌঁছে দেওয়ার পাশাপাশি নতুন সৃষ্টিশীল সাহিত্য সৃষ্টির মধ্য দিয়ে অসাম্প্রদায়িক মনোভাব তৈরি করার প্রয়াসে 'বুলবুল'-এর যাত্রা শুরু হয়। হিন্দু-মুসলমানের সৌহার্দ্য আনার ক্ষেত্রে পত্রিকাটি ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে থাকে। প্রথম বর্ষের দ্বিতীয় সংখ্যায় ডাকঘর শীর্ষক চিঠিপত্রের পাতায় প্রমথ চৌধুরী লিখেছিলেন—

> পড়ে খুশি হয়েছি। বিশেষ খুশি হয়েছি এক কারণে যে, সবগুলি লেখাই আপনার সম্প্রদায়ের লেখকদের। এই রকম একটি কাগজ থেকে ইংরেজি শিক্ষিত মুসলমানদের নব মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। এঁদের সব মনোভাব যে ইংরেজি শিক্ষার প্রভাবে গড়ে উঠেছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই— যেমন আমাদের হিন্দুদেরও হয়েছে। আমরা হিন্দুরাও একেবারে পূর্ব সংস্কার বর্জিত নই, এবং নূতন মুসলমান লেখকেরাও তা হতে পারেন না এবং হওয়া বাঞ্ছনীয়ও নয়। কারণ, চিন্তারও প্রোগ্রেস সামাজিক ধর্মমত ও আচারকে অবলম্বন করেই গড়ে ওঠে। ইউরোপের মহা মহা ফ্রি থিঙ্কার কি খৃষ্টান ধর্মের প্রভাব থেকে মুক্ত?[৮৭] (পারভিন, ২০১২, পৃষ্ঠা- ৮৩)

প্রমথ চৌধুরীর এই চিঠি থেকে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের নিজস্বতা থাকার পরেও সমাজ ও দেশ-কে নিয়ে গঠনমূলক চিন্তার উন্মেষকে তিনি সাধুবাদ দিয়েছেন। 'বুলবুলের' আধুনিক চেতনার পথ চলার ক্ষেত্রে তিনি তাঁর শুভকামনা দিয়েছিলেন।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'বুলবুলের' তৃতীয় সংখ্যায় 'বুলবুলের' এই শুভ প্রয়াসের জন্য অভিনন্দন জানিয়ে চিঠি দিয়েছিলেন। তাঁর চিঠি 'বুলবুল' পত্রিকার জন্য ছিল পথ চলার প্রেরণা। এই চিঠি 'শুভবুদ্ধির আহ্বান' এই শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছিল। কবিগুরু লিখেছিলেন—

> বুলবুল পত্রিকাখানি পড়ে আশান্বিত হলুম। আত্মবিচ্ছেদ ও ভ্রাতৃ বিদ্বেষে দেশের হাওয়া যখন বিষাক্ত হয়ে উঠেছে সেই পরম দুর্যোগের দিনে নিজেদের বাণী যে কোথাও ধ্বনিত হতে পারল একে আমি শুভ লক্ষণ বলে মনে করি। আপনার

> বিনাশ যখন আপনিই ঘটাতে বসি তখন তাকেই বলে মহতী বিনষ্টি। বাইরের আঘাত থেকে দেহের পরিত্রাণ অসাধ্য নয়, কিন্তু দেহ যখন সাংঘাতিক মারীকে মর্ম্মস্থানে পোষণ করে, আপনার মৃত্যুদিবস আপনার মধ্য থেকেই উদ্ভাসিত করে তোলে তখনি পরম শোকের দিন উপস্থিত হয়। সেই শোচনীয় দশা আজ আমাদের; আমাদের দুঃখ, আমাদের লজ্জা চরম সীমার দিকে চলেছে, আমরা স্পর্ধা করে আত্মঘাতের সাধনায় প্রবৃত্ত হয়েছি। সর্বনাশের মদমত্ততায় আত্মবিস্মৃত দেশের উন্মত্ত কোলাহলের মাঝখানে তোমার শুভবুদ্ধির আহ্বান নির্ভয়ে ঘোষণা করো, ঈশ্বরের প্রসন্নতা তোমাদের উদ্যোগকে গৌরবান্বিত করবে।
>
> আমি পারস্য ইরাক ইজিপ্টে ভ্রমণ করে এসেছি। বহু শতাব্দী মোহান্ধকার ভেদ করে সর্বত্রই নব প্রভাতের আলোক আজ প্রকাশিত, সর্বত্রই সেখানকার নানা লোকের মুখে শুনে এলাম ভারতবাসীর অন্ধকারের প্রতি ধিক্কার। স্পষ্ট উপলব্ধি করেছি। আজকের দিনে নব জীবনের উৎসাহে উদ্দীপ্ত সমস্ত প্রাচ্য মহাদেশের মধ্যে একমাত্র ভারতবর্ষেই আমরা মুক্তির ক্ষেত্রে কাঁটাগাছ রোপণ করতে বসেছি। এই মূঢ়তার অপমান সমস্ত পৃথিবীর সম্মুখে আজ অনাবৃত অথচ হতভাগ্য দেশের নির্বোধ জড়ত্বে বেদনা সঞ্চার আরম্ভ হয়েছে তোমাদের এই পত্রে তার লক্ষণ সূচিত।[৮৮] (পারভিন, ২০১২, পৃষ্ঠা- ৮৪)

ভারতবর্ষে নানা সম্প্রদায়ের মানুষের বাস। স্বদেশের স্বাধীনতা অর্জনে যেখানে একতার ভীষণ প্রয়োজন ছিল সেখানে ভারতবর্ষের সম্প্রদায়গুলো নিজেদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে। এ অবস্থায় পরাধীন স্বদেশের স্বাধীনতার আগে নিজেদের মধ্যে সম্প্রীতির অভাব নিজেদের লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত করে দেয়। এই বিষয়টি কবিগুরু তাঁর এই লেখায় প্রকাশ করেছিলেন। স্বদেশের এই অবস্থায় শামসুন নাহার মাহমুদের 'বুলবুল' প্রকাশের সিদ্ধান্ত তাঁর অসাম্প্রদায়িক মনোভাব ও দূরদর্শীতার প্রমাণ বহন করে। অন্নদাশঙ্কর রায় 'বুলবুল' সম্পর্কে তাঁর অভিমত চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন,

> প্রথম সংখ্যার লেখক লেখিকারা সকলে মুসলমান সম্প্রদায়ের। সেই জন্যে আমার ধারণা ছিল যে মুসলমান সম্প্রদায় এই পত্রিকার দ্বারা আপনার বিশিষ্ট বাণী নিবেদন করবেন। বিদগ্ধ মুসলমানের চিত্ত কোথাও এমন করে স্ফূর্ত হতে দেখিনি। "এই পত্রিকা সম্পূর্ণ আমাদের"—একথা মনে করলে যে স্ফূর্তি 'বুলবুল'-এর প্রথম সংখ্যায় লেখক লেখিকাকে প্রবুদ্ধ করেছিল বলে অনুমান হয়। 'বুলবুল'-এ হিন্দুর রচনা থাকলে ঐ স্ফূর্তি অন্তর্হিত হবে কিনা চিন্তা করবেন।
>
> তবে এমন একটি পত্রিকার প্রয়োজন আছে যাতে হিন্দু ও মুসলমান অকপট চিত্তে বাণী বিনিময় করেন। অবশ্য বিদগ্ধ হিন্দু মুসলমানের কথাই বলছি।
>
> শিক্ষিত হিন্দু মুসলমান প্রাণ খুলে আলাপ করতে পারলে আজকের দিনের অন্ধকার বহু পরিমাণে অপসৃত হতো। আলেয়ার পিছনে ছুটাছুটি করা যাদের পেশা তাঁরা তাই করুক, কিন্তু তপস্যা যাঁদের আলোকের তাঁরা কেন পরস্পরের প্রতি অভিমান পোষণ করে অন্ধের সঙ্গে অন্ধ হবেন?
>
> 'বুলবুল' যদি মিলন দূত হয়ে শান্তিবার্তা শোনায় তবে দেশের এই বেদনার্ত মুহূর্তে তার আবির্ভাব ইতিহাসের অন্তর্গত হবে।[৮৯] (পারভিন, ২০১২, পৃষ্ঠা- ৮৫)

অন্নদাশঙ্কর রায় তাঁর চিঠিতে দেশভাগের আগে দ্বিজাতি তত্ত্বের বিষবৃক্ষ রোপণের বিষয়ে সতর্ক হওয়ার কথা বলেছেন। মানুষের প্রতি মানুষের ঘৃণাবোধ কখনো শুভ কিছু বয়ে আনে না। যে বিভেদ সেদিন হিন্দু মুসলমানের মধ্যে এসেছিল তার অশুভ ফলাফল দেশভাগের পূর্বাপর রক্তপাত সাক্ষী হয়ে আছে। সে অবস্থায় দুটি সম্প্রদায়ের মধ্যে সমঝোতা আসা ও ভুল বুঝাবুঝির নিরসন ঘটলে মনুষ্যত্বের জয় হতো। শামসুন নাহারের উদ্যোগে 'বুলবুল' যদি তার লেখনীর মাধ্যমে মানুষের মাঝে পরিবর্তন নিয়ে আসে সে শুভ চেষ্টাকে সাধুবাদ জানিয়েছেন অন্নদাশঙ্কর রায় তথা সকল শুভাকাঙ্ক্ষী।

রাজনীতি সচেতন

শামসুন নাহার মাহমুদের সাহিত্যচর্চা, সমাজকর্মের মধ্য দিয়ে তাঁর রাজনীতি সচেতনতার পরিচয় পাওয়া যায়। রাজনীতি সচেতন শামসুন নাহার মাহমুদ দেশভাগের পূর্বে রাজনীতির সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত হননি। দেশভাগের পূর্বে তিনি রাজনীতির সাথে জড়িত ছিলেন তাঁর সামাজিক কর্মের মধ্য দিয়ে। সামাজিক কাজকর্ম অনেকসময় রাজনৈতিক বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত থাকে, সে অবস্থায় সমাজকর্মী হিসেবে রাজনৈতিক দিকেও সচেতন হতে হয়। রাজনৈতিক দূরদর্শীতা ও পারদর্শিতা সামাজিক কাজ ও আন্দোলনকে সাফল্যের দিকে বেগবান করে তোলে। ব্রিটিশ শাসন কালে সামাজিক আন্দোলন ও কাজের অনেক কিছুই পরাধীন ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। তাই তাঁর প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক যোগদান দেখা না গেলেও তিনি সামাজিক কাজের মাধ্যমে রাজনীতি সচেতন ছিলেন। দেশভাগের আগে তিনি 'মুসলিম লীগ' এর সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। তিনি অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ কাউন্সিলের সদস্য ছিলেন। ১৩৪৩ বঙ্গাব্দের নির্বাচনে কলকাতা মুসলিম আসনে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার কথা ছিল কিন্তু মুসলিম লীগ থেকে মনোনয়ন না পাওয়ায় তিনি অংশগ্রহণ করেননি। নারীর ভোটাধিকার ও মনোনয়ন নিয়ে কিছু বিষয়ে জটিলতার ফলে তিনি রাজনৈতিক অঙ্গনে সরাসরি প্রবেশ করতে পারেননি। সাতচল্লিশোত্তর তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানে তাঁর নতুন রাজনৈতিক জীবনের সূচনা হলেও সরাসরি রাজনৈতিক কাজে তাঁর অংশগ্রহণের তেমন কোন নজির মেলে না। তথাপি ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে তিনি অংশগ্রহণ করেন কিন্তু ফলাফল আশানুরূপ হয়নি। তাঁকে পরাজয় মেনে নিতে হয়। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে মুসলিম লীগের জনপ্রিয়তা চূড়ান্তভাবে হ্রাস পায় ফলে যুক্তফ্রন্টের কাছে মুসলিম লীগের পরাজয় নিশ্চিত হয়ে ওঠে। ১৯৬২ সালের নির্বাচনে তিনি পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের মহিলা সংরক্ষিত আসন থেকে নির্বাচিত হন। ১৯৬২ সালে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বসে রাওয়ালপিণ্ডিতে। সেখানে তিনি সাংবাদিকদের বলেছিলেন, "দেশের মঙ্গলের জন্য বাস্তবকর্মে আমি বিশ্বাসী। বক্তৃতায় আমি বিশ্বাস করি না। আমি সব সময় দেশের উন্নতির জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে যাব।"[৯০] (পারভিন, ২০১২, পৃষ্ঠা- ১৫৩)

তিনি উপলব্ধি করেছিলেন এদেশের মানুষের জন্য শিক্ষার সুযোগ তৈরি করতে হবে। শিক্ষা শুধু নারীর জন্য নয়। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবাইকে শিক্ষার আওতায় আনতে হবে। সমাজে সকলের জন্য শিক্ষা সুনিশ্চিত হলে দারিদ্র, রোগ দুটোই নিয়ন্ত্রণে চলে আসবে। শিক্ষা না থাকলে দক্ষ কর্মীর অভাব হবে, ফলে তাদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি কষ্টসাধ্য হবে। অপরদিকে শিক্ষা মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করবে ফলে রোগ-ব্যধি সম্পর্কে প্রতিরোধ ব্যবস্থা নিতে সক্ষম হবে। শিক্ষাহীন সমাজ নিয়ে দেশকে এগিয়ে নেওয়া সম্ভব হবে না। তাই তিনি বাজেট অধিবেশনে তাঁর বক্তব্যে বলেছিলেন, "পাকিস্তানের প্রধান সমস্যা হইতেছে দারিদ্র, রোগ, জরা, ব্যধি ও অশিক্ষা। দেশ হইতে নিরক্ষরতা উচ্ছেদকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত কারণ শিক্ষা ও জ্ঞান অপর দুটির সমস্যার সমাধান করিতে পারিবে।"[৯১] (পারভিন, ২০১২, পৃষ্ঠা- ১৫৪)

সমাজ ও দেশের অগ্রগতি নিয়ে তাঁর কাজের পরিসর; তাঁর এই চিন্তা শুধু রাজনীতির আলোকে ছিল না। শিক্ষার মাধ্যমে সমাজকে উন্নত না করতে পারলে দেশ সামনে আগাতে পারবে না। শিক্ষাক্ষেত্রে অসম সমাজ পদে পদে মুখ থুবড়ে পড়বে। তাই শামসুন নাহার মাহমুদের রাজনৈতিক চেতনা তাঁর সমাজ চেতনার একটি অংশ। রাজনীতিকে তিনি দেখেছেন তাঁর চিন্তা ও মননকে বড় পরিসরে ছড়িয়ে দেওয়া ও কাজের সাফল্যের দিকে ধাবিত হওয়ার একটি উপায় হিসেবে।

তিনি ছিলেন নারী জাতির মুক্তির অন্যতম অগ্রদূত। বেগম রোকেয়ার অসম্পূর্ণ কাজের ভার তিনি নিয়েছিলেন। 'আঞ্জুমানে খাওয়াতীনে ইসলাম' শুধু নয়, তিনি নারীর শিক্ষা ও নারীর অবরুদ্ধ দশার অবসান করতে যুক্ত হয়েছিলেন আরও অনেক সংগঠনের সাথে। যেহেতু পুরুষ সমাজের তুলনায় নারী সমাজের অবস্থা অবর্ণনীয় হীন অবস্থায় ছিল সেহেতু নারী সমাজের প্রতি তিনি বিশেষ দৃষ্টি দিয়েছিলেন। তাঁর কাজের বিষয়বস্তু ছিল সমাজের নারী-পুরুষ নির্বিশেষে। কোন সুষ্ঠু সমাজ ব্যবস্থা এককভাবে পুরুষ কিংবা এককভাবে নারী দ্বারা পরিচালিত হয় না। তাই তিনি শুধু একপেশে নারী জাতির জন্যই নয় সবার কথা ভেবেছেন। তাঁর মধ্যে মানবতাবাদী চেতনার দিকটিও সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

শিশু শিক্ষা

অঙ্কুরিত ছোট একটি গাছ যেমন ধীরে ধীরে মহীরুহ হয়ে ওঠে, তেমনি আজকের শিশুরাই আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। শিশুর বেড়ে ওঠার শুরুর অবস্থা থেকেই তার প্রতি যত্নশীল না হলে আশানুরূপ ফল চাওয়া বৃথা। সমাজকে নতুন করে গড়ে তুলতে একজন মানুষকে শিশু অবস্থা থেকেই গড়ে তুলতে হবে। হঠাৎ করে মানুষের পরিবর্তন কষ্টসাধ্য। তাই সামাজিক কাজের একটি অংশ ছিল তাঁর শিশুদের নিয়ে ভাবনা। শামসুন নাহার মাহমুদ নারী-পুরুষের শিক্ষার পাশাপাশি শিশুর শিক্ষা নিয়ে কাজ করেছিলেন। শামসুন নাহার মাহমুদের সাহিত্য চর্চায় শিশুদের জন্য অনেক রচনার দৃষ্টান্ত বিদ্যমান। শিশুর প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি শুধু রচনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। তাঁর মানসে যে চেতনা ছিল তা তিনি কাজের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছেন। নিজের বেড়ে ওঠার মধ্য দিয়ে তিনি হয়তো অনুধাবন করেছিলেন শিশুর লালন-পালন ও শিক্ষা একটি মানুষের জীবনে কতটা ভূমিকা রাখে। শিশুর লালন-পালন ও শিক্ষার ক্ষেত্রে তিনি মায়ের ভূমিকাকে প্রধান বলে দাবি করেছেন। এ ক্ষেত্রে তাঁর নিজের জীবনের প্রতিচ্ছবি তাঁর মানসে দেখতে পাই। নারী সমাজের মুক্তির পথ সুগম না করতে পারলে পরবর্তী প্রজন্ম সঠিক পথ নির্দেশনা পাবে না। একটি শিশুর কাছে তার মায়ের যে স্থান তা বাকি সকলের চেয়ে নিঃসন্দেহে আলাদা। ফলে শিশুর মনস্তাত্ত্বিক ও শারীরিক বিকাশ একজন মা তথা একজন নারীর উপর ন্যস্ত। ফলে নারী জাতির সজাগ দৃষ্টি তখনি গড়ে উঠবে যখন শিক্ষার আলো তাদের মাঝে নতুন চেতনা গড়ে তুলবে। ১৯৪৪ সালে কলকাতা ইসলামিয়া কলেজে 'মুকুল' সম্মেলনে তাঁর বক্তব্যে তিনি যুদ্ধের ভয়াবহতা শিশু ও নব প্রজন্মের মাঝে কেমন প্রভাব ফেলবে সে সম্পর্কে বলেছিলেন,

> মহাযুদ্ধের সমস্ত অকল্যাণ সত্ত্বেও আমরা ভুলতে পারি না যে, যুদ্ধের হানাহানির ভেতর থেকে চিরদিনই হয়েছে দেশের ও জাতির ইতিহাসের নবযুগের, নবজীবনের সূচনা। যুদ্ধের ভেতর দিয়ে চিন্তাধারায় যত দ্রুত পরিবর্তন, তেমন বোধ হয় আর কোন কিছুর ভেতর দিয়ে নয়। আমাদের চারপাশে মানুষের হাল-চাল, আচার ব্যবস্থা, চিন্তা ভাবনা, পৃথিবীর মানচিত্র, পৃথিবীর চেহারা, সব কিছুই প্রতি মুহূর্তে বদলে যাচ্ছে। যুগযুগান্তরের সঞ্চিত আবর্জনা ভাসিয়ে নিয়ে যাবার জন্য ইতিহাসে- এমনি প্রলয়ের প্রয়োজন হয়। বেদনার ভেতর দিয়েই আসে নতুন সৃষ্টি, ধ্বংসস্তূপের ভেতর থেকেই হয় নতুনের জন্মলাভ। আজকের যারা মুকুল, এই দারুণ ভাঙ্গাগড়ার যুগ অতিক্রান্ত করে গিয়ে উত্তীর্ণ হবে তারা নতুন জীবনে, নতুন জগতে।[৯২] (পারভিন, ২০১২, পৃষ্ঠা- ১১৮)

বিংশ শতাব্দীর মাঝভাগে দাঁড়িয়ে শিশুর মনস্তত্ত্ব কেমন কোনদিকে প্রবাহিত হতে পারে বা হওয়া উচিৎ সে বিষয়েও শামসুন নাহার মাহমুদ মতামত ব্যক্ত করেছিলেন। ১৯৪৬ সালে কলকাতায় আয়োজিত বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের শিশু সাহিত্য শাখার সভাপতি ছিলেন তিনি। তিনি শিশুমনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে আধুনিক যুগ মানসের বৈপ্লবিক চিন্তা চেতনার সাথে একাত্মতা প্রকাশ করেছেন। শিশুকে বড় করে তোলার ক্ষেত্রে শাস্তি বা কড়াকড়ি আরোপ না করার ক্ষেত্রে জোর দান করেছিলেন।

দেশ ভাগের পর তিনি পূর্ব পাকিস্তানের শিশুকল্যাণ পরিষদ-এর সভানেত্রী নির্বাচিত হন। ১৯৫৬ সালে বিশ্ব শিশু দিবস উপলক্ষে তিনি ঢাকা স্টেডিয়ামে শিশু সমাবেশে বলেছেন, "সমাজে বর্তমানে যে দারিদ্র, অশিক্ষা ও স্বাস্থ্যহীনতা বিরাজ করছে, তাই-ই সামঞ্জস্যহীন শিশু সৃষ্টির জন্য দায়ী। শিশুদের কল্যাণ প্রচেষ্টার নিরাময় ব্যবস্থা অপেক্ষা প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা বেশি কার্যকরী হবে।"[৯৩] (পারভিন, ২০১২, পৃষ্ঠা- ১১৯)

তাঁর উদ্যোগেই ১৯৫৯ সালে 'পূর্ব পাকিস্তান শিশুকল্যাণ পরিষদ'-এর তত্ত্বাবধানে 'শিশুকলা ভবন' স্থাপিত হয়। শিশুকলা ভবনের কাজ ছিল যে শিশুরা প্রতিভা থাকা সত্ত্বেও যারা চারুকলা, কারুকলার বিষয়ে কাজ করার সুযোগ পাচ্ছে না, তাদের খুঁজে বের করে প্রতিভার স্ফুরণে সহায়তা করা। এছাড়া তিনি শিশু সাহিত্যিকদের আহ্বান করেছেন সাহিত্যের মধ্য দিয়ে শিশুদেরকে নিজেদের ঐতিহ্যের সাথে, মহৎ দর্শনের সাথে পরিচয় করানোর জন্য। সাহিত্য সৃষ্টির মধ্য দিয়ে শিশুর প্রাতিষ্ঠানিক পুঁথিগত শিক্ষার পাশাপাশি জ্ঞান অর্জনের আরও পথ উন্মোচিত হবে। শিশুর মানসিক ও শারীরিক বিকাশের লক্ষ্যে ১৯৬০ সালে তিনি শিশুদের জন্য গ্রন্থাগার, পার্ক ও জাদুঘর তৈরির জন্য দাবি জানান। তিনি বেতারে 'খেলাঘর' আসর পরিচালনাও করেন।

প্রতিটি শিশুই সম্ভাবনাময়, প্রতিটি জীবনই মূল্যবান। সঠিক পরিচর্যায় তাকে বিকশিত করতে হয়। শামসুন নাহার মাহমুদ সমাজের বঞ্চিত শিশুদের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেছিলেন। তারাও যেন নিজেদের জীবনকে গঠন করে দেশের আদর্শ নাগরিক হয়ে উঠতে পারে। সমাজের এতিম শিশুরাও যেন সমাজ ও দেশের কাজে এবং উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারে সে বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। শামসুন নাহার মাহমুদ ব্যক্তি জীবনে এতিম এবং এতিমখানা শব্দ দুটি ব্যবহারের বিরুদ্ধে ছিলেন। এই শব্দ দুটির মধ্য দিয়ে বৈষম্য ফুটে ওঠে। শিশু মনে এই আঘাত ও বিভেদ সৃষ্টির বিরুদ্ধে ছিলেন তিনি। তাঁর উদ্যোগে পঙ্গু শিশুদের জন্য পুনর্বাসন কেন্দ্র স্থাপিত হয় ১৯৬১ সালে। তিনি আজীবন শিশুদের জন্য নানা কল্যাণমুখী কাজে নিজেকে সম্পৃক্ত রেখেছিলেন। তাঁর সমাজকর্মের একটি অন্যতম দিক ছিল শিশুদের জন্য কল্যাণমুখী কাজ।

মানবতাবাদ: অসাম্প্রদায়িক চেতনা

সমাজে নারী ও শিশুর ভবিষ্যতের চিন্তা যেমন তাঁকে নাড়া দিয়েছে, তেমনি মানুষের দুঃসময়ে তিনি ছুটে গেছেন তাঁর সেবাব্রতী মন নিয়ে। সর্বোপরি মানবতাবাদী মনন ছিল তাঁর। দুর্ভিক্ষ, দুর্যোগ, বন্যা, মন্বন্তর, দাঙ্গা যেকোন প্রতিকূল অবস্থায় মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি। ১৩৫৩ সালের মন্বন্তর বাংলার মানুষের জন্য এক হৃদয় বিদারক ইতিহাসের সাক্ষ্য দেয়। সে সময় শামসুন নাহার মাহমুদ 'নিখিল ভারত নারী সম্মিলন' এর কলকাতা শাখার সেক্রেটারি। তিনি সমিতির অন্যান্য শাখা থেকে টাকা ও ত্রাণ সামগ্রী সংগ্রহ করে বিভিন্ন স্থানে মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। সমিতির কেন্দ্রীয় সভানেত্রী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন। ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, পাবনা বিভিন্ন অঞ্চলে ত্রাণ বিতরণ করা হয়েছিল।

মন্বন্তরের রেশ শেষ হতে না হতেই দেশ ভাগ-কে কেন্দ্র করে বাংলার বুকে শুরু হয়েছিল দাঙ্গা। রক্তে প্লাবিত বাংলার মাটি। সংঘর্ষরত হিন্দু মুসলমান-এর জীবন তখন বিপন্ন। হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে মানুষকে নিরাপদ আশ্রয় প্রদানের জন্য তিনি 'আঞ্জুমানে খাওয়াতীন ইসলাম' এর কর্ণধার হিসেবে এগিয়ে গেছেন মানুষের পাশে। মানুষে মানুষে এই হানাহানি মানবতার

লাঞ্ছনা। মানুষের প্রতি মমত্ববোধ থেকেই তিনি দাঙ্গা কবলিত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য ছুটে গেছেন। ছিন্নমূল মানুষের পুনর্বাসনের জন্য তিনি কাজ করে গেছেন। তাঁর মানবতাবাদী মনন তাঁকে মানুষের কাজে সম্পৃক্ত রেখেছিল সারা জীবন। এসব কাজের মধ্য দিয়ে দৃষ্টিগোচর হয় শামসুন নাহার মাহমুদের জীবনবোধে মানুষ এবং মানবিকতা যেন সকল সামাজিক কর্মের প্রেরণা হয়ে ছিল। মানুষের প্রতি গভীর মমত্ববোধ তাঁর ভেতরের মাতৃশক্তির ও মাতৃহৃদয়েরও পরিচায়ক। এ বিষয়টি তাঁর জীবনবোধ ও মানসকে সুস্পষ্ট করে তুলে ধরতে সাহায্য করেছে সর্বসমক্ষে।

২.৪.৩ সুফিয়া কামালের জীবনবোধ ও মানস

শিক্ষা ও ক্ষমতায়নের অভাবে নারীর জীবনে কতটা ভয়াবহতা নেমে আসতে পারে তা অবোধ বয়স থেকেই প্রত্যক্ষ করেছেন সুফিয়া কামাল। সুফিয়া কামালের সাত মাস বয়সে তাঁর পিতা নিরুদ্দিষ্ট হয়ে যান। পিতার চলে যাওয়ার পর তাঁদের জীবনে সামাজিক ও আর্থিক সংকট নেমে আসে। এমনকি সৈয়দ নেহাল হোসেনের মৃত্যুর পর নিজ জীবনেও তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন শিক্ষাহীন জীবনের সংঘর্ষ। শিক্ষা ও ক্ষমতায়নের অভাবে তাঁর মায়ের জীবন ও তাঁর নিজের জীবন কীভাবে অতিবাহিত হয়েছে তা জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে উপলব্ধি করেছিলেন তিনি। সেজন্যই সুফিয়া কামালের জীবনবোধে নারীর শিক্ষা ও ক্ষমতায়নের বিষয়টি বারবার পরিলক্ষিত হয়েছে।

সুফিয়া কামাল ছিলেন এমন একজন মানুষ যার চিন্তা-চেতনা ও মননে শুধু নারী জাগরণের বাণীই অনুরণিত হয়নি; তাঁর জীবনবোধের মুল চেতনা ছিল মানুষের কল্যাণের জন্য কাজ করা, তাদের মঙ্গলের জন্য নিজেকে নিবেদিত রাখা। মানুষের উন্নয়নে, রাষ্ট্র ও সমাজে ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি লড়াই করে গেছেন নির্ভীক ও নিরলসভাবে। তাঁর নিজের ভাষায় এ সম্পর্কে তিনি বলেছেন-"আমার জীবনদর্শন বলতে কিছু নেই, আমি আমার বিবেকের কথাই বলি।"[৯৪] (হক, ২০১৩, পৃষ্ঠা ৫৫)

সুফিয়া কামাল সারা জীবন তাঁর বিবেকের তাড়নায় কাজ করে গেছেন মানুষের জন্য, দেশের জন্য। প্রশংসা পাওয়ার জন্য নয়। কিছু পাওয়ার আশা বা সামনে দাঁড়িয়ে বাহবা পাওয়ার বাসনা তাঁকে কখনই ক্ষুদ্র করতে পারেনি। নিরবে-নিভৃতে মানুষের প্রতি নিজের কর্তব্য পালন করে গেছেন। ১৯২৯ সালে 'সওগাত'- সম্পাদক মোহাম্মদ নাসিরুদ্দীনকে লেখা এক চিঠিতে তাঁর মানসিকতা প্রতিভাত হয় এভাবে—

> আমি আমার কাজ করে যাব নীরবে, নিঃশব্দে। আমি পথের কাঁটা সরিয়ে যাব- এরপর যারা আসবে যেন কাঁটা না ফোটে তাদের পায়ে, তারা যেন কণ্টকবিদ্ধ পদে পিছিয়ে না পড়ে। ওইটুকু আমি করবো আমার যতটুকু শক্তি আছে তাই দিয়ে।[৯৫] (জাহাঙ্গীর, ১৯৯৯, পৃষ্ঠা ১৯)

সুফিয়া কামাল বাঙালি তথা বাংলাদেশের নারী আন্দোলনের ও নারীজাগরণের অন্যতম পথিকৃৎ। 'আর নারী জাগরণ ও মুক্তি আন্দোলন সে তো তাঁর শৈশবকাল থেকেই শুরু হয়েছে। নিজের জীবন দিয়েই শুরু নারী মুক্তি আন্দোলনের।'[৯৬] (হক, ২০০০, পৃষ্ঠা ৩১)

গবেষণায় জানা যায় সুফিয়া কামালের জীবন দর্শন, তাঁর চিন্তাধারাকে বিশ্লেষণ করা, তাঁর সত্তার স্বরূপ উন্মোচনের ক্ষেত্রে সুফিয়া কামাল নিজে তাঁর আত্মজীবনীতে উল্লেখ করেন- "বেগম রোকেয়ার দারুণ প্রভাব আমার জীবনে।"[৯৭] (কামাল, (সম্পা), ২০০২, পৃষ্ঠা ৫৮১)

তিনি আরও বলেছেন-

> ওই আদর্শটাই তো আমার মনে আছে । কিন্তু ওইরকম কি আর আমি করতে পারি। কোথায় বেগম রোকেয়া, আর কোথায় আমি! আমার সাধ্যে কি কুলায়? ওনার আদর্শ ত আমার জীবনের সাথে একদম লেপটে গেছে। [৯৮] (কামাল (সম্পা), ২০০২, পৃষ্ঠা- ৫৮৪)

বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান নারী কবি, বাঙালি নারী আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা সর্বোপরি মায়ের সম্পর্কে সুলতানা কামালের পর্যবেক্ষণটি এখানে প্রণিধানযোগ্য-

> মা বেগম রোকেয়ার প্রতি ভীষণ অনুরক্ত ছিলেন। এখানে এসে একটা পত্রিকা বের করার চেষ্টা করেছিলেন জাহানারা আরজুর সঙ্গে 'সুলতানা' নামে। এটা কয়েক সংখ্যা বের হয়ে আর হয়নি। সেই কাছাকাছি সময়ে আমার জন্ম। যে কারণে আমার নামও রেখেছিলেন সুলতানা।
>
> বেগম রোকেয়ার একটা বিরাট প্রভাব ছিল মার চিন্তা, চেতনা, কাজকর্মের মধ্যে। আমার বাবাও সেটাকে ভীষণভাবে শ্রদ্ধা করতেন।[৯৯] (কামাল, ২০০৯, পৃষ্ঠা ৩৭)

বেগম রোকেয়ার অসম্পূর্ণ কাজগুলো আরও বৃহৎ পরিসরে করার চেষ্টা করেছেন সুফিয়া কামাল। নারীদের জন্য শিক্ষার আলো ছাড়া যে মুক্তির উপায় নেই, তা তিনি গভীরভাবে উপলব্ধি করেছেন নিজের জীবনেও। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সুযোগ পাননি সুফিয়া কামাল। বরিশালে নদী ভাঙ্গনে ঘর-বাড়ি ছেড়ে যখন বিধবা অবস্থায় কলকাতায় যেতে বাধ্য হন তখন জীবিকার জন্য তাঁর একটি কাজের ভীষণ প্রয়োজন হয়। জীবন তখন তার কাল ভৈরব রূপ নিয়ে সামনে দাঁড়ালো। প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে। সুফিয়া কামাল একটি বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা শুরু করলেন। নিজে পাঠের বিষয়গুলো ভালো করে জেনে পড়ে আয়ত্ত করে তাঁর কাজ করে গেছেন। এতটা অদম্য ইচ্ছাই তাঁকে জয়ী করেছে জীবনযুদ্ধে। এ সম্পর্কে নারী আন্দোলনে সুফিয়া কামালের সহকর্মী আয়েশা খানম বলেছেন-

> বেগম রোকেয়ার চিন্তা-চেতনা দ্বারা তিনি গভীরভাবে প্রভাবান্বিত ছিলেন । কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মানবতাবাদ, সাম্যবাদী চেতনার সমতাবোধ সবকিছুর একটা ভারসাম্যপূর্ণ সমন্বয় তাঁর মাঝে ঘটেছে।[১০০] (হক, ২০০০, পৃষ্ঠা ৩১)

শুধু নারী জাগরণ নয়, মানবতার বাণী ধারণ করেছেন আজীবন। তাঁর সাহিত্যে, তাঁর জীবনবোধে বস্তুত তিনি প্রকাশ ঘটাতে চেয়েছেন মানবতাবাদকে। তাঁর 'সব মানুষের তরে' কবিতাটিতে মানবতাবাদের পরিচয় পাই

যেন কুণ্ঠায় নত নাহি হয় মানবের অধিকার,
উন্নত শির ! উদার বক্ষে করে নিতে সবাকার
তব দেওয়া আলো, ক্ষুধার খাদ্য, বাঁচিবার সম্মান,
তোমার মুক্ত মাটিতে ঘোষিয়া মুক্তির ফরমান
লভুক আবার নতুন করিয়া এই হেলালের তলে
সকল মানুষ সম পর্যায়ে মানবাধিকার বলে।
(সব মানুষের তরে/ অভিযাত্রিক)[১০১]
(সুফিয়া কামাল কবিতা সমগ্র, ২০১৩, পৃষ্ঠা- ২৪৯)

দেশপ্রেম, মুক্তিযুদ্ধ ও মানবতাবোধ

শুধু নিপীড়িত-নির্যাতিত নারীদের পাশে তিনি ছিলেন তা নয়, দেশের প্রতিটি সংকটের সময় সচেতন ও অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন, ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে তাঁর ছিল অসামান্য অবদান। বাহান্নর ভাষা তথা বাক-স্বাধীনতার আন্দোলনেও রাজপথে তাঁকে দেখা যায় সামনের সারিতে। 'একুশের গুলিবর্ষণের প্রতিবাদে তাৎক্ষণিক মিছিলে দেখা গেল সুফিয়া কামালকে রাজপথের সামনের কাতারে। ঢাকার মানুষ যে কতকাল কতভাবে তাকে দেখেছে এ প্রতিবাদিকার ভূমিকায় তাঁর বুঝি কোনো লেখাজোখা নেই।'[১০২] (হক, ২০০০, পৃষ্ঠা ৪৪) নারীদের নিয়ে অন্যায়ের বিরুদ্ধে সুকঠোর অবস্থান নিয়ে রাজপথে নেমেছেন। রাষ্ট্রের ক্ষমতাসীনদের রক্তচক্ষু কখনোই তাঁকে দমাতে পারেনি। মহান মুক্তিযুদ্ধে তাঁর অবস্থান ছিল অনস্বীকার্য। ১৯৭০ সালে বাংলাদেশে প্রথম সাধারণ নির্বাচনের পর গণরায় বানচালের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে নারীসমাজের মিছিলের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন সুফিয়া কামাল। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের শুরু থেকে পাকিস্তানী বাহিনী তাঁর উপর কড়া নজর রেখেছিল। প্রায় নজরবন্দী অবস্থা। তিনি তাঁর সন্তানদের যুদ্ধে পাঠিয়ে দেন। গোপনে মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে যোগাযোগ করতেন, সাহায্য করতেন তাদের। তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন সরকার পাকিস্তানের বর্বরতার চিত্র দেখে সুফিয়া কামালকে বিশেষ বিমানে করে সোভিয়েত ইউনিয়নে নিয়ে যেতে চেয়েছিল। কিন্তু তিনি রাজি হননি। বলেছিলেন—

> এখন আমি এ দেশ ছেড়ে বেহেশতেও যেতে রাজি নই। আমার দেশের মানুষেরা শান্তি পাক, সোয়াস্তি লাভ করুক- এ দেখে যেন আমি এ মাটিতেই শুয়ে থাকতে পারি।[১০৩] (জাহাঙ্গীর, ১৯৯৯, পৃষ্ঠা ৭৪)

সুফিয়া কামালের এই লেখা থেকে তাঁর স্বদেশপ্রেমের স্পষ্টচিত্র দেখতে পাই। নিজ দেশের সংকটের মুহূর্তে তিনি একা প্রাণে বাঁচার ক্ষেত্রেও আগ্রহী নন। দেশকে অনিশ্চয়তার মধ্যে রেখে তিনি স্বর্গসুখে থাকতেও বিমুখতা প্রকাশ করেছেন। স্বদেশের প্রতি তাঁর ছিল অকৃত্রিম ভালোবাসা।

মুক্তিযুদ্ধের এই অনিশ্চয়তার দিনগুলোকে জীবন্ত করে রেখেছিলেন তাঁর লেখা 'একাত্তরের ডায়েরী' গ্রন্থে। তাতে তিনি বলেছেন- "কাঁথা সেলাই করেছি নয় মাসে নয়টি। প্রত্যেকটি ফোঁড় আমার রক্তাক্ত বুকের রক্তে গড়া।"[১০৪] (কামাল, ১৯৮৯, পৃষ্ঠা ১৫১)

পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী সুফিয়া কামালকে বন্দী করে রেখেছিল। এ দেশের নিরস্ত্র নিরীহ মানুষদের উপর পাকিস্তানী হায়েনারা যে অত্যাচার চালায় তা মধ্যযুগীয় বর্বরতাকেও হার মানায়। সুফিয়া কামাল প্রতিনিয়ত খবর পাচ্ছেন তাঁর দেশের হাজার হাজার মানুষ মারা যাচ্ছে। তিনি বন্দী অবস্থায় কিছু করতে পারছেন না তাঁদের জন্য এই দুঃখ তাঁকে কষ্ট দিয়েছে। তাঁর যে স্বজাত্যবোধ তা তাঁর 'একাত্তরের ডায়েরী' গ্রন্থটি পড়লে বুঝা যায়।

স্বদেশপ্রেম ও স্বজাত্যবোধ মানবতাবোধেরই একটা অংশ। স্বদেশপ্রেম ও স্বজাত্যবোধ সুফিয়া কামালের মানবতাবোধকে আরও সুদৃঢ় করেছে, স্পষ্ট করেছে। সুফিয়া কামাল আজীবন মানুষের শান্তির জন্য, অধিকারের জন্য লড়ে গেছেন, কখনো আপস করেন নি নিজের অবস্থান নিয়ে। সাম্প্রদায়িক চেতনা, ধর্মের নামে মানুষে মানুষে বিভেদ সৃষ্টি, নারীর বিরুদ্ধে ফতোয়া জারি, অগণতান্ত্রিক ও অমানবিক আচরণ, প্রগতিবাদী চিন্তা- চেতনার বিরুদ্ধাচরণ প্রভৃতি কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে তিনি আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন।

নান্দনিকতা, নিসর্গ প্রীতি

সুফিয়া কামালের নান্দনিকতাবোধের কথা এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হবে। তিনি তাঁর ভাবকল্পনার চেতনায় প্রকৃতি, প্রেম ও বিরহকে এক বিশেষ মাত্রায় প্রকাশ করেছেন। প্রকৃতির সৌন্দর্যকে তিনি দেখেছেন নান্দনিকবোধের ভেতর দিয়ে। প্রকৃতির প্রতিকূল রূপকেও তিনি তাঁর বর্ণনায় এক নতুন আঙ্গিকে নিয়ে এসেছেন। তাঁর মানে প্রকৃতি আর প্রেম যেন অবিচ্ছেদ্য একটি বিষয়। প্রেমের প্রকাশ কখনো কায়াশ্রয়ী হয়ে দেখা দেয়নি, প্রকৃতির স্নিগ্ধরূপে প্রকাশ ঘটেছে তার। বিরহবোধের প্রকাশেও প্রকৃতির ব্যবহার বেশি দেখা যায়।

আজি দ্বিতীয়ার সন্ধ্যা, কাটিয়াছে ঘোর অমানিশি
সুনির্মল নীল নভে উদিয়াছে ক্ষীণ বাঁকা শশী,
আপন গৌরবে একা ! তবু তার হাসিতে অম্বর
হাসিছে, সান্নিধ্য সুখে হৃদি-তারা কাঁপে থর থর।
(অনন্ত পিপাসা/ সাঁঝের মায়া)[১০৫]
(সুফিয়া কামাল কবিতা সমগ্র, ২০১৩, পৃষ্ঠা- ৪৫)

যুদ্ধাপরাধীদের বিরুদ্ধে নেতৃত্ব

সুফিয়া কামালের নৈতিকতাবোধ আমাদের কাছে আরও স্পষ্ট হয়, যখন যুদ্ধাপরাধীদের বিচার দাবিতে শহীদ জননী জাহানারা ইমামের পাশে ছিলেন তিনি। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরেও হায়েনাদের থাবা মুখিয়ে ছিল দেশটির উপর। একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল জাতীয় সমন্বয় কমিটিতে সুফিয়া কামাল নেতৃত্ব দিয়েছেন। তিনি অন্যায়ের সাথে আপস করেন নি কখনো। অকুতোভয় ব্যক্তিত্ব নিয়ে লড়ে গেছেন আজীবন। সুফিয়া কামালের ঘনিষ্ঠ সহযোদ্ধা মালেকা বেগম তাঁর 'রাজপথে জনপথে সুফিয়া কামাল' গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন—

> জাতীয় সমন্বয় কমিটির বিশাল সমাবেশে সভানেত্রী সুফিয়া কামাল বলেন, কোন আইনে শহীদ মুক্তিযোদ্ধা জননী জাহানারা ইমামসহ মুক্তিযোদ্ধা জনতার গায়ে পুলিশ হাত তুলেছে, বাংলাদেশের জনগণের সেটা জিজ্ঞাসা। আন্দোলনের মাধ্যমে জনগণকে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার আহ্বান জানান। ঘাতক গোলাম আজমসহ যুদ্ধাপরাধীদের বিচার চাওয়ার জন্য জাহানারা ইমামের উপর পুলিশ হামলা ও নির্যাতন চালিয়েছে। আপনারা জনতার আদালতে এর বিচার করুন। কারণ এর আগেও ঘাতকরা মা-বোনদের গায়ে হাত তুলেছে। বিচার হয়নি।[১০৬] (বেগম, ১৯৯৭, পৃষ্ঠা- ৪৭)

নৈতিকতা, মূল্যবোধ

মুক্তিযুদ্ধে যে মানুষগুলো বাঙালি হয়েও এদেশের মানুষদের নানাভাবে নির্যাতন করেছে, তুলে দিয়েছে পাকিস্তানি বর্বরদের হাতে; তাদের সাথে আপস কোনভাবেই সম্ভব নয়, এ কথা সুফিয়া কামাল খুব ভালভাবেই জানতেন। তাঁর নৈতিকতা তাঁকে এই কথাই বলে। যে মানুষদের বুকের রক্তে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে, তাদের ত্যাগের কথা ভুলে গিয়ে শহীদ

মুক্তিযোদ্ধাদের স্বজনদের পাশে না থেকে সেই ঘৃণ্য ঘাতক দালালদের অত্যাচার মুখ বুজে মেনে নেয়া সুফিয়া কামালের নৈতিকতা-মূল্যবোধে ছিল না।

সুফিয়া কামাল আমরণ মানুষের সাথে থেকেছেন, মানুষের পাশে থেকেছেন। তাঁর কণ্ঠে আজীবন এই কথাই ছিল- "মানবমুক্তি না হওয়া পর্যন্ত নারীমুক্তি হবে না, নারীমুক্তি না হলে মানবমুক্তি হবে না।"[১০৭] (বেগম, ১৯৮৯, পৃষ্ঠা ১৭৮)

মানবমুক্তি ও নারীমুক্তি

সুফিয়া কামাল নারীমুক্তি, নারীর অধিকার আদায়ের আন্দোলন নিয়ে কাজ করেছেন কিন্তু তিনি উপলব্ধি করেছেন মানুষ হিসেবে নারী ও পুরুষ উভয়ের যদি মুক্তি না মেলে তবে এককভাবে নারীমুক্তির অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য অর্জন সম্ভব হবে না। আবার এককভাবে নারীমুক্তি না হলেও মানব মুক্তি সম্ভব নয়।

সুফিয়া কামাল তাঁর জীবনে বেগম রোকেয়ার কথা ও আদর্শকে মেনে চলতেন এ বিষয়ে আমরা যোগ্য প্রমাণ পাই তাঁর জীবনাচরণে।

> যদি সমাজের কাজ করিতে চাও, তবে গায়ের চামড়াকে এতখানি পুরু করিয়া লইতে হইবে, যেন নিন্দা-গ্লানি, উপেক্ষা-অপমান কিছুই তাহাকে আঘাত করিতে না পারে, মাথার খুলিকে এমন মজবুত করিয়া লইতে হইবে, যেন ঝড়-ঝঞ্ঝা, বজ্রবিদ্যুৎ সকলই তাহাতে প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসে।[১০৮] (বেগম, ১৯৮৯,পৃষ্ঠা ৭০)

তিনি তাঁর সংগ্রামী জীবনে কখনোই কারো নিন্দা শুনে পিছ-পা হন নি। প্রাণের ভয় তাঁকে সরিয়ে আনতে পারেনি তাঁর বিবেকের কাছ থেকে। আর প্রলোভন তাঁকে কিনতে পারেনি কখনোই। এই নম্র মমতাময়ী মানুষটি মানুষের প্রতি ছিলেন অসীম আন্তরিক। ব্যবহারে ছিলেন কোমল স্বভাবের। কিন্তু অন্যায়ের সামনে আবার এই নম্র-কোমল স্বভাবের মানুষটিই বজ্রকঠোর। তাঁর ব্যক্তিত্বের সামনে অন্যায় রক্তচক্ষু হয়ে পড়তো নিতান্ত কোণঠাসা। সমাজের কোন নেতিবাচক শক্তি তাঁর পথকে অবরুদ্ধ করতে পারেনি, থামিয়ে দিতে পারে নি তাঁর সংগ্রামী পথচলা।

> তাঁর জীবনদর্শনের কেন্দ্রে ছিল মানুষের জন্যে কাজ, মানুষের জন্যে কল্যাণ। এই চেতনাকে ঘিরেই আবর্তিত গোটা জীবন, তার কাজ। সুফিয়া কামাল তার সমগ্র জীবনকে উৎসর্গ করেছিলেন মানুষের মঙ্গলের জন্য।[১০৯] (হক, ২০১৩, পৃষ্ঠা ৫৩)

তথ্য নির্দেশ

১. হক, নাসিমা (২০১৩), *শতাব্দীর সাহসিকা সুফিয়া কামাল,* ঢাকা: ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ।

২. মোহান্ত, দীপংকর (১৯৯৯), *লীলা নাগ,* ঢাকা: বাংলা একাডেমী।

৩. দাশপুরকায়স্থ, ড. নিবেদিতা (১৯৯৯), *মুক্তি মঞ্চে নারী,* ঢাকা: প্রিপ ট্রাস্ট।

৪. মোহান্ত, দীপংকর (১৯৯৯), পূর্বোক্ত।

৫. মোহান্ত, দীপংকর (১৯৯৯), *লীলা রায় ও বাংলার নারী জাগরণ,* ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ।

৬. *শ্রীহট্ট ব্রাহ্মসমাজের নিয়মাবলী,* ১৯৪৬, শ্রীহট্ট।

৭. মোহান্ত, দীপংকর (১৯৯৯), পূর্বোক্ত।

৮. প্রাগুক্ত।

৯. প্রাগুক্ত।

১০. প্রাগুক্ত।

১১. *The Dhaka University Studies* (1990), Part A, Volume-47, no-1, University of Dhaka.

১২. আনিসুজ্জামান (সম্পা.) (২০০৩), *লীলা নাগ শতবর্ষের শ্রদ্ধাঞ্জলি,* ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ।

১৩. দাশগুপ্ত, কমলা (১৯৬৩), *স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার নারী,* কলিকাতা: জয়শ্রী প্রকাশন।

১৪. জয়শ্রী, (১৩৯৫), *কুঞ্জলতা নাগের ভাষণ,* কলিকাতা: জয়শ্রী প্রকাশন।

১৫. The Dhaka University Studies (1990), পূর্বোক্ত।

১৬. মোহান্ত, দীপংকর (১৯৯৯), পূর্বোক্ত।

১৭. হোসেন, সেলিনা এবং অন্যান্য (সম্পা.) (১৯৯৮), *সংগ্রামী নারী যুগে যুগে, প্রথম খণ্ড,* ঢাকা: বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ।

১৮. পারভিন, শাহিদা (২০১২), *শামসুন নাহার মাহমুদ ও সমকালীন নারীসমাজের অগ্রগতি,* ঢাকা: বাংলা একাডেমী।

১৯. প্রাগুক্ত।

২০. *বুলবুল,* মাঘ, তৃতীয় বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ১৩৪৩।

২১. মনিরুজ্জামান, মোহাম্মদ (২০০৫), *সাময়িকপত্রে সাহিত্যচিন্তা সওগাত,* ঢাকা: বাংলা একাডেমী।

২২. পারভিন, শাহিদা (২০১২), পূর্বোক্ত।

২৩. দাশপুরকায়স্থ, ড. নিবেদিতা (১৯৯৯), পূর্বোক্ত।

২৪. প্রাগুক্ত।

২৫. সুলতানা, সালেহা (২০১৬), *সুফিয়া কামালের জীবনদৃষ্টি ও সাহিত্যকর্ম,* ঢাকা: অয়ন প্রকাশন ।

২৬. দাশপুরকায়স্থ, ড. নিবেদিতা (১৯৯৯), পূর্বোক্ত।

২৭. পারভিন, শাহিদা (২০১২), পূর্বোক্ত।

২৮. প্রাগুক্ত।

২৯. প্রাগুক্ত।

৩০. জামান, সেলিনা বাহার (সম্পা), (২০০০), *বেগম শামসুননাহার মাহমুদ স্মারকগ্রন্থ,* ঢাকা: বুলবুল পাবলিশিং হাউস।

৩১. দাশপুরকায়স্থ, ড. নিবেদিতা (১৯৯৯), পূর্বোক্ত।

৩২. পারভিন, শাহিদা (২০১২), পূর্বোক্ত।

৩৩. কামাল, সাজেদ (সম্পা) (২০০২), *সুফিয়া কামাল রচনাসংগ্রহ প্রথম খণ্ড*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী।

৩৪. আশরাফ, কাজী মহম্মদ (২০১০), *জীবনী গ্রন্থমালা সুফিয়া কামাল*, ঢাকা: কথা প্রকাশ।

৩৫. কামাল, সাজেদ (সম্পা) (২০০২), পূর্বোক্ত।

৩৬. হক, নাসিমা (২০১৩), পূর্বোক্ত।

৩৭. প্রাগুক্ত।

৩৮. কামাল, সাজেদ (সম্পা) (২০০২), পূর্বোক্ত।

৩৯. বেগম, মালেকা (সম্পা) (১৯৯৭), *রাজপথে জনপথে সুফিয়া কামাল*, ঢাকা: আগামী প্রকাশনী।

৪০. কামাল, সাজেদ (সম্পা) (২০০২), পূর্বোক্ত।

৪১. হক, নাসিমা (২০১৩),পূর্বোক্ত।

৪২. প্রাগুক্ত।

৪৩. প্রাগুক্ত।

৪৪. সুলতানা, ইয়াছমিন (২০১১), *সুফিয়া কামাল নারী নেতৃত্ব ও সাহিত্যকৃতি*, ঢাকা: ঝিনুক প্রকাশনী।

৪৫. হক, নাসিমা (২০১৩),পূর্বোক্ত।

৪৬. সুফিয়া কামাল (২০১৩), *কবিতাসমগ্র*, ঢাকা: হাওলাদার প্রকাশনী।

৪৭. প্রাগুক্ত।

৪৮. প্রাগুক্ত।

৪৯. বেগম, মালেকা (১৯৮৯), *বাংলার নারী আন্দোলন*, ঢাকা: দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লি:।

৫০. প্রাগুক্ত।

৫১. প্রাগুক্ত।

৫২. আনিসুজ্জামান (সম্পা) (২০০৩), পূর্বোক্ত।

৫৩. বেগম, মালেকা (১৯৮৯), পূর্বোক্ত।

৫৪. পারভিন, শাহিদা (২০১২), পূর্বোক্ত।

৫৫. প্রাগুক্ত।

৫৬. জাহাঙ্গীর, সেলিম (১৯৯৯), *সুফিয়া কামাল*, ঢাকা: বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী।

৫৭. বেগম, মালেকা (১৯৮৯), পূর্বোক্ত।

৫৮. প্রাগুক্ত।

৫৯. প্রাগুক্ত।

৬০. কামাল, সাজেদ (সম্পা) (২০০২), পূর্বোক্ত।

৬১. বেগম, মালেকা (১৯৮৯), পূর্বোক্ত।

৬২. কামাল, সাজেদ (সম্পা), (২০০২), পূর্বোক্ত।

৬৩. প্রাগুক্ত।

৬৪. বেগম, মালেকা (১৯৮৫), *নারীমুক্তি আন্দোলন,* ঢাকা: বাংলা একাডেমী।

৬৫. প্রাগুক্ত।

৬৬. নাসিরউদ্দীন, মোহাম্মদ (সম্পা)(১৯৮৫), *বাংলা সাহিত্যে সওগাত যুগ,* ঢাকা: সওগাত প্রেস।

৬৭. প্রাগুক্ত।

৬৮. প্রাগুক্ত।

৬৯. চৌধুরী, আবুল আহসান (২০১০), *সুফিয়া কামাল অন্তরঙ্গ আত্মভাষ্য,* ঢাকা: প্রথমা প্রকাশনা।

৭০. আনিসুজ্জামান (সম্পা) (২০০৩), পূর্বোক্ত।

৭১. রায়, গোপালচন্দ্র (১৯৭২), *ঢাকায় রবীন্দ্রনাথ,* কলকাতা: সাহিত্য সনদ।

৭২. আনিসুজ্জামান (সম্পা) (২০০৩), পূর্বোক্ত।

৭৩. মোহান্ত, দীপংকর (১৯৯৯), পূর্বোক্ত।

৭৪. প্রাগুক্ত।

৭৫. প্রাগুক্ত।

৭৬. প্রাগুক্ত।

৭৭. প্রাগুক্ত।

৭৮. কামাল, সাজেদ (সম্পা) (২০০২), পূর্বোক্ত।

৭৯. *প্রবাসী,* (১৩৩৮) (২য় খণ্ড), মাঘ, ৪র্থ সংখ্যা, ৩১শ ভাগ।

৮০. আনিসুজ্জামান (সম্পা) (২০০৩), পূর্বোক্ত।

৮১. প্রাগুক্ত।

৮২. মোহান্ত, দীপংকর (১৯৯৯), পূর্বোক্ত।

৮৩. প্রাগুক্ত।

৮৪. প্রাগুক্ত।

৮৫. আনিসুজ্জামান (সম্পা) (২০০৩), পূর্বোক্ত।

৮৬. পারভিন, শাহিদা (২০১২), পূর্বোক্ত।

৮৭. প্রাগুক্ত।

৮৮. প্রাগুক্ত।

৮৯. প্রাগুক্ত।

৯০. প্রাগুক্ত।

৯১. প্রাগুক্ত।

৯২. প্রাগুক্ত।

৯৩. প্রাগুক্ত।

৯৪. হক, নাসিমা (২০১৩), পূর্বোক্ত।

৯৫. জাহাঙ্গীর, সেলিম (১৯৯৯), পূর্বোক্ত।

৯৬. হক, সৈয়দ শামসুল (সম্পা) (২০০০), *জননী সাহসিকা বেগম সুফিয়া কামাল শেষ প্রণতি,* ঢাকা: অন্যপ্রকাশ।

৯৭. কামাল, সাজেদ (সম্পা), (২০০২), পূর্বোক্ত।

৯৮. প্রাগুক্ত।

৯৯. কামাল, সুলতানা (২০০৯), *ছিলাম কোথায় যেন নীলিমার নিচে,* ঢাকা: জাগৃতি প্রকাশনী।

১০০. হক, সৈয়দ শামসুল (সম্পা.) (২০০০), পূর্বোক্ত।

১০১. সুফিয়া কামাল (২০১৩), *কবিতা সমগ্র,* ঢাকা: হাওলাদার প্রকাশনী।

১০২. হক, সৈয়দ শামসুল (সম্পা.) (২০০০), পূর্বোক্ত।

১০৩. জাহাঙ্গীর, সেলিম (১৯৯৯), পূর্বোক্ত।

১০৪. কামাল, সুফিয়া(১৯৮৯), *একাত্তরের ডায়েরী,* ঢাকা: হাওলাদার প্রকাশনী।

১০৫. সুফিয়া কামাল (২০১৩), পূর্বোক্ত।

১০৬. বেগম, মালেকা (সম্পা) (১৯৯৭), *রাজপথে জনপথে সুফিয়া কামাল,* ঢাকা: আগামী প্রকাশনী।

১০৭. বেগম, মালেকা (১৯৮৯), পূর্বোক্ত।

১০৮. প্রাগুক্ত।

১০৯. হক, নাসিমা (২০১৩), পূর্বোক্ত।

তৃতীয় অধ্যায়

৩.১ নারীর শিক্ষা ও ক্ষমতায়ন: প্রাসঙ্গিক পরিপ্রেক্ষিত

নারীর শিক্ষা ও ক্ষমতায়ন এই দুটি প্রসঙ্গে আলোচনার শুরুতে মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশের দিকে আলোকপাত করা প্রাসঙ্গিক। 'সৃষ্টির প্রথম থেকে মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশে স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্ক যেমন বহুমুখী তেমন বৈচিত্র্যময়। এই সম্পর্ক কখনও সহকর্মীর, কখনও সহযোদ্ধার, কখনও সাহেব-বাদীর, কখনও শোষক-শোষিতের, কখনও মালিক-শ্রমিকের। তবে সভ্যতার শুরুতে মানুষে-মানুষে বা নারী-পুরুষের মধ্যে তেমন কোন পার্থক্য ছিল না। সমাজ পরিবর্তন ও বিবর্তনের সাথে সাথে নারী-পুরুষ, তথা মানুষে-মানুষে বিভেদ সৃষ্টি হতে থাকে। ক্রমশ ব্যক্তিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও আর্থিক প্রেক্ষাপটে এই পার্থক্য বাড়তে থাকে। এই পার্থক্যের কারণ নিরূপণ এবং তা সমাধানের উপায় নির্ধারণের ক্ষমতা অর্জনের প্রধান মাধ্যম হলো শিক্ষা। মানুষের মৌলিক অধিকারগুলোর মধ্যে অন্যতম অধিকার শিক্ষা মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিকে বিকশিত করে, নিজের অস্তিত্বকে উপলব্ধি করতে শেখায়। এটি মানব উন্নয়নে অত্যাবশ্যকীয় উপাদানও বটে। অথচ নারী এবং পুরুষ মিলেই মানব সমাজ। কিন্তু যুগ যুগ ধরে এই শিক্ষা সমাজের অধিকাংশ ক্ষেত্রে তথা নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে আরও বেশি উপেক্ষিত হয়েছে। শতাব্দীর পর শতাব্দী জুড়ে শিক্ষার অভাব নারীকে করেছে পরাধীন, শৃঙ্খলিত এবং বৈষম্যপীড়িত। এই বঞ্চনা ও নিপীড়ন তাদের মানুষ হিসেবে করেছে অধিকারবোধহীন, সচেতনতাবোধহীন, প্রতিবাদহীন। বলতে গেলে নির্জীব প্রায়। বাঁচার এ লড়াইয়ে প্রাচীন যুগ থেকে সভ্যতার বিবর্তনের ধারায় ধীরে ধীরে মানুষ শিক্ষার গুরুত্বকে উপলব্ধি করতে পেরেছে। নানা চড়াই-উৎরাই, ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে সে তার অধিকার অর্জনের সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছে। নারী শিক্ষার ক্ষেত্রেও এর ব্যত্যয় বা ব্যতিক্রম ঘটেনি। প্রাচীন যুগ থেকে এভাবেই রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের সাথে সাথে সভ্যতা, সমাজ, সংস্কৃতি, শিক্ষা, অর্থনীতি ইত্যাদির উত্থান-পতন, বিস্তার, বিকাশ, নারীশিক্ষার উদ্ভব তথা নারীর অগ্রগতির উপর প্রভাব ফেলেছে।[১] (আকবর এবং অন্যান্য, ১৯৯৮, পৃষ্ঠা ১)

ভারত উপমহাদেশেও প্রাচীন কালে মাতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা ছিল। যেখানে সমাজ ও অর্থনৈতিক জীবনে নারীর প্রাধান্য বিদ্যমান ছিল। 'দ্রাবিড়দের মধ্যে সামাজিক ব্যবস্থাতে নারীর প্রাধান্য ছিল। এদের একদল যেমন নারীর স্বেচ্ছাচার মানত তেমনি এদের উচ্চতর অংশ বৈরাগ্য ও সন্ন্যাসধর্মকে নারীর ভূষণ মনে করত। দ্রাবিড়দের মধ্যে নারীদেরই প্রভুত্ব এবং কর্তৃত্ব প্রচলিত ছিল। দ্রাবিড়দের সমাজ ছিল মাতৃতান্ত্রিক। নারীরা স্বেচ্ছায় পুরুষ নির্বাচন করে সংসার করত। নারীর এই প্রাধান্যের কারণেই সে সময় বংশ ও অধিকার পুত্রগত ছিল না, ছিল কন্যাগত। ক্রমে আর্যদের আগমন ঘটল এ দেশে। আর্যদের প্রাথমিক অবস্থায় সমাজে নারীদের সম-অধিকার ও মর্যাদার বিষয়ে বহু তথ্য প্রাচীন সাহিত্যে পাওয়া যায়। মহাভারতে কোথাও কোথাও অশাস্ত্রা বললেও নারীদের শিক্ষার কথা বলা হয়েছে। ঋগ্বেদের যুগে নারীর সমমর্যাদার কথা জানা যায়। বেদের মন্ত্রে কেউ কেউ নারীদের অধিকার না দিলেও জানা যায় বহু বেদমন্ত্র মেয়েদেরই রচিত। মৈত্রেয়ী, গার্গী প্রমুখ ব্রহ্মবাদিনী বিজ্ঞজনের সভা-সমাবেশে যোগ দিতেন। নরনারীর পার্থক্য আর্যসমাজের প্রথমদিকেও একেবারেই ছিল না। আবার এটাও লক্ষণীয় যে মেয়েদের অন্তঃপুর ও অবরোধ প্রথার কথা মহাভারতে আছে। সহমরণ প্রথা তখন ছিল না। ঐতিহাসিকরা বলেন, খুব প্রাচীনকালে ইউরোপ ও পশ্চিম এশিয়ার আর্য জাতির মধ্যে সহমরণ প্রথা প্রচলিত ছিল।

অনার্যদের কাছ থেকেই এই প্রথা আর্যসমাজে এসেছে। পঞ্চনদ প্রদেশের তক্ষশিলা অঞ্চলে গ্রিকদের প্রভাব ছিল বলে প্রমাণ আছে। খ্রিস্টের তিন-চারশ' বছর আগে সেসব স্থানে সতীদাহ বেশি হত।[২] (বেগম, ১৯৮৯, পৃষ্ঠা- ১, ২)

'খ্রিস্টপূর্ব ২০০০ সাল থেকে মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা লুপ্ত হওয়ার সাথে সাথে সমাজে নারীর প্রাধান্য ক্ষুণ্ণ হয়। পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় নারী তার অধিকার এবং মর্যাদা হারায়, তার স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হয়। নারীকে শৃঙ্খলিত করে পুরুষ তার অধীনস্ত করে, নানাভাবে বৈষম্য ও নির্যাতনের শিকার হয় নারী। তার মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয়। পুরুষের উদ্বৃত্ত সম্পদ সঞ্চয়ের সাথে সাথে নারীকে পুরুষ তার ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত করে। নারীর গর্ভে নিজের সন্তান ধারণের মাধ্যমে নারীকে গৃহবন্দি করে। সাথে সাথে উৎপাদন প্রক্রিয়া থেকে নারীকে বিযুক্ত করা হয়। এভাবেই নারীকে বাইরের জগত থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়। ক্রমশ সমাজে নারীর অধস্তন অবস্থান নির্ণিত হয়। আর তা নির্ণয় করা হয় ধর্মীয় বিধান, সামাজিক অনুশাসন, বৈষম্যমূলক ও নিপীড়নমূলক আইন দ্বারা।

খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে বৌদ্ধধর্মের আবির্ভাব ঘটলেও তার অহিংসা আর সমতার বাণী সনাতন হিন্দুধর্মকে খুব একটা প্রভাবিত করতে পারেনি। মনু ও অন্যান্য পণ্ডিতদের দ্বারা রচিত 'মনুসংহিতা' প্রথম ও দ্বিতীয় খ্রিস্টাব্দ থেকেই হিন্দু ধর্মের মূল আইনগত ভিত্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা পায়। এই সময়ে বর্ণপ্রথা সুদৃঢ় হয়, বাল্যবিবাহ আইনসিদ্ধ হয়, বিধবা বিবাহ নিষিদ্ধ হয়, সতীদাহ প্রথা চালু হয়, পিতা ও পতির সম্পত্তি থেকে নারীকে বঞ্চিত করা হয়। মুসলমান ধর্মে নারীর সম্পত্তিতে আংশিক উত্তরাধিকার, শর্তযুক্ত তালাক দেওয়ার অধিকার, সন্তানের অভিভাবত্ব, পুনর্বিবাহের অধিকার থাকে- যা হিন্দুধর্মে ছিল না। কিন্তু পুরুষের বহুগামিতা মুসলমান সমাজে আইনগত সিদ্ধ ছিল। মুসলমান ধর্মে নারীদের উপর অবরোধ প্রথাসহ নানান সামাজিক অনুশাসন কঠোরভাবে আরোপ করা হয়। সে সময় হিন্দু নারীদের জন্যও অবরোধ প্রথা প্রচলিত ছিল। সতীত্ব রক্ষা যার অন্যতম মূল কারণ ছিল। যদিও পুরুষের স্বার্থে শাসকদের মনোরঞ্জনের জন্য নারীকে, নারীর দেহকে ব্যবহার করা হত। অবরোধ প্রথার নামে নারীকে সকল সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন রাখা হয়; যেখানে পুরুষের একচেটিয়া কর্তৃত্ব বহাল থাকে। শিক্ষা-দীক্ষায়, জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, মননে-মননশীলতায়, সামাজিক-রাজনৈতিক নেতৃত্বে, যুক্তি-তর্কে, সৃজনশীলতায়, শৌর্যে-বীর্যে পুরুষ নারীকে পিছনে ফেলে অনেক অগ্রসর হয়ে যায়। মানুষ হিসেবে নারীর স্বাভাবিক বিকাশের পথ রুদ্ধ বা সীমিত হয়ে যায়। তারপরও পর্দা প্রথায় অবরোধ থেকেও রাজ্য শাসন এবং যুদ্ধক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারীর পারদর্শিতা দেখা যায়। এক্ষেত্রে সুলতানা রাজিয়া, চাঁদ সুলতানার নাম উল্লেখযোগ্য। নাটোরের রাণী ভবানীর বীরত্বগাঁথাও প্রবাদপ্রতিম হয়ে আছে।[৩] (বানু, ২০১২ এপ্রিল-জুন, পৃষ্ঠা-১০, ১১)

পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় নারীর অবস্থানের অবনতির ফলাফল নারীর প্রতি যেকোনো বিষয়ে মূল্যায়নে প্রকাশ পেত, দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রকাশ পেত। একজন নারীরও যে একজন পুরুষের মতো মেধা, চিন্তাশক্তি ও কর্মশক্তি রয়েছে তা পুরুষ সমাজ ভুলে গিয়েছিল। ভুলে গিয়েছিল নারী পুরুষের মতই মানব সমাজের অর্ধাংশ। যদিও পুরুষ শাসিত সমাজ নারীকে তার স্থান চ্যুত করেছে। নারীকে সমাজের চালিকা প্রণালি থেকে সরিয়ে রেখেছে বহুক্রোশ দূরে। নারীর মতামত দেওয়ার, সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকারকে করেছে অবরুদ্ধ। পুরুষ সমাজে উত্তরাধিকার হিসেবে যেহেতু কোন নারীকে স্থান দেওয়া হয় না, সেহেতু তার শিক্ষা বা মেধা-মননের বিকাশ দিয়ে পুরুষ সমাজ বহু যুগ ভ্রূক্ষেপও করেনি। ঘরের চার দেয়ালে অসূর্যম্পশী রেখেছে নারীর মনুষ্য জীবনকে। সেই অন্ধকার অবস্থা থেকে নারীর আলোর পথে আসার একমাত্র মাধ্যম ছিল শিক্ষা। কারণ শিক্ষাই পারে মানুষের জড়ত্বকে ঘুচিয়ে দিয়ে আপন শক্তিতে সবল হয়ে উঠতে, বিচার-বিশ্লেষণ দক্ষতার উন্মেষ ঘটিয়ে সচেতন করে তুলতে। পুরুষ সমাজ বিলক্ষণ জানত যে নারীর জন্য যদি শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত করা হয়, তবে তাকে অবদমিত

রাখা বা ভোগ্যপণ্য করে রাখা যাবে না। নারীর এই হীন অবস্থান দূর হওয়ার একমাত্র উপায় শিক্ষা লাভ ও জ্ঞানার্জন। তাই নারীর জাগরণ যদি হয় তবে শিক্ষার মাধ্যমেই হতে পারে।

'মনুর বিধান, মুসলিম ধর্মীয় বিধিনিষেধের দোহাই দিয়ে সমাজপতিরা, ধর্মীয় নেতারা এই অঞ্চলে সামন্তবাদী সমাজব্যবস্থায় নারীদের জীবনকে অভিশপ্ত করে রেখেছিলেন। যুগের পর যুগ নারীসমাজকে কুসংস্কারের অন্ধকারে নিমজ্জিত করে রেখেছিলো। ঊনবিংশ শতাব্দীর আগ পর্যন্ত নারীদের এই অবস্থা থেকে উত্তরণের কোন পদক্ষেপ বা সংগঠিত কোন আন্দোলনের কথা আমাদের জানা নেই।[৪] (বানু, ২০১২ এপ্রিল-জুন, পৃষ্ঠা- ১১)

ঊনবিংশ শতাব্দীতে এসে ভারতবর্ষ তথা বাংলার নবজাগরণের যুগের উন্মেষ ঘটতে শুরু করে। 'সমাজ সংস্কারমূলক উদ্যোগ নিয়ে নারীসমাজের সামাজিক দুর্গতি দূর করার জন্য উনিশ শতকের পুরো সময়জুড়ে বাংলার ইংরেজি শিক্ষিত ব্যক্তিদের অবদান সৃষ্টি করেছে এ দেশের নারীমুক্তি ও নারী জাগরণের পটভূমি। একই সময়ে তাদের উদ্যোগে সৃষ্টি হয়েছে এ দেশের মেয়েদের শিক্ষার জন্য তৎপরতা। বাঙালি মেয়েরা উনিশ শতকের গোড়ার দিকে লেখাপড়ার সুযোগ মোটেও পেত না। অভিজাত পরিবারে ও বৈষ্ণবীদের মধ্যে লেখাপড়ার নিজস্ব ধাঁচের ও সনাতনী ধারার চল ছিল। এই প্রেক্ষাপটে ব্যাপকভাবে মেয়েদের লেখাপড়ার সুযোগ সৃষ্টির জন্য নবযুগের ব্যক্তিদের প্রচেষ্টার ফলে বাংলার নারী জাগরণের সূচনা ঘটেছে।[৫] (বেগম, ১৯৮৯, পৃষ্ঠা- ২৮)

ব্রিটিশ শাসনামলে শিক্ষা-দীক্ষায় হিন্দু সমাজ তুলনামূলক উন্নত ও অগ্রসর ছিল। তাই মুসলিম নারী সমাজের চেয়ে হিন্দু নারীসমাজ শিক্ষার বিষয়ে বেশ এগিয়ে ছিল। হিন্দু নারী সমাজের অধিকার নিয়ে আন্দোলনকারী নেত্রীদের মধ্যে পণ্ডিত রমাবাঈ (১৮৫৬- ১৯২২) ছিলেন অগ্রগণ্য। রমাবাঈকে এ কাজের জন্য ধর্মীয় ও সামাজিক নির্যাতনের শিকার হতে হয়েছিল। কিন্তু তিনি জীবনের শেষদিন পর্যন্ত স্বাধীন জীবন যাপন করেছেন। সমাজের কোন বাধা তাঁর পথ রুখতে পারেনি।

গবেষণার আলোকে দেখা যায়, হিন্দু নারী সমাজের পর বাংলার পশ্চাদপদ মুসলমান নারী সমাজের মুক্তির জন্য যিনি মশাল হাতে এগিয়ে এসেছেন তিনি বেগম রোকেয়া। তিনি নারীদের অবরোধবাসিনী অবস্থা থেকে উত্তরণের পথে নিয়ে আসেন। তবে এ কথা স্বীকার করতে হবে যে, প্রথম দিকে নারী মুক্তির বাহক ও ধারক ছিলেন পুরুষেরা। কারণ, সেকালে সমাজের কিছু পুরুষও বুঝতে পেরেছিলেন, নারীকে পশ্চাতে রেখে শুধু পুরুষ একা এগিয়ে গেলে সমাজের সামঞ্জস্য বিনষ্ট হবে। সমাজে প্রগতির প্রকৃত অর্থ সমাজে নারী পুরুষের সম্মিলিত আবদান, একত্রে এগিয়ে চলা। নারীকে অন্ধকারে রেখে পুরুষের প্রগতি বেশি দূর এগোতে পারে না। এই উপলব্ধি থেকে রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয় কুমার, ভূদেব, প্যারিচাঁদ মিত্র, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ ব্যক্তি সমাজের কুপ্রথার বিরুদ্ধে লড়াই করে গেছেন। তাঁরা বুঝতে পরেছিলেন সমাজের উন্নয়ন শুধু একপেশে পুরুষের মাধ্যমে আসতে পারবে না। তাঁরা পুরুষ সমাজের অংশ হলেও তথাকথিত পুরুষতান্ত্রিক চিন্তা থেকে বের হয়ে গোটা সমাজের কথা ভেবেছেন। ভেবেছেন নারী সমাজকে অবরুদ্ধ অবস্থা থেকে মুক্তি দিতে। তবেই সমাজে সামঞ্জস্য আসবে এবং প্রকৃত প্রগতি ও উন্নয়ন সাধিত হবে।[৬] (দাশপুরকায়স্থ, ১৯৯৯, পৃষ্ঠা- ১৪)

১৮১৫ সালে রাজা রামমোহন রায় তাঁর 'আত্মীয় সভার' খসড়া কর্মসূচীতে 'নারী অধিকার ও শিক্ষা' বিষয়টি বিশেষভাবে উল্লেখ করেন। তাছাড়া ডিরোজিও প্রতিষ্ঠিত ইয়ংবেঙ্গল, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'তত্ত্ববোধিনী সভা ও ব্রাহ্ম সমাজ' নারী স্বাধীনতার পক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন। আর ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষে খ্রিষ্টান মিশনারীরা স্ত্রী শিক্ষা প্রসারে এগিয়ে আসেন। ১৮২১

সালে কলকাতা স্কুল সোসাইটির কাছে স্ত্রী শিক্ষা বিস্তারে মিস মেরী আনকুক সাহায্য প্রার্থনা করেন। তাঁর প্রস্তাবে স্কুল সোসাইটি সাহায্য না করলেও মিশনারী সোসাইটির উদ্যোগে ৮টি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়। মদনমোহন তর্কালঙ্কার নারী শিক্ষা উপযোগী পাঠ্যপুস্তক রচনায় হাত দেন এবং তাঁর দুই মেয়ে ভুবনমালা ও কুন্দমালাকে এই স্কুলে ভর্তি করেছিলেন। এবপরে ১৯৪৮ সালে প্রতিষ্ঠিত বেথুন বালিকা বিদ্যালয়ের হাত ধরে বাঙালি নারীদের ধারাবাহিক প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার চলা শুরু হয়।

বিদ্যালয়ের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যতীত স্বামীর কাছে লেখাপড়া শিখে কয়েকজন নারী খ্যাতি লাভ করেন যেমন- কৈলাশবাসিনী দেবী, স্বর্ণময়ী দেবী, রামাসুন্দরী, কুমুদিনী, নিস্তারিণী দেবী, জ্ঞানদানন্দিনী প্রমুখ। প্রথম ভারতীয় আই.সি.এস. 'ঠাকুর বাড়ির' সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর স্ত্রী জ্ঞানদানন্দিনীকে গড়ে তুলেছিলেন নিজের যোগ্য সঙ্গিনী রূপে। বাঙালি নারী সমাজের শিক্ষার ক্ষেত্রে ঠাকুর বাড়ির ভূমিকা অনস্বীকার্য। প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর এবং দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর- ঠাকুর বাড়িকে নতুন সংস্কৃতির সাথে পরিচয় করিয়েছিলেন। ঠাকুর বাড়ির নারীরা সমাজের প্রতিকূলতার সাথে লড়াই করতে পেরেছেন, সমাজের গোঁড়ামিকে উপেক্ষা করতে পেরেছেন কারণ তাদের পিছনে ছিল বাড়ির পুরুষদের সহযোগিতা। শিল্প, সাহিত্য, সঙ্গীত, নাট্যকলা থেকে শুরু করে স্বদেশের কাজে, সভা সমিতির কাজে তাঁরা নিজেদের সম্পৃক্ত করেছিলেন। নারী শিক্ষা ও নারী মুক্তির কাজে স্বর্ণকুমারী দেবী, জ্ঞানদানন্দিনী দেবী নিজেদের সম্পৃক্ত করেছিলেন। নারী সমাজকে অবগুণ্ঠন মুক্ত করার ব্যাপারে তাঁদের উদ্যোগ ছিল উল্লেখযোগ্য।

সমাজের ভিন্ন অবস্থানে থেকে স্বামী বিবেকানন্দ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় সমাজের অবস্থা উপলব্ধি করে স্বদেশের নারী সমাজের উন্নয়ন ও উত্তরণ চেয়েছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন সমাজে শিক্ষা ও সংস্কৃতির সাথে সাথে নারীর মূল্যায়ন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, পুরুষের সমান্তরালে শিক্ষা-দীক্ষায় নারীকে সমান দক্ষতা অর্জনের পথে এগিয়ে নেওয়ার দিন চলে এসেছে। স্বামী বিবেকানন্দ বলিষ্ঠ কণ্ঠে বলেছিলেন, "যদি তোমাদের মেয়েদের উন্নতি করিতে পার তবে আশা আছে। নতুবা পশু জন্ম ঘুচিবে না। ... আমি পুরুষগণকে যাহা বলিয়া থাকি, নারীগণকে ঠিক তাহাই বলিব। ... নারীগণকে এমন যোগ্যতা অর্জন করাইতে হইবে, যাহাতে তাহারা নিজেদের সমস্যা নিজেদেরভাবে মীমাংসা করিয়া লইতে পারে। তাহাদের হইয়া অপর কেহ এ কার্য করিতে পারে না। করিবার চেষ্টা করাও উচিত নয়। আর জগতের অন্যান্য দেশের মেয়েদের মতো আমাদের মেয়েরাও এ যোগ্যতা লাভে সমর্থ।"[৭] (দাশপুরকায়স্থ, ১৯৯৯, পৃষ্ঠা- ১৬) নারীর শিক্ষা লাভের ফলশ্রুতিতে যদি তাদের মধ্যে আত্মনির্ভরশীলতা না আসে তবে সমাজে সমতা আসবে না। নারী সমাজের ভেতরে আত্মনির্ভরশীলতা আসতে গেলে প্রয়োজন শিক্ষা অর্জনের প্রতি নিজেদের তাগিদ ও সচেতনতা। পুরুষদের সাথে সমান তালে চলার শক্তি নিজেকেই জোগাতে হবে, অপর কেউ ভেতরের এই শক্তি জাগিয়ে তুলতে পারবে না।

নারী জাতির নিজেদের ভালো যে নিজেদেরকেই বুঝে নিতে হবে এই বিষয়টি মনে প্রাণে অনুধাবন করেছিলেন বাঙালি মুসলিম নারী সমাজের মুক্তির পথিকৃৎ বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন। তিনি তাঁর ভাইয়ের সাহায্যে লেখাপড়া শিখেছিলেন। অবরোধ প্রথার বেড়া জাল ছিন্ন করে তিনি শিক্ষার পথে বেরিয়ে এসেছিলেন। আত্মনির্ভরশীল হওয়ার তাগিদ থেকেই লেখনি ধরেছিলেন। নিজের চিন্তা-চেতনা ছড়িয়ে দিয়েছিলেন নারী-পুরুষ সবার মাঝে। বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন ১৯০৯ সালে ভাগলপুরে শুরু করেন সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুল। নারী সমাজকে জাগানোর জন্য বেগম রোকেয়ার এই প্রচেষ্টা ছিল নারীদের সংগঠিত করার এক উপায়। তিনি পরিচয় ঘটাতে চেয়েছিলেন নারী সমাজের চিন্তাকে আধুনিক ও প্রগতিশীল চেতনার সাথে। নারীদের শিক্ষার পথে ধর্মীয় গোঁড়ামি, সামাজিক কুসংস্কার ও পুরুষতান্ত্রিকতার যে বাধা তার

বিরুদ্ধে লড়াই করার প্রেরণা যুগিয়েছে বেগম রোকেয়ার লেখনি। তাঁর বলিষ্ঠ প্রচেষ্টার কারণে মুসলমান নারী সমাজ অবরোধ অবস্থা পিছনে ফেলে সামনে এগিয়ে আসার শক্তি ও সাহস পেয়েছিলো। নারী সমাজের মুক্তির পথিকৃৎ বেগম রোকেয়ার অকাল প্রয়াণে তাঁর দেখা অনেক স্বপ্নই থেকে গিয়েছিল অপূর্ণ। কিন্তু বেগম রোকেয়ার অপূর্ণ স্বপ্ন পূরণের ভার নিয়ে এগিয়ে আসেন তাঁর উত্তরসূরিরা। একদিন বেগম রোকেয়াই যাঁদের মনে জ্বালিয়েছিলেন প্রেরণার প্রদীপ। তাঁদের মধ্যে শামসুন নাহার মাহমুদ, সুফিয়া কামাল, লীলা নাগ প্রমুখ ব্যক্তির নাম অগ্রগণ্য। তাঁরা আজীবন লড়াই করেছেন, পথ চলেছেন নারী সমাজের মুক্তির জন্য। স্ব স্ব অবস্থানে থেকে নারীদের শিক্ষার জন্য তাঁরা কখনো সামাজিক, কখনো সাংস্কৃতিক, কখনো রাজনৈতিকভাবে লড়াই করেছেন। নারী সমাজকে বিশ্বদরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে হলে শিক্ষার কোন বিকল্প নেই- এ কথা তাঁরা নিজের জীবন থেকে উপলব্ধি করেছেন।

নারী সমাজ শিক্ষার সাথে সাথে তাদের সামর্থ্য ও অধিকার সম্পর্কে সচেতন হলেও তাদের সামর্থ্যকে কাজে না লাগালে সে শিক্ষা অর্থবহ হয়ে ওঠে না। সে কারণেই বেগম রোকেয়া বলেছিলেন, "কন্যাগুলিকে সুশিক্ষিতা করিয়া কার্যক্ষেত্রে ছাড়িয়া দাও, নিজের অন্ন-বস্ত্র উপার্জন করুক।"[৮] (দাশপুরকায়স্থ, ১৯৯৯, পৃষ্ঠা- ১৬) অধিকার সচেতনতা ও যোগ্যতা অর্জনের সাথে শিক্ষার গভীর সম্পর্ক। আর শিক্ষার সাথে ক্ষমতায়ন-এর সম্পর্কও একই সূত্রে গাঁথা। নারী সমাজ যে যোগ্যতা শিক্ষার মাধ্যমে অর্জন করেছে বা করছে তাকে সমাজের কাজে না লাগালে সমাজের পরিবর্তন ফলপ্রসূ হবে না।

'ক্ষমতায়ন হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে ব্যক্তি নিজের জীবনকে নিয়ন্ত্রণের সক্ষমতা অর্জন করতে পারে। এই সক্ষমতা অর্জন বা ক্ষমতায়নের সূচক হচ্ছে: সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা, পারিবারিক অর্থ লেনদেনে অংশগ্রহণ, সম্পদ অর্জনের ক্ষমতা, আইনের আশ্রয় নেওয়ার ক্ষমতা, প্রজনন ও জন্মশাসনে নিজের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের ক্ষমতা, বিচরণের গণ্ডির প্রসারতা ইত্যাদি। এর পাশাপাশি আত্মবিশ্বাস, আত্মমর্যাদা অর্জনের ক্ষমতাও ক্ষমতায়নের অন্যতম সূচক বলে পরিগণিত হয়। চেন ক্ষমতায়নের চারটি মাত্রা চিহ্নিত করেছেন— সম্পদ, শক্তি, সম্পর্ক, আত্মোপলব্ধি ও অবলোকন।[৯] (হোসেন ও মাসুদুজ্জামান, ২০০৩, পৃষ্ঠা- ৮৩) নিজেদের ক্ষমতায়ন সম্পর্কে নারী সমাজ বহুকাল আত্মবিস্মৃত ছিল। এ বিষয়টি বুঝতে নারীদের বহু যুগ লাগে, তার পেছনে কারণও ছিল অনেক। যদিও নারীদের যৎকিঞ্চিত শিক্ষার অনুমতি ছিল কিন্তু উচ্চশিক্ষার দ্বার ছিল রুদ্ধ। এত কিছুর পরে তৎকালীন সময়ে স্বচ্ছল পরিবারের কোন কোন নারী যদিও লেখাপড়া করার সুযোগ পেয়েছেন কিন্তু জীবিকার প্রসঙ্গে আবার লড়াই করতে হয়েছে সমাজের বাধার সাথে। উনিশ শতকে যখন নারী জীবিকা অর্জনের লড়াইয়ে নামে তখন নারীর জন্য শিক্ষকতা, চিকিৎসা, ধাত্রীবিদ্যা ইত্যাদি পেশাকে আদর্শ বলে ধরে নেওয়া হয়। যাকে বলা হয় নারীসুলভ পেশা।

লক্ষ করা যায়, ১৮৬৬ সালে রাজমণি দেবী শিক্ষকতা পেশায় যোগদান করেন। ত্রিশ টাকা মাসিক বেতন ছিল তাঁর। প্রথম বাঙালি নারী চন্দ্রমুখী বসু এম.এ. পাশ করেন ১৮৮৪ সালে। তিনি বেথুন কলেজে সহকারী তত্ত্বাবধায়ক হন। মাসিক বেতন ছিল পঁচাত্তর টাকা। এরপর ১৮৮৭ সালে বরিশালের মনোরমা মজুমদার শিক্ষকতায় আসেন। তাঁর মাসিক বেতন ছিল ষাট টাকা। লক্ষণীয়, বাঙালি নারী সমাজের ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে আর্থিক উপার্জনের পথে প্রথম পা বাড়ান হিন্দু বিধবারা।

১৮৮৮ সালে প্রথম বাঙালি নারী চিকিৎসক কাদম্বিনী গাঙ্গুলী চিকিৎসকের পেশায় আসেন। এই পেশায় তিনি প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। এরপর তিনি ১৮৯৩ সালে বিলাতে ডিগ্রি নিতে যান। তিনি ছাড়াও যামিনী সেন ১৮৯৯ সালে নেপালে চাকরি করতে যান। তাঁরও বিদেশি ডিগ্রি ছিল। নারীদের এই উচ্চশিক্ষা ও পেশা জীবনের যাত্রা পুরুষ সমাজের চক্ষুশূল হয়ে

দাঁড়িয়েছিলো। পেশাজীবী এই নারীদের বিরুদ্ধে তারা সমাজে বিভিন্নভাবে বিষ উগড়ে দিতে লাগলেন। এক শ্রেণির পুরুষ বলতে লাগলেন, "শিক্ষায় নারী হয় অসতী, শিক্ষিত নারী নষ্ট করে সংসার"। এছাড়া ডাঃ কাদম্বিনী গাঙ্গুলীর বিরুদ্ধে 'বঙ্গ নিবাসী' পত্রিকা তার সম্পাদকীয়তে অশালীনভাবে আক্রমণ করে। পরে কাদম্বিনী দেবী পত্রিকাটির বিরুদ্ধে মানহানীর মামলা করলে পত্রিকার সম্পাদক মহেন্দ্র পাল দোষী সাব্যস্ত হন এবং এক বছর কারাবাস করেন। আরও নির্মম ও লজ্জাকর ঘটনা ঘটে ১৯০২ সালে মালদায়। সমাজে পুরুষের পাশাপাশি নারীরা এগিয়ে আসতে শুরু করলেই সত্যিকারের প্রগতি সম্ভব কিন্তু সেখানে পুরুষ সমাজ নিজেরাই প্রগতির গতিরোধ করে দাঁড়িয়েছিলো। নারীদের পাশে দাঁড়ানোর বদলে নারীকে নাগপাশে বিদ্ধ করার জন্য উদ্যত হয়েছিল পুরুষ সমাজ।[১০] (দাশপুরকায়স্থ, ১৯৯৯, পৃষ্ঠা- ১৭)

নারীর অধস্তন অবস্থান তথা নারীর মানবিকতাপূর্ণ সত্তার অধিকার ও বিকাশের চিন্তা চেতনার সূচনা থেকেই অর্থনীতি ও নারীর সম্পর্ক ও অবস্থান নিয়ে কথা শুরু হয়। দার্শনিক সমাজচিন্তকগণ কয়েক শতাব্দী পূর্ব থেকেই এ চিন্তায় তাঁদের নিজ নিজ ভাবনা তুলে ধরেন। দার্শনিক অর্থনীতিবিদ কনডরসেট (Condorset), কার্ল মার্কস, রাষ্ট্রনীতি বিষয়ক চিন্তক জন স্টুয়ার্ট মিলসহ বেশ কতক দার্শনিক অর্থনীতিবিদ ও পরবর্তীকালে নারীবাদী তাত্ত্বিকগণ আরো অধিক সুস্পষ্ট ও জোরালো যুক্তিসহ নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের প্রয়োজনীয়তার কথা বলতে শুরু করেন। নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন ব্যতীত নারীর মানবাধিকার ও নারী-পুরুষের সমতা বাস্তবে অর্জন সম্ভব নয়।

নারীর ক্ষমতায়ন বিষয়টি নিয়ে অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতাব্দীতে আলোচনার সূচনা ও বিকাশ হতে থাকে। বিংশ শতাব্দীতে এর জোরদার আলোচনা ও কিছু কিছু রাষ্ট্রীয় পদক্ষেপ গ্রহণের সুপারিশ আসতে থাকে। অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্বে এই উপ-মহাদেশে নারীর অর্থনৈতিক কাজ বলতে শিক্ষা দান, সেবা দান, কুটির শিল্প ইত্যাদিতে সীমাবদ্ধ ছিল। শিক্ষা ও কাজের অধিকার নিয়ে নারী অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের রয়েছে সুদীর্ঘ নানামুখী সংগ্রামের ইতিহাস। বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে নারীবাদী তাত্ত্বিকগণ নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন নিয়ে অধিক সুস্পষ্ট ও জোরালোভাবে এবং নারীমুক্তি তথা নারী-পুরুষের মাঝে বৈষম্য দূর করা ও নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার সুগভীর আন্তঃসম্পর্ক ও গুরুত্বের কথা বলতে শুরু করেন। অর্থনীতির সাথে নারীর সম্পর্ক কি ধরনের তা নিয়ে নারী-পুরুষের বৈষম্য দূর করার মাত্রা ও পথ চিহ্নিত করার বিষয়টি আরো সুস্পষ্ট হয়। এ বিষয়ে ১৯৮০-এর দশক থেকে জাতিসংঘের বিভিন্নমুখী উদ্যোগ ও প্রচেষ্টা লক্ষণীয়ও। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ কর্তৃক ১৯৮১ সালে ঘোষিত সিডও (CEDAW– Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) সনদের কয়েকটি অনুচ্ছেদে তা লক্ষ করা যায়। সে অনুচ্ছেদগুলো নিয়ে সংক্ষেপে আলোকপাত করা হলো:

পুরুষের পাশাপাশি নারীর জন্যেও শিক্ষার সম-অধিকার নিশ্চিত করার বিষয়ে বলা হয়েছে অনুচ্ছেদ-১০- এ। শহর বা গ্রামাঞ্চলে শিক্ষার সর্বস্তরে নারীর জন্য সমান সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা এবং তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। শিক্ষা ব্যতীত নারী অথবা পুরুষ কারো মুক্তি সম্ভব হবে না।

অনুচ্ছেদ-১১- তে বলা হয়েছে নারীর কর্মসংস্থান প্রসঙ্গে। শিক্ষা গ্রহণের পাশাপাশি সেটির প্রায়োগিক দিক স্পষ্ট হয়ে ওঠে কর্মক্ষেত্রে। কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ দূর করে পুরুষের পাশাপাশি নারীর অধিকার সুনিশ্চিত করা। নারীর চাকরি ও পেশা বেছে নেওয়ার অধিকার, চাকরিতে নারী ও পুরুষের একই বাছাই মান প্রয়োগ, বেতন, ভাতা, পদোন্নতি, চাকরির নিরাপত্তা, চাকরির সুবিধা-সুযোগ পুরুষের পাশাপাশি নারীর জন্য সমভাবে নিশ্চিত করা।

নারীর প্রতি অবহেলা সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় স্তরেই শুধু নয় বরং পারিবারিক পরিমণ্ডলে পরিলক্ষিত হয়। নারীর স্বাস্থ্য এবং পুষ্টির বিষয়টি এই অবহেলা-উপেক্ষার প্রেক্ষিতে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। নারীর সুস্থতা এবং স্বাস্থ্য সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে অনুচ্ছেদ-১২- তে এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুযোগ-সুবিধা, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের অধিকার সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে অনুচ্ছেদ-১৩- তে।

গ্রামীণ নারীর উন্নয়ন ও সুযোগ-সুবিধা, আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ও কারিগরি প্রশিক্ষণ সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে অনুচ্ছেদ-১৪- তে। তাছাড়া গ্রামে নারীর কর্মসংস্থান, কৃষি ঋণ, গৃহায়নের সুবিধা নিয়ে বলা হয়েছে এই ধারায়। এছাড়া চুক্তি সম্পাদন ও সম্পত্তি দেখাশোনার ক্ষেত্রে পুরুষের পাশাপাশি নারীর বৈধ ক্ষমতা প্রদান সম্পর্কে বলা হয়েছে অনুচ্ছেদ-১৫- তে। (দ্রষ্টব্য: পরিশিষ্ট)

বিভিন্ন সময়ে জাতি সংঘের বিভিন্ন সম্মেলনে নারীর অধিকারের বিষয়টি নিয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আয়েশা খানম মন্তব্য করেছেন, 'জাতিসংঘের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত সম্মেলনসমূহে- ১৯৭৫ মেক্সিকো সম্মেলনে, ১৯৮০ কোপেনহেগেনে, ১৯৮৫ নাইরোবি নারী উন্নয়নের অগ্রমুখী কর্মকৌশল কর্মসূচিতে, ১৯৯০ ব্রাজিলে রিও ধরিত্রী সম্মেলনে, ১৯৯২ কোপেনহেগেন সোশাল সামিটে, ১৯৯৩ ভিয়েনা মানবাধিকার সম্মেলনে, ১৯৯৪ কায়রো নারী, জনসংখ্যা ও উন্নয়ন সম্মেলনে, ১৯৯৫ ৪র্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনে ১২টি কর্মসূচির অন্যতম একটি নারী ও অর্থনীতি তথা নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন বিষয়ে। সম্পদ ও সম্পত্তিতে সমঅধিকার বিংশ শতাব্দীর নারী অধিকার প্রতিষ্ঠা আন্দোলনের কেন্দ্রিক ইস্যু। নারী-পুরুষের মাঝে সমঅধিকার বাস্তবে প্রতিষ্ঠা করতে হলে নারী-পুরুষের মাঝে সম্পদ সম্পত্তি সমবণ্টন, রাষ্ট্র প্রদত্ত সকল প্রকার অর্থনৈতিক অধিকার ও সুযোগ সুবিধা নারী-পুরুষ উভয়কেই সমানভাবে পেতে হবে এবং সকল শ্রেণির, গোত্রের, ধর্মের, বর্ণের নারীর সকলের জন্যই তা হতে হবে।[১১] (খানম, ২০১০, এপ্রিল-জুন, পৃষ্ঠা- ১২,১৩)

বিশ্বজুড়ে এখনও চলছে সমসুযোগের আন্দোলন ও লড়াই। আন্তর্জাতিক নারী দিবসের শতবর্ষ পেরিয়ে গেলেও অর্জিত হয়নি নারীর সমসুযোগের ক্ষেত্র ও নারী অধিকারের বাস্তবতা। নারীর নিরাপদ জীবনের ক্ষেত্রে বহু বৈষম্য বিদ্যমান। তারপরেও আশানুরূপ না হলেও নারীর জীবনে পরিবর্তন এসেছে এবং আসছে। বাংলাদেশের নারী শিক্ষার অগ্রগতি সম্পর্কে প্রশংসা করেছেন নোবেল বিজয়ী ড. অমর্ত্য সেন। বাংলাদেশের কর্মক্ষেত্রের বিভিন্ন পর্যায়ে নারী কর্মী রয়েছে কিন্তু নারীর ও পুরুষের ভারসাম্যপূর্ণ অংশগ্রহণ এখনও নিশ্চিত হয়নি।

বিশ্বায়নের যুগের নারীর জীবন ও উনিশ শতকের শুরুর দিকের বাংলার নারীর জীবনে এসেছে নানা পরিবর্তন। আর এই পরিবর্তনের পেছনে রয়েছে কয়েক প্রজন্মের মানুষের ত্যাগ, তিতিক্ষা ও সংগ্রাম। এই পরিবর্তনের পিছনে যাঁদের অবদান রয়েছে তাঁদের কয়েকজনের দৃষ্টিভঙ্গি, কর্ম ও উদ্যোগ নিয়ে আলোকপাত করা হয়েছে এই গবেষণা কর্মে, যাতে করে নারী সমাজের শিক্ষা ও ক্ষমতায়নে তাঁদের চিন্তা ও কর্মের দিকনির্দেশনাকে অনুসরণ করে নারী সমাজের জন্য আরও ইতিবাচক পরিবর্তন আনার চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া যায়।

৩.২ লীলা নাগ, শামসুন নাহার ও সুফিয়া কামাল: মানসপটে নারীর শিক্ষা ও ক্ষমতায়ন

৩.২.১ লীলা নাগ

লীলা নাগ নারীর শিক্ষা ও ক্ষমতায়ন সম্পর্কে জীবনের শুরু থেকেই ধারণা লাভ করেছিলেন। বাল্য কাল থেকেই তিনি ব্রাহ্ম সমাজের নীতি নৈতিকতার সাথে পরিচিত ছিলেন। সেখানে জেনেছিলেন, শুধু নারী নয়- প্রতিটি জীবনে শিক্ষা কিভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং সমাজে অবস্থান তৈরি করার ক্ষেত্রে সহায়তা করে থাকে। সে কারণেই তাঁর জীবনের সর্বত্র দেখা যায় যে, তিনি নারীর জন্য শিক্ষাকে রেখেছিলেন সর্বাগ্রে। নারী বহু যুগ ধরে পুরুষের পশ্চাতে পড়ে আছে জীবনের সব দিকেই। মানব সমাজের এই বৈষম্য দূর করা সম্ভব শিক্ষার মাধ্যমে। লীলা নাগ নিজেও উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে বাধার সম্মুখীন হয়েছেন। বাধার সাথে লড়াই করে ভর্তি হয়েছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। সেখানে ছাত্রী অবস্থায় তিনি অবরুদ্ধ নারীদের নিজেদের অবস্থার পরিবর্তনের জন্য সংগঠিত করতে চেয়েছিলেন। তিনি এবং আরও কয়েকজন বিদুষী নারী ব্যক্তিত্ব মিলে শুরু করেছিলেন 'দীপালি সংঘ'।

নারীর শিক্ষা ও ক্ষমতায়ন নিয়ে তিনি শুরু থেকেই চেয়েছেন নারীদের নিজেদের প্রতি সচেতন করতে। শিক্ষার মাধ্যমে নারীরা সচেতন হবে; নিজেদের প্রতি, সমাজের প্রতি, দেশের ও দশের প্রতি। সমাজ চাইলেই নারীদের উপরে অসঙ্গতিপূর্ণ কোন সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিতে পারবে না। নারীদের উপর সমাজের বদ্ধমূল দৃষ্টিভঙ্গি যখন তাদের কোণঠাসা করতে চাইবে তখন তারা যেন যথাযথ যুক্তির মাধ্যমে তা কাটিয়ে উঠতে পারে। লীলা নাগ বিশ্বাস করতেন, শরীরের জোরের চেয়ে বুদ্ধির জোর অনেক গুণ বেশি। সেই চিন্তা থেকেই তিনি নারীদের জন্য চেয়েছেন শিক্ষার ব্যবস্থা করতে। শিক্ষার সাথে শিক্ষার বাস্তবায়নের বিষয়টি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। নারী সমাজ শিক্ষা গ্রহণ করে তা জীবনে কাজে না লাগালে শিক্ষা বৃথা যাবে। সেটি সমাজের জন্য সুফল বয়ে আনবে না। তাই তিনি বরাবরই চেয়েছেন নারীরা শিক্ষা অর্জন করবে এবং তা তাদের জীবনে বাস্তবায়ন করবে।

সমাজে নারীর অবস্থান

লীলা নাগের নারী ভাবনায় নারীবাদীদের রুষ্ট ধ্বংসাত্মক মতবাদ সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। বিনাশধর্মী, নেতিবাচক নারীবাদকে পরিহার করে তিনি ইতিবাচক, সৃজনশীল নারীচিন্তার প্রবর্তন করেছিলেন। নারীদের সুশিক্ষিত ও স্বনির্ভর করে সংযতভাবে গড়ে তোলা ছিল তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য। নারীদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অর্থোপার্জনের পথ উন্মুক্ত করে সমাজ ও দেশসেবায় নিয়োগ করতে চেয়েছিলেন। তাঁর প্রধান লক্ষ্য ছিল নারীর অবস্থানের সকল প্রতিবন্ধকতা অপসারণে উন্নত জীবনের উজ্জ্বল প্রতিশ্রুতি। লীলা নাগের কাছে স্ত্রীপুরুষের কর্তব্য ও কার্যক্রমের কোন বিভেদ ছিল না। নারীদের জন্য গৃহকর্ম ও পুরুষদের জন্য রাষ্ট্র পরিচালনা, সমাজ গঠন আর্থিক সঙ্গতির বৈধতায় তাঁর বিশেষ আপত্তি ছিল। অন্তঃপুর ও বহির্মহলে কৃত্রিম বিভাজন অগ্রাহ্য করে স্ত্রীপুরুষ সমপর্যায়ে সামাজিক ও রাজনৈতিক দায়িত্ব গ্রহণ করলে দেশের মঙ্গল।[১২] (শত বর্ষের শ্রদ্ধাঞ্জলি(সম্পা), ২০০৩, পৃষ্ঠা-১৫০)

সমাজে নারীর অংশগ্রহণ

লীলা নাগ জয়শ্রী-তে 'মেয়েদের উপযুক্ত কর্মক্ষেত্র কি?' নামক প্রবন্ধে গান্ধীজির দেওয়া নরনারীর দ্বৈধতার তত্ত্ব খণ্ডন করেছেন। বাস্তবের সঙ্গে সম্পর্কহীন অন্দর মহলে কূপমণ্ডুকের জীবনযাপন নারীশক্তির অপচয়। শিক্ষার দ্বারা সচেতন নারীদের বৃহত্তর পটভূমিকায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়ার কথা বলেছেন। তিনি স্ত্রী পুরুষের দৈহিক, মানসিক, মস্তিষ্কগত পার্থক্যের অসারতা প্রমাণ করেছেন। প্রকৃতির নিয়মে নারীদের সন্তান ধারণ ও পালন অবশ্য করণীয়; কিন্তু তার জন্য গৃহান্তরীণ সাময়িক প্রয়োজন, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নয়। বহির্জগতে বিবিধ কার্যক্রম মেয়েদের মানসিক ক্ষতি বা সন্তানের স্বাস্থ্যহানি করে না। অনুভূতির স্বাতন্ত্র্যে কর্মবিভাজনের বিশ্লেষণ ভ্রান্ত।

> বাইরের উত্থানপতনশীল, গতিমুখর বিপুল জগৎ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করে বাস্তব জগতের সংস্পর্শশূন্য কৃত্রিম স্বস্তি ও শান্তির মধ্যে বাস করে ব্যক্তিত্বের দিকদিয়ে, জাতির দিক দিয়ে নারী যা হারাবে তার জন্য কেবল নারী নয়, সমস্ত সমাজ ও জাতিই ক্ষতিগ্রস্ত হবে, সেই পঙ্গুত্ব থেকে নারীর নিজেকে ও জাতিকে বাঁচাইতে হবে। (লীলাবতী রায় 'মেয়েদের উপযুক্ত কর্মক্ষেত্র কি?' জয়শ্রী, বৈশাখ ১৩৪৭)[১৩] (মোহান্ত, ১৯৯৯, পৃষ্ঠা- ১০৪)

এছাড়া 'সমাজ গঠনে নারীর বিশেষ ভূমিকা' প্রবন্ধে তিনি বলেছেন, 'পুরুষ ও নারীর পৃথক দায়িত্ব ও ভিন্ন কর্মক্ষেত্রে আমি বিশ্বাসী নই। গৃহ, সমাজ ও জাতিগঠনে দুয়েরই দায়িত্ব সমান। বর্তমান যুগে নারী ও পুরুষ উভয়কেই দ্রুত পরিবর্তনশীল পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গি ও জীবনকে গড়তে হবে। এই পারিপার্শ্বিকের ভেতরে অন্তঃপুর ও বহিরঙ্গন বলে কোনো বিভাগ চলবে না। বিশ্বব্যাপী যুদ্ধের হলকা যখন লাগে তখন বহিরঙ্গন ছেড়ে মুহূর্তে সে অন্তঃপুরে প্রবেশ করে। মাতা-জায়া-দুহিতা-ভগ্নীরূপে নারীর জীবনে আসে প্রবল আলোড়ন।'[১৪] (মোহান্ত, ১৯৯৯, পৃষ্ঠা- ৯৯)

লীলা নাগ নারীর জন্য এমন শিক্ষা চেয়েছেন যা শুধু নারীকে অর্থনৈতিক ক্ষমতা নয় পাশাপাশি সামাজিক, রাজনৈতিক অবস্থানও প্রদান করবে। এতে করে নারীর সক্ষমতার গণ্ডি বৃদ্ধি পাবে। সামর্থ্য প্রদর্শনের সুযোগ না পেলে নারী নিজেকে সমাজে তুলে ধরতে পারবে না। গবেষণায় দেখা যাচ্ছে, ব্রিটিশ শাসনামল থেকে সাম্প্রদায়িক বিষয়গুলো নিয়ে সমাজে যে বিষবৃক্ষ রোপণ করা হয়েছে তার মূল উৎপাটন করার ক্ষেত্রেও লীলা নাগ নারীদের সংঘবদ্ধ ভূমিকার কথা বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন। তিনি পূর্ববঙ্গে হিন্দু-মুসলমান নারীদের নিয়ে কাজ করেছেন যে কারণে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন নারীরা সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সোচ্চার হলে সমাজের জন্য মঙ্গলকর হবে। সাম্প্রদায়িক বিরোধ নারীর উপর কতটা সহিংস হয়ে ওঠে সে প্রসঙ্গে তিনি দেশভাগের সময়ে পাঞ্জাবের কথা মনে করিয়েছেন। যুগে যুগে রাজ্য গড়েছে আবার লুপ্তও হয়েছে; ক্রান্তি লগ্নে নারীর উপর সহিংসতা ইতিহাসে সাক্ষী হয়ে আছে। দেশভাগের ক্রান্তিকালও সেই সাক্ষ্যই বহন করে চলেছে।

লীলা নাগ যে সময়ে জন্মেছিলেন পরাধীন ভারতবর্ষের করুণ অবস্থা তখন চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত। নারীর উপর আগ্রাসন বন্ধ করার জন্য নারীকে অবরোধ প্রথার নাগপাশ ছিন্ন করে বেরিয়ে আসতে হতো। কিন্তু বেরিয়ে আসার শক্তি শিক্ষার মধ্যে, সচেতনতার মধ্যে। যা থেকে নারী সমাজ ছিল পুরোপুরিভাবেই বঞ্চিত। নারীর উপর পুরুষের অত্যাচার, নিগ্রহ ও আগ্রাসন রোধ করতে হলে নারীকে আপন শক্তিতে বলীয়ান হতে হবে, নিজের প্রতি অন্যায়ের প্রতিবাদের জন্য নিজেকেই দাঁড়াতে হবে। একজনের লড়াই অন্য আরেকজন লড়ে দিতে পারে না। এককভাবে সচেতনতা আসতে শুরু করলেই ধীরে ধীরে সংখ্যা বেড়ে অগণিত হবে। কিন্তু সেজন্য চাই শিক্ষা। লীলা নাগ শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে রাষ্ট্রের প্রতি আহ্বান জানান। যথেষ্ট পরিমাণ নারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে, নারীকে যোগ্য করে নারীদের হাতে প্রাথমিক শিক্ষার ভার দিতে, প্রতি গ্রামে নারী ও শিশু শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা রাখার কথা উল্লেখ করেছেন।

রাজনৈতিক সচেতনতা

শিক্ষার ক্ষেত্রে নারীর অগ্রযাত্রায় আরও এক বিশেষ মাত্রা যোগ করে তাঁর বাক-স্বাধীনতা ও সিদ্ধান্তদানের ক্ষমতা। পরিবার থেকে শুরু করে রাষ্ট্র পরিচালনায়ও নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার বিষয়ে তিনি সোচ্চার হয়েছিলেন। কারণ, নারীর ভোটাধিকার নারীকে রাষ্ট্রের পরিকল্পনা ও চিন্তায় অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেয়। লীলা নাগ নারী সমাজকে দেশ ও দশের সম্পর্কে সচেতন করতে চেয়েছিলেন। নারীরা সমাজ ও দেশের কথা না ভাবলে, সমাজ ও দেশের কাজে এগিয়ে না আসলে শিক্ষা লাভের নিহিত অর্থ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়ে যাবে। তাই তিনি চেয়েছিলেন নারী সমাজকে নিজেদের শক্তিতে এগিয়ে যেতে। কিন্তু তিনি কখনো চাননি নারী-পুরুষের ভিন্ন পথ চলা, ভিন্ন গন্তব্য। তাঁর লেখায় তিনি বলেছিলেন, "মোট কথা, নারীপুরুষের জীবন ভিন্ন নয়; কাজেই সেই জীবনের পটভূমিকাকে সৃষ্টি করবার বা বদলাবার, ভাঙবার ও গড়বার সর্বাঙ্গীণ দায়িত্ব উভয়েরi"[১৫] (মোহান্ত, ১৯৯৯, পৃষ্ঠা- ৯)

৩.২.২ শামসুন নাহার মাহমুদ

অকুতোভয় যাত্রী

শামসুন নাহার মাহমুদ বাঙালি নারী আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ। তিনি জীবনের শুরু থেকেই অনেক বন্ধুর পথ অতিক্রম করে গন্তব্যের দিকে ধাবিত হন। জীবনের এই পথ চলায় কখনো কখনো তিনি বিফল হয়েছেন, কিন্তু ভেঙ্গে পড়েননি বা থামিয়ে দেননি পথ চলা। সমাজের অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে। সমাজের বাধার কাছে মাথা নত করেননি, হার স্বীকার করেননি। ছোটবেলা থেকে পিতৃহীন শামসুন নাহার পর মুখাপেক্ষী, অবরুদ্ধ জীবনের সাথে পরিচিত। সেই অন্ধকার পর্দা সরিয়ে তাঁর জীবনের নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করেছিল শিক্ষা। শিক্ষানুরাগী মাতামহ তাঁর জীবনে ছায়া হয়েছিলেন আজীবন, বড় ভাই হবীবুল্লাহ বাহার সর্বদা বোনকে সহযোগিতা করেছেন শিক্ষা অর্জনের পথে। তাঁদের সহযোগিতার সাথে শিক্ষার প্রতি নিজের অদম্য স্পৃহা শামসুন নাহারকে সমাজে ও দেশে নিজের অবস্থান নিজে নির্ধারণ করার সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছিলো। বাংলার পশ্চাদপদ নারীসমাজে কখনো সমাজকর্মী, কখনো লেখিকা, কখনো শিক্ষক, কখনো বা জনপ্রতিনিধি হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সবসময়ই তিনি তাদের পাশে থাকার চেষ্টা করেছেন।

পরাধীন ভারতবর্ষে জন্মে তিনি দেখেছেন সমাজ নারীদের প্রতি কেমন দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে। অন্দর মহলে যেটুকু শিক্ষার ছোঁয়া পেয়েছিলেন, তা থেকেই তিনি মনের ভাব কবিতা আকারে লেখা শুরু করেছিলেন। পত্রিকায় তাঁর কবিতা ছাপার পর আত্মীয় ও সমাজের গোঁড়া চিন্তা তাঁর এই লেখা প্রকাশের বিরুদ্ধাচরণ করেছিল। এই রক্ষণশীল সমালোচনাকে ভয় না পেয়ে তিনি তাঁর লেখনীকে সচল রেখেছিলেন। শুধু কবিতা রচনাতেই গণ্ডিবদ্ধ ছিলেন না তিনি, সমাজে বাধা সত্ত্বেও তিনি গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। তিনি তাঁর গ্রন্থ রচনা করেন মহীয়সী নারীদের জীবন নিয়ে। লেখনীর মাধ্যমে তিনি নারী সমাজের কাছে পৌঁছে দিতে চেয়েছেন— নারীদেরও বলার মতো অধিকার আছে, অধিকার আছে স্বপ্ন দেখার। তিনি ভেবেছিলেন

ইতিহাসের মহীয়সী নারীদের জীবনী নারী সমাজের কাছে তুলে ধরলে তাঁদের মানসিকতায় কিছুটা হলেও শক্তি সঞ্চার করবে। শামসুন নাহারের প্রথম গ্রন্থ পড়ে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ প্রশংসা করেছিলেন। বলেছিলেন,

> নারীর মহিমা, নারীর হৃদয়ের কথা, নারীর অধিকার, নারীর লক্ষ্য নারী যেমন বোঝে আমরা তেমনটি বুঝতে পারি না। যেটি আমাদের কল্পনা, সেটি তাঁহাদের বাস্তব। লেখিকার হাতে নারী চরিত্র ফুটিয়াছে ভালো। লেখিকা বয়সে নবীনা, কাজেই আবেগময়ী, তাঁহার ভাষা তাঁহার হৃদয়ের আবেগ বহন করিয়া গুরুগম্ভীর রবে চলিয়াছে, এই নাটক-নভেলের যুগে গ্রন্থকর্ত্রী যে প্রচলিত পন্থা ত্যাগ করিয়া পুণ্য গৌরবময় নারী জীবন চয়ন করিয়াছেন, ইহাতে তাঁহার ভবিষ্যতের জন্য মনে অনেক আশার সঞ্চার হয়।[১৬] (পারভিন, ২০১২, পৃষ্ঠা- ৩৯)

যেহেতু শামসুন নাহারের জীবনে বেগম রোকেয়ার প্রবল প্রভাব ছিল সেহেতু তিনি দেখেছিলেন বেগম রোকেয়াও তাঁর লেখনীর মাধ্যমে শুধু নারী সমাজ নয়- পুরুষ সমাজেও বদ্ধমূল চিন্তার আবরণে চির ধরিয়েছিলেন। তাই শামসুন নাহারও তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করেছিলেন। তিনিও কলমের শক্তিকে বেছে নিয়েছিলেন হাতিয়ার হিসেবে। নিজের ইচ্ছা, দৃষ্টিভঙ্গি, দর্শন সব তিনি নিজের লেখার মাধ্যমে নারীদের মাঝে ছড়িয়ে তাদের সুপ্ত শক্তিকে জাগিয়ে তুলতে চেয়েছেন।

শিক্ষা ও সমাজ একই সূত্রে গাঁথা

শামসুন নাহার মাহমুদ নিজ জীবনে প্রতিকূল অবস্থায় শিক্ষা অর্জন করে শিক্ষকতায় যোগদান করেন। শিক্ষকতার সুবাদে নারী সমাজের সাথে তাঁর যোগাযোগ কিছুটা সহজতর হয়েছে। তিনি জীবনের লড়াই সম্পর্কে তাঁর ছাত্রীদের অবগত করতেন যেন কোন ৰাধার সামনেই তারা মাথা নত না করে।

শিক্ষার প্রকৃত কাজ জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন নিয়ে আসা। কাজের মধ্য দিয়ে শিক্ষার প্রতিফলন ঘটে। জীবনের সব ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা প্রদান করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। অনানুষ্ঠানিকভাবে হলেও শিক্ষার প্রকৃত অর্থের কোন পরিবর্তন হয় ৰা। শামসুন নাহার মাহমুদ সেজন্য নারীদের শিক্ষাকে শুধু তাঁর কলেজ বা শ্রেণিকক্ষেই সীমাবদ্ধ রাখেননি। তিনি বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের প্রতিষ্ঠিত আঞ্জুমনে খাওয়াতীনের মাধ্যমে বস্তির পিছিয়ে পড়া অবহেলিত নারীদের কাছে যেয়ে তাদের লেখাপড়া শেখানো, হাতের কাজ শেখানোর উদ্যোগ নিয়েছিলেন। নারীরা যাতে নিজেরা কিছু হলেও অর্থ উপার্জন করতে সক্ষম হয়, এতে তাদের সংসারে অভাব কিছুটা হলেও মিটবে। স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতা নিয়েও তাদের সচেতন করা হয়। বস্তির অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে যতটা সম্ভব পরিচ্ছন্নতার সাথে জীবন যাপনের সচেতনতা তাদের মধ্যে সঞ্চার করার চেষ্টা করেছেন শামসুন নাহার মাহমুদ।

শামসুন নাহার মাহমুদ সমাজে মুসলমান নারীদের অবস্থান সম্পর্কে তাঁর লেখনীর মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। তৎকালীন বাংলার মুসলমান নারী সমাজ অবরোধ প্রথা ও অশিক্ষার অন্ধকারে অবরুদ্ধ ছিল। ধর্মের দোহাই দিয়ে তাদের শিক্ষার পথ রুদ্ধ করে রাখা হয়েছিল। ধর্মশীলা নারীকে ধর্মের নামে অবরোধ প্রথার বিধান দিয়ে অন্ধকারে রাখা হয়েছে। শামসুন নাহার চেয়েছিলেন ধর্ম সম্পর্কে জেনে নারীরা ধর্মীয় বিধান পালন করুক। না জেনে পুরুষের নির্ধারিত বিধানকে ধর্মীয় বিধান বলে মেনে না নিক। তাঁর নারী জাগরণীমূলক প্রবন্ধে বলেছেন তিনি,

> অবরোধ প্রথা আমাদের কীরূপ সর্বনাশ করিতেছে, তাহা আমরা বেশ উপলব্ধি করিতে পারি। তথাপি এই সর্বনাশের কঠোর প্রথা আমরা অবনত মস্তকে পালন করিতেছি। কেন করিতেছি? কারণ আমরা মনে করি ইহা ধর্মের বিধান।

> নারী স্বভাবতই ধর্মশীলা। ধর্মের আদেশ যতই ক্লেশদায়ক হোক না কেন, নারী তাহা অকুণ্ঠ চিত্তে পালন করিয়া থাকে। তাই অবরোধ প্রথাকেও তাহারা কোরান হাদিসের আদেশ জ্ঞানে নীরবে মাথা পাতিয়া বহন করিয়া আসিতেছে; কিন্তু এই কঠোর প্রথা পালন কি সত্যিই ইসলামের নির্দেশ? না, কখনোই নহে। অহেতুক ও অন্যায় অবরোধ ইসলাম কখনো অনুমোদন করে না।[১৭] (পারভিন, ২০১২, পৃষ্ঠা- ৫৬)

সমাজ ও সাহিত্য

সাহিত্য চর্চা ও শিক্ষকতা ছাড়াও তিনি পত্রিকা সম্পাদনা করতেন। যাতে সমাজে মানুষের বলতে না পারা কথাগুলো সবার সামনে তুলে ধরতে পারেন। নারী-পুরুষ উভয়ের চিন্তাকে পত্রিকায় তুলে ধরার চেষ্টা করেন, যাতে সমাজে নারীর চলার পথে নারী-পুরুষ উভয়ের অবদান থাকে। সমাজে নারীর শিক্ষার পথে এককভাবে শুধু নারী পরিবর্তন আনতে পারে না, সমাজের পরিবর্তনে নারী-পুরুষ উভয়ের সম্পৃক্ততা প্রয়োজন। পশ্চাদপদ নারী সমাজকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে আসতে নারী ও পুরুষ উভয়ের প্রচেষ্টা আবশ্যক।

নারীর শিক্ষার অর্থনৈতিক মূল্যায়ন

শামসুন নাহার মাহমুদ বুঝতে পেরেছিলেন, নারীদের শিক্ষাকে অর্থনৈতিকভাবে মূল্যায়ন না করলে সমাজে যথাযথ মর্যাদা পাবে না নারী। তিনি নিজে তাঁর অর্জিত শিক্ষাকে পেশার মাধ্যমে সমাজের কাজে লাগিয়েছিলেন। শিক্ষিকা হিসেবে লেডী ব্রেবোর্ন কলেজে তিনি শুধু নারীদের জাগরণের জন্য কাজ করেননি, পাশাপাশি এই চাকরি তাঁর জীবনে আর্থিক স্বাধীনতা এনেছিলো। বিষয়টিও এখানে লক্ষণীয়। তিনি নারীদের শিক্ষা গ্রহণের পাশাপাশি সেই অর্জিত শিক্ষাকে কাজে লাগানোর বিষয়ে কাজ করেছিলেন। তিনি যখন তুরস্ক ভ্রমণে গিয়েছিলেন সেখানে তিনি দেখেছেন নারীদের শিক্ষা ও উপার্জনের বিস্তৃত ক্ষেত্র। তাদের নারী সমাজের প্রগতিশীল চিন্তার প্রকৃত নিদর্শন। সেখানে শিক্ষার প্রাথমিক স্তর ও উচ্চ স্তরে নারীদের শিক্ষার অর্গলমুক্ত পথ। তুরস্কের শিক্ষা ব্যবস্থার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য সহশিক্ষা। তারা যেমন মূলধারায় শিক্ষা নিচ্ছেন তেমনি হাতের কাজে বৃত্তিমূলক শিক্ষাও গ্রহণ করছেন। নারীরা তাদের বৃত্তিমূলক কাজের ট্রেনিং শেষ করে নিজেরা কারিগরি স্কুলে শিক্ষকতা করছে বা দোকান খুলে নিজেরা কারিগরি শিক্ষাকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করছে। শামসুন নাহার মাহমুদ চেয়েছিলেন এদেশের নারীরাও অন্যান্য প্রগতিশীল দেশ ও সমাজের মতো প্রকৃত অর্থে সমাজের সক্রিয় অংশ হয়ে উঠুক। এ দেশেও নারীরা অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হয়ে উঠুক এটাই চেয়েছিলেন তিনি। যদিও এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় সহশিক্ষার বিষয়ে তিনি সম্মতি জ্ঞাপন করেননি। সর্বোপরি তিনি নারী শিক্ষার বিষয়ে কাজকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

এছাড়া তিনি আমেরিকা সফরে যান, সেখানে তিনি দেখেছেন সেখানকার শিক্ষা ব্যবস্থা এবং সমাজে নারীর অবস্থান। নারী সমাজে ও কর্মস্থানে কোন অংশে পিছিয়ে নেই সেখানে। আমেরিকার নারী সমাজে কর্ম তৎপরতার কোন কমতি নেই। যা আমাদের নারী সমাজে আশানুরূপ পরিমাণে নেই। আর সেখানে আরও একটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ; সেটি হচ্ছে শ্রমের মর্যাদা। কোন কাজকে তারা ছোট করে দেখে না। শ্রম মানেই সম্মানের। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, ব্যাংক, কলকারখানা, সাংবাদিকতা ইত্যাদি সব ধরনের পেশায় নারীরা পুরুষের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। আমেরিকার সমাজে

নারীদের এই অবস্থা একদিনে আসেনি। তার জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছে পরিবর্তনের। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আমেরিকার নারী সমাজে বিস্তর পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ পরিবর্তনের সেই জোয়ারকে রুখতে পারেনি। ঘরে বাইরে নারী পুরুষ সমান দায়িত্বে কাজ করছে। সন্তান পালন, রান্নাবান্না, ঘরকন্যা শুধু নারীর দায়িত্ব না। পুরুষও সব কাজ সমানভাবে ভাগে করে যাচ্ছে ঘরে-বাইরে। কিন্তু শামসুন নাহার মাহমুদ আমাদের দেশের নারীদের সন্তান পালনে মায়েদের ভূমিকাকে মুখ্য করে দেখেছেন। সন্তান পালনের কাজ আমেরিকায় পিতা-মাতা দুজনেই করে থাকে। নারীরা বাইরে কাজ করে বলে সন্তানেরা মায়ের মনোযোগ কম পায়। এই বিষয়টি শামসুন নাহার মাহমুদ আমাদের নারী সমাজের জন্য প্রযোজ্য মনে করেননি। তিনি চেয়েছেন নারীরা পুরুষের পাশাপাশি কাজ করবে কিন্তু সন্তানের জীবন গঠনে, চরিত্র গঠনে মায়ের ভূমিকা অপরিসীম। আমরা তাঁর জীবনে মায়ের ভূমিকা দেখে তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গিকে উপলব্ধি করতে পারি।

শিশু শিক্ষা

নারীর শিক্ষা নিয়েই তাঁর চিন্তা সীমাবদ্ধ ছিল না। তিনি শিশু শিক্ষা নিয়ে ভেবেছেন যেখানে সমাজে নারী পুরুষের এই বিভেদপূর্ণ পরিচয় মুছে অঙ্কুর থেকে মানব সন্তান পরিচয়ে বেড়ে উঠতে পারে। আজকের শিশুরা জাতির কর্ণধার। তাদের বেড়ে ওঠায় সঠিক মনস্তত্ব সঠিক দিকনির্দেশনা না থাকলে তারা আশানুরূপ পথে চলতে পারবে না। শিশুদের মধ্যে নৈতিকবোধ, মূল্যবোধ, শৃঙ্খলা, স্নেহ-মমতা, সত্যপরায়ণতা, খেলাধুলা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে তিনি মতামত ব্যক্ত করেছেন। শিশুর সৃজনশীল মেধা ও জীবনের বিকাশে এসকল বিষয় নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। আর শিশু শিক্ষার ক্ষেত্রে তিনি নারীদের মুখ্য ভূমিকায় রেখেছেন। কারণ একটি শিশু তার মায়ের সাহচর্যে থাকে বেশি সময়। মায়ের প্রতিপালন ও পরিচর্যায় বেড়ে ওঠে শিশু। তাই নারীর শিক্ষার অঙ্গন উন্মুক্ত না হলে পরবর্তী প্রজন্ম বাধাগ্রস্ত হবে। মায়ের মধ্যে সচেতনতা না থাকলে শিশুর পরিচর্যায় ফাঁক থেকে যাবে।

তিনি বলেছেন শিশুদের মনুষ্যত্বের বিকাশ হবে আনন্দের মধ্য দিয়ে, মুক্ত পরিবেশে। শিশুরা প্রকৃতি থেকে গ্রহণ করবে জীবনের রূপ, রস, গন্ধ। নতুন নতুন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে তারা জীবনকে তথা চারপাশের পরিবেশকে জানতে ও বুঝতে শিখবে। শিশুর শৈশবের কৌতূহলী মানস কোনভাবেই যেন বাধাপ্রাপ্ত না হয় সে বিষয়ে তিনি গুরুত্বারোপ করেছেন। শিশুর বেড়ে ওঠায় আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক মনস্তত্ব প্রয়োগের প্রতিও তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন। সেক্ষেত্রে নারীদের যুগোপযোগী শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার বিষয়টি চলে আসে। তারা যদি শিক্ষিত না হয় তবে আধুনিক সময়ের মনস্তত্ব বা শিক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কে অবগত হবে না। শিশু মনস্তত্ব বা শিশুর বেড়ে ওঠাই শুধু নয়, শিশুদের জন্য সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রেও নারী সমাজের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। নারীরা শিশুদের বেশি বুঝতে পারেন তাই তারা ভালো বুঝবেন কোন বিষয়টি কিভাবে উপস্থাপন শিশুদের মনোগ্রাহী হবে।

৩.২.৩ সুফিয়া কামাল

সুফিয়া কামাল বাঙালি নারী জাগরণের অগ্রগণ্য পথিকৃৎ। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির থাবা থেকে শুরু করে পাকিস্তানী সামরিক জান্তা আইয়ুব, ইয়াহিয়া খানদের বর্বরতাও প্রত্যক্ষ করেছেন তিনি। একটি মানবিক সমাজ প্রতিষ্ঠার লড়াই করতে গিয়ে অনেক বন্ধুর পথ অতিক্রম করতে হয়েছে তাঁকে। জীবনের শুরু থেকেই প্রত্যক্ষ করেছেন নারী ও পুরুষের বৈষম্য; ঘরে-বাইরে, চলনে-বলনে, শিক্ষা-দীক্ষা সকল ক্ষেত্রেই। বিশ শতকের দ্বিতীয় বা তৃতীয় দশকে যেখানে ব্রাহ্ম বা হিন্দু পরিবারে নারীরা সাধারণ শিক্ষার সুযোগ পেত, সেখানে সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেও সুফিয়া কামাল শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিলেন। সুফিয়া কামালের শৈশবের শিক্ষাগ্রহণের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে মফিদুল হক বলেছেন, 'পরিবারের পুরুষেরা শিক্ষালাভের সবরকম সুযোগ-সুবিধা পেলেও নারীশিক্ষার অধিকারের কথা তাঁরা ভাবতেও পারতেন না।'[১৮] (হক, ২০১০ এপ্রিল-জুন, পৃষ্ঠা-৫) এ ক্ষেত্রে সহজেই অনুমেয়, একই পরিবারে সুফিয়া কামাল ও তাঁর সহোদর ভাই বেড়ে উঠেছেন, কিন্তু বেড়ে উঠেছেন সমাজের নারী ও পুরুষের বৈষম্য নিয়ে। সুফিয়া কামালের ভাই যখন বিদ্যালয়ে যাওয়ার সুযোগ পান বোন সুফিয়া কামালকে থাকতে হয় অবরোধবাসিনী হয়ে। এই অসম ব্যবস্থা সুফিয়া কামালের মনে দাগ কাটে। শুধু নারী বলে ঠেলে রাখা হচ্ছে অন্ধকারের দিকে? এই প্রশ্নের জবাব তখনকার শিক্ষিত পুরুষসমাজ দিতে অপারগ ছিল, বর্তমানেও যে সে অবস্থার খুব পরিবর্তন হয়েছে তা জোর গলায় বলা যায় না।

শৈশবেই উপলব্ধি করেন শিশু শিক্ষার গুরুত্ব

জীবনের শুরু থেকে নানা ঘাত প্রতিঘাত সহ্য করে বেড়ে উঠেছেন সুফিয়া কামাল। পিতার ছায়াহীন এক কন্যাশিশু সমাজে কীরূপ সমস্যার সম্মুখীন হয় তা তিনি প্রতি পদে পদে অনুধাবন করেতে পেরেছিলেন। নানার বাড়িতে বড় হন সুফিয়া কামাল। নানার বাড়িতে তিনি অবরোধ প্রথার মধ্যে বেড়ে ওঠেন। এই কঠোর শৃঙ্খলে বন্দী থাকা কালেই মানুষের দুঃখ-বেদনা সম্পর্কে তাঁর শিশুমনে গভীর রেখাপাত করে। তাঁর পিতা সংসারত্যাগী হওয়ার পর তাঁর মায়ের মনে যে চাপা দুঃখ ছিল তা তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। পিতার কথা জিজ্ঞাসা করার পর তাঁর মায়ের মনের চাপা কষ্টের স্মৃতি তিনি তাঁর 'একালে আমাদের কাল' গ্রন্থে লিখেছেন,

> আমার প্রশ্নে মায়ের সেই কাতরতার কথা আজও মনে রয়েছে। আমার শিশু মনে বেদনার দুঃখের সেই প্রথম বোধ, উপলব্ধি। সে-দিন থেকে আমার মনের বয়স যেন বেড়ে গিয়েছিল। দুনিয়া তখনও আমার অচেনা, কিন্তু বেদনার সাথে যেন সেই শৈশবেই, সেই দিন থেকেই নিবিড় পরিচয় হল আমার।.. অত ঐশ্বর্যের ক্রোড়েও যে মা কত রিক্ত- একথাটি গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলাম।'[১৯] (কামাল (সম্পা), ২০০২, পৃষ্ঠা ৫৬৩)

সুফিয়া কামাল যত জায়গায় গিয়েছেন, বক্তব্য রেখেছেন, সব কথার মূলে ছিল তাঁর নারী ও শিশুর জন্য শিক্ষার অবারিত দ্বার ও সুন্দর ভবিষ্যৎ। যেহেতু তিনি মনে প্রাণে বেগম রোকেয়ার আদর্শে অনুপ্রাণিত ছিলেন— তিনি চেয়েছেন নারীদের জন্য শিক্ষার দুয়ার উন্মুক্ত রাখতে। নেত্রকোণায় কচি-কাঁচা মেলার এক সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে তিনি বলছিলেন,

> আমি প্রাণ ভরে তোমাদের আশীর্বাদ করছি। তোমরা দুনিয়ার কাছে নিজেদের তুলে ধরতে শেখ। এই নেত্রকোনা বালিকা বিদ্যালয় তোমাদের শিক্ষা জীবনের ভিতকে মজবুত করে দিক।'[২০] (বেগম, ১৯৯৭, পৃষ্ঠা ৪৫)

সুফিয়া কামাল নারীসমাজের জন্য চেয়েছেন গুণগত শিক্ষার ব্যবস্থা করতে। শিক্ষাকে যেন তাদের জীবনে নারীসমাজ ঘরে-বাইরে ব্যবহার করতে পারে, শিক্ষা পেয়ে তারা যেন সচেতন হয় নিজেদের অধিকার সম্পর্কে-এই স্পৃহা, বাসনা থেকেই সুফিয়া কামালের নারীর শিক্ষা ভাবনাকে প্রত্যক্ষ করা যায়।

তাছাড়া সুফিয়া কামাল সোভিয়েত ভ্রমণে যেয়ে শিশু শিক্ষার বিষয়ে মানুষের মৌলিক চাহিদা আর শিক্ষার সমন্বয় কীভাবে করা হয় সেটা প্রত্যক্ষ করে এসেছিলেন। বাংলাদেশে অনেক শিশু রয়েছে যারা প্রাথমিক শিক্ষাচক্র সমাপ্ত করার পূর্বেই ঝরে যায়। তাদের পিতা-মাতা সন্তানের শিক্ষার পূর্বে তাদের দুবেলা খাদ্যের চিন্তা করে। শিক্ষার জন্য তাদের অর্থ নেই সচেতনতাও তেমন নেই। পিতা-মাতা মনে করেন শিক্ষার জন্য সময় নষ্ট না করে কাজ করলে পরিবারের আয় কিছুটা হলেও বৃদ্ধি পাবে। সে কারণে পিতা-মাতা সন্তানের শিক্ষার চেয়ে কাজের প্রতি বেশি আগ্রহী। যেখানে তাদের খাদ্য জোটে না সেখানে শিক্ষা হয়ে যায় তাদের কাছে বিলাসিতা। তাই সুফিয়া কামাল তাঁর এক নাগরিক সমাবেশে বলেন,

> সোভিয়েট ইউনিয়নে কোন মা-বাপের মলিন মুখ চোখে পড়ে না। সেখানে ছেলে-মেয়েদের ভরণ-পোষণ ও শিক্ষা-দীক্ষায় মানুষ গড়ে তোলার চিন্তায় পিতা-মাতাকে ব্যতিব্যস্ত হতে হয় না। সেখানে প্রতিটি মানুষের অধিকার ও মর্যাদাবোধ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।[২১] (বেগম (সম্পা), ১৯৯৭, পৃষ্ঠা ৬০)

সুফিয়া কামাল প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার কঠোর ছক বাধা শিক্ষার পক্ষে ছিলেন না। তিনি চেয়েছেন শিশুরা যেন প্রকৃতি থেকেও শিক্ষা নিতে পারে। ধরাবাঁধা শিক্ষার চাপে শিশু মনের সৌন্দর্য যেন নষ্ট না হয়, শিশুদের মাতাপিতার কাছে এর জন্য উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। বলেছেন,

> নিশ্চয়ই সব মায়েরা আপন সন্তানের স্বাস্থ্য, সুন্দর দেহ, শিল্প-সুন্দর মন ও শিক্ষা সুন্দর জীবন কামনা করেন। তাই শিশুকালেই যাতে সন্তান মুক্তবুদ্ধির সুন্দর মনের, সবল দেহের সৌন্দর্য লাভ করে তার জন্য তাদের মনমতো খেলাধুলা- আনন্দ ও শিক্ষার দিকে দৃষ্টি রাখবেন এ আমার অনুরোধ। শিশু মনকে বাধা নিষেধের জগদ্দল পাথরের চাপে নিষ্পেষিত না করে মুক্ত আলো বাতাসে বাড়তে দিন।[২২] (বেগম, ১৯৯৭, পৃষ্ঠা ৫৭, ৫৮)

শিশুর বিকাশে পুঁথিগত দিকটি ছাড়াও আরও শিল্প-সংস্কৃতি, খেলাধুলা ইত্যাদি বিষয়ে নজর দিতে বলা হয়েছে। সুকুমারবৃত্তির চর্চা শিশুর সুন্দর মানস গঠনে সহায়ক হবে। একসাথে সবাই মিলে খেলাধুলা, গান-নাচ, ছবি আঁকা, আবৃত্তি করার সময় মানুষের প্রতি তার দৃষ্টিভঙ্গির ইতিবাচক পরিবর্তন হবে, সাম্প্রদায়িক মনোভাব তৈরি হবে না। সব কিছু মাথায় রেখে সুফিয়া কামাল এই উদাত্ত আহ্বান জানান।

নারীকে শুধু পুঁথিগত শিক্ষায় শিক্ষিত হলে হবে না। শৈশব থেকে সংস্কৃতির সাথেও পরিচিত হতে হবে তাকে। সাহিত্য-সংস্কৃতির সাথে পরিচিত না হতে পারলে মনের বিকাশ সম্ভব নয়। নারীদের সমাজের সামনে শক্ত ভিত তৈরি করতে হলে মনের দাসত্ব ঘোচাতে হবে প্রথমে।

তৎকালীন নারীর জন্য অবরুদ্ধ পশ্চাৎপদ অবস্থায় দাঁড়িয়ে সুফিয়া কামালের মানস প্রভাবিত হয়েছিল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্য সৃষ্টির ছোঁয়ায়। উপলব্ধি করেছিলেন সাহিত্য ও সংস্কৃতির তাৎপর্য। সুফিয়া কামালের ব্যক্তিত্বের এই যে মননশীলতা এতো প্রতিকূলতার মধ্যেও প্রকাশিত হতে পেরেছে। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তার প্রভাবও রেখেছে। শিশুকে প্রকৃতির মধ্যে রেখে শিক্ষা দিতে হবে, তাকে তার নিজের মতো করে বেড়ে উঠতে দিতে হবে— এই দর্শনগুলো সুফিয়া কামাল লালন করেছেন আজীবন।

নারীর ক্ষমতায়ন সম্পর্কে উপলব্ধি

সুফিয়া কামালের পিতা নিরুদ্দেশ হওয়ার পর অসহায় মাকে দেখেছেন নিঃসহায় অবস্থায় সন্তানদের নিয়ে পিতার গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করতে। স্বামীর বাড়িতে থাকার পরও দৃঢ় আশ্রয়ের আশায় চলে এলেন বাবা আর ভাইদের আশ্রয়ে; কিন্তু সেখানেও তিনি স্বাধীনতা পাননি। পরিবার, সমাজ তাঁকে পদে পদে বেঁধেছে। সুফিয়া কামালের মা যদি শিক্ষিত হতেন, আর্থিক স্বাধীনতা থাকতো তাহলে তাঁর অন্যের মুখাপেক্ষী হয়ে জীবন কাটাতে হত না। স্বামী পাশে নেই বলে তাঁর নিজের যেমন কষ্ট, অন্যের উপর আশ্রিত হয়ে থাকার কষ্টটাও তেমনি ছিল। শিক্ষাই পারত এ অবস্থা থেকে সুফিয়া কামালের মা তথা বাংলার ঘরে ঘরে এমন অসহায় নারীদের মুক্তি দিতে। পরিবারের উৎপাদন ক্ষমতা যার বা আর্থিক চালিকাশক্তি যার হাতে থাকে তাঁর ভূমিকা পরিবারে মুখ্য হয়ে থাকে। নারী যদি আর্থিক দিকে পরিবারকে সাহায্য করতে পারে তবে পরিবারে তার স্থান ইতিবাচকভাবে পরিবর্তন হতে পারে। আর্থিক মুক্তির এই যে শক্তি এ সম্পর্কে নারীকে সচেতন করতে পারে শিক্ষা। সুফিয়া কামালেরও উপলব্ধি বোধ হয়— নারীর শিক্ষা- নারীকে আর্থিক স্বাধীনতা এনে দেয়। ক্ষমতায়নের মাধ্যমে নিজ জীবনে নিয়ন্ত্রণের দিশা খুঁজে নিতে সহায়তা করে।

সামাজিক কর্মকাণ্ডের সূচনা

বাঙালি মুসলিম সমাজে নারীজাগরণের পথিকৃৎ হিসেবে বেগম রোকেয়ার পর অন্যতম ব্যক্তিত্ব সুফিয়া কামাল। বেগম রোকেয়ার মত তিনিও স্বশিক্ষিত ছিলেন। কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যেয়ে শিক্ষা গ্রহণ করার সুযোগ তাঁর জীবনে ঘটেনি। কিন্তু পরবর্তী সময়ে দেখতে পাই, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত না হয়েও সুফিয়া কামালের চিন্তা-চেতনা, বিচার-বুদ্ধি কোন অংশে কম তো নয়-ই, সামাজিক ক্ষেত্রে, শিক্ষাক্ষেত্রে সচেতনতা বরং বেশি ছিল। তৎকালীন সময়ে ঔপনিবেশিক ধারার শিক্ষা চালু ছিল। ব্রিটিশরা শিক্ষার আলো নিয়ে এসেছিল এ ভূখণ্ডের মানুষদের অন্ধকার থেকে বের করে নিয়ে আসার জন্য। তাদের শিক্ষা শুধু পুরুষদের জন্য উন্মুক্ত রেখেছিল। এ ব্যবস্থাকে ঔপনিবেশিক শিক্ষা ধারার সীমাবদ্ধতা বলা যেতে পারে।[২৩] (হাসান, এপ্রিল-জুন- ২০১২, পৃষ্ঠা ৪) ঔপনিবেশিক শিক্ষার একপেশে দৃষ্টিভঙ্গিকে ভেদ করে সুফিয়া কামাল নিজস্ব চিন্তা-চেতনা নিয়ে বের হয়ে এসেছিলেন। যা তৎকালীন সময় মুসলিম নারী সমাজে অনেক দুরূহ একটি কাজ ছিল। শিক্ষার অদম্য ইচ্ছা থেকেই তিনি লেখার সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। মায়ের হাত ধরে লেখাপড়ার হাতেখড়ি। তিনি নারী বলে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার জন্য ঘরের বাইরে যেতে পারেননি ঠিকই কিন্তু পরবর্তী সময়ে মুসলিম নারী তথা সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের পুত্রবধূ হয়ে তাঁর সামাজিক কাজের সাথে যুক্ত হয়েছিলেন। এর সবটাই ছিল পুরুষতান্ত্রিক সমাজের সাথে শিক্ষার লড়াই ছিল। সুফিয়া কামাল তাঁর এক সাক্ষাৎকারে তাঁর সময়ে নারীর সামাজিক জীবন কেমন ছিল, এ প্রসঙ্গে বলেছেন

> তখনকার সময়ে মেয়েরা লেখাপড়া জানত না বলেই তাদের সামাজিক কোন মর্যাদা ছিল না। সমাজে কথা বলার মতো কোন অবস্থা তাদের ছিল না। তারা জানতোই না যে, আমাকে বলতে হবে, প্রতিবাদ করতে হবে।[২৪] (হক, ২০১৩,পৃষ্ঠা ১৫০)

সুফিয়া কামাল এখানে তাঁর সময়ের কথা বলেছেন, সে সময় নারীরা বুঝতই না তাদের বাক স্বাধীনতা আছে, তাদের কিছু বলার থাকতে পারে। সুফিয়া কামাল সেই অন্ধকার বলয় ভেদ করে সেই সময় এই বোধ ধারণ করতে পেরেছিলেন। শিক্ষার আলো দিয়ে মনের মধ্যে ভালো-মন্দের বোধকে জাগ্রত করতে না পারলে নারী জাতিকে জাগ্রত করা যাবে না। এ কথা শুধু

নারী জাতি নয় সমগ্র মানব জাতির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। সুফিয়া কামাল সে সময়ে বুঝতে পেরেছিলেন সমাজ এমনি এমনি নারীকে তাঁর অধিকার দিয়ে দিবে না। তাঁর জন্য নারীকে হতে হবে জগত সম্পর্কে সচেতন। সে সচেতনতাবোধ আসবে শিক্ষার মাধ্যমে। অবরোধ প্রথার শৃঙ্খল ভেঙ্গে মুক্ত আলো বাতাসে বেরিয়ে আসতে পারলে নারী জাতি তার সমাজে তার স্থান করে নিতে পারবে।

শিক্ষা ও ধর্ম

সে সময় নারীদের মুক্ত আলোতে বেরিয়ে আসার ক্ষেত্রে প্রধান প্রতিবাদ্ধকতাই ছিল শিক্ষা। মুসলিম নারীদের ক্ষেত্রে এটি আরও প্রকট ছিল। সমাজ মুসলিম নারীদের ধর্মের দোহাই দিয়ে অবরুদ্ধ করে রেখেছিল। মুসলিম নারীদের শুধু কোরআন শরিফ পড়ার অধিকার ছিল। তাও ঘরের মধ্যে থেকে বাইরে যেয়ে নয়। সুফিয়া কামাল নিজে বলছেন,

> মুসলমান মেয়েদের প্রথম বাধাইতো শিক্ষা। মেয়েরা লেখাপড়া শিখতে পারবে না। কুরআন শরিফ ছাড়া মেয়েরা আর কিছুই পড়তে পারবে না, ঘরের বাইরে যাওয়া চলবে না।[২৫] (হক, ২০১৩, পৃষ্ঠা- ১৫২)

মেয়েরা কুরআন শরিফ পড়ুক তাতে সমস্যা নেই। কিন্তু যা পড়ছে তা সম্পর্কে বোধ তো থাকতে হবে। আরবি ভাষায় নারী যা পড়বে তার অর্থ যদি অনুধাবন করতে না পারে তবে এ শিক্ষার কি মূল্য থাকে। শিক্ষা আমাদের সচেতন করে, শিক্ষার ব্যবহারে জীবন পরিশীলিত হয়ে ওঠে। তাই এই শিক্ষার অসারতা চিন্তা করে সুফিয়া কামাল বলেছিলেন, "শরীয়ত আমাদের অনেক কিছুই দিয়েছে, মোল্লাদের মুখের বচন শুনে নয়: মহিলাদের জানতে হবে শরীয়তে প্রদত্ত তাদের অধিকারের কথা।"[২৬] (জাহাঙ্গীর, ১৯৯৯, পৃষ্ঠা- ১৬১)

সুফিয়া কামাল দূরদৃষ্টি নিয়ে নারীদের শিক্ষা ও জাগরণের কথা চিন্তা করেছেন। যে শিক্ষা নারীকে সচেতন করবে না, তার মধ্যে বোধের সঞ্চার করবে না সে শিক্ষা দিয়ে যুগ যুগ ধরে পিছিয়ে থাকা নারী সমাজ এগিয়ে যেতে পারবে না বেশি দূর। নারীসমাজের জন্য প্রয়োজন এমন শিক্ষা যা তাকে তার ভেতর থেকে জাগিয়ে তুলবে, শিক্ষা সম্পর্কে নারী নিজে তাগিদ অনুভব করবে।

নারীর অর্থনৈতিক মুক্তি

ব্রিটিশ শাসন আমলে নারীরা যেভাবে ছিল ১৯৪৭ সালে তা থেকে দেশ বিভাগের সময় নারীদের অবস্থার পরিবর্তন ঘটল। দেশ বিভাগের সময় নারীদের উপর নেমে এল দুর্ভোগ। সুফিয়া কামাল তাঁর সাক্ষাৎকারে বলেছেন,

> দেশ বিভাগের সময় মেয়েদের অনেক লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়েছে। আগের দিনে রাজায় রাজায় যখন যুদ্ধ হতো, তখন খেয়াল রাখা হতো নারী আর শিশুর যেন কোন ক্ষতি না হয়। কিন্তু দেশ ভাগের সময় যেন মেয়েদের ওপরই অত্যাচার বেশি মাত্রায় বেড়ে গেল। ..... মুসলমান মেয়েরা বিশেষ করে দেশ বিভাগের পর জাগ্রত হতে শুরু করল। নিজেদের পায়ে নিজেরা দাঁড়াতে শিখল। ..... এই দেশ বিভাগের পর খাদ্যের অভাবে মেয়েরা অন্যের বাড়িতে গিয়ে কাজ করা শুরু করল। পেটের দায়ে মানুষের বাড়িতে কাজ শুরু করল।[২৭] (হক, ২০১৩, পৃষ্ঠা ১৫২)

এখানে দেখা যাচ্ছে, আর্থিক সংকটে পরে নারী তার আবদ্ধ জগত থেকে বেরিয়ে এসেছিল। নারীর শ্রম দেওয়ার সামর্থ্য আছে, যদি তার শিক্ষা থাকতো তবে মানুষের বাড়ি বাড়ি কাজ করতে হতো না। শিক্ষার ছোঁয়া পেলে নারীরা নিজের এবং সমাজের জন্য উন্নয়নমূলক আরও ভালো কিছু করতে পারতো। সুফিয়া কামাল নিজেও যখন কাজের সন্ধান করেছিলেন, তখনও দেখা গেছে শিক্ষা না থাকার ফলে কাজ পাওয়ার পথটা তাঁর জন্য মসৃণ ছিল না। সুফিয়া কামাল তাঁর স্মৃতিচারণে বলেছিলেন,

> মধ্যবিত্ত মেয়েরা, যারা একটু লেখাপড়া জানতো তারা সে সময়টাতে এখানে-ওখানে কাজ নিল। তখন মহিলারা প্রথম জানতে পারল যে, কাজের দরকার আছে। অল্পবিস্তর লেখাপড়া যারা জানতো তারা এইসব বিভিন্ন সংস্থা যেমন অনাথ আশ্রম, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা রেডিও অফিস ইত্যাদিতে চাকরি নিল। মধ্যবিত্তদের কাজ এভাবেই শুরু হল। আমি নিজেও তো শিক্ষকতা করেছি কলকাতা কর্পোরেশন স্কুলে ৩০ এর দশকে। দেশ বিভাগের পর রেডিওতে কাজ করেছি ঢাকায়।[২৮] (হক, ২০১৩, পৃষ্ঠা ১৫৩)

শিক্ষা থাকার ফলে একটা ন্যূনতম মানসম্পন্ন জায়গায় কাজ করতে পারছিল নারীরা। শিক্ষার জন্যই নারীরা পরিবারকে আর্থিক সহায়তা দিতে পারছিল। পুরুষ সমাজ যদি নারীর এই সাহায্যকে মর্যাদা দিতো তবে নারীর শিক্ষাক্ষেত্রে এতো বাধা আসতো না। সুফিয়া কামাল উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, নারী যে যুগে যে অবস্থাতেই থাক না কেন শিক্ষা তাকে মর্যাদা দিতে পারে। সুফিয়া কামাল প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাকেই নারী জাগরণের একমাত্র হাতিয়ার হিসাবে ভাবেন নি কখনো। তিনি চেয়েছেন নারী জাতিকে তথা সমাজের মানুষকে সচেতন করতে। নারীরা অবরুদ্ধ থাকতে থাকতে জগতের কোন দিকেই তাদের জ্ঞান বিকশিত হতে পারেনি।

বাস্তবতার নিরিখে নারীর শিক্ষাচিন্তা

সুফিয়া কামাল পাকিস্তান আমলে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার যেভাবে সমালোচনা করলেন তা থেকে বোঝা যায়, তিনি হাতে কলমে শিক্ষা বা কারিগরি শিক্ষাকে বেশি প্রাধান্য দিয়েছিলেন। কারণ এ দেশ উন্নয়নশীল একটি দেশ। শিক্ষার হার বাড়ার সাথে সামঞ্জস্য রেখে কাজের ক্ষেত্র তৈরি হচ্ছে না, এতে করে বেকার শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর সংখ্যাও বেড়ে চলছিল। তাই তিনি কারিগরি শিক্ষা ও যে শিক্ষা বাস্তবজীবনে কাজে লাগে, এ ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করতে মত প্রকাশ করেছিলেন,

> গতানুগতিক শিক্ষা ব্যবস্থায় আমাদের ছেলে-মেয়েদের বিজ্ঞান, কলা, কারিগরি ও চিকিৎসার কোন ক্ষেত্রেই এই জ্ঞানের সত্যিকার প্রসার হচ্ছে না, বরং জ্ঞান সঙ্কুচিত হচ্ছে।[২৯] (বেগম, ১৯৯৭, পৃষ্ঠা ৬২)

তিনি নারী শিক্ষার দিকে আলোকপাত করে বলেন, দেশে বৈজ্ঞানিক শিক্ষা পদ্ধতির ব্যবস্থা করা গেলে শিক্ষিত নারীদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা তুলনামূলক সহজ হতো।

> বর্তমানে মধ্যবিত্ত ঘরের শিক্ষিত মেয়েদের সমস্যা ক্রমেই যেন বেড়ে চলেছে। তাদের সম্মুখে কোন কাজের সংস্থান নেই। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে এদেশে শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা হলে এ অবস্থার সৃষ্টি হতো না।[৩০] (বেগম, ১৯৯৭, পৃষ্ঠা, ৬৩)

সুফিয়া কামাল নারীদের শিক্ষার সুযোগ নিয়েই শুধু বলেননি, সেই শিক্ষাকে যেন নারীরা যথাযথভাবে কাজে লাগাতে পারে সে জন্যও তিনি সজাগ ছিলেন। পাবলিক সার্ভিস কমিশনে নারীদের যেন নিয়োগ দেওয়া হয় সে জন্য পূর্ব পাকিস্তান মহিলা

পরিষদের মাধ্যমে কাজ করে গেছেন। নারী শুধু শিক্ষা সনদ নিয়ে বসে থাকবে, সমাজের কোন কাজে আসবে না এমনটা যেন না হয় সে জন্য তাঁর এ পদক্ষেপ।

নারীর শিক্ষাচিন্তায় সোভিয়েত ভ্রমণের অভিজ্ঞতা

সোভিয়েত দেশটির নারী ও শিশুর অগ্রগতি তাঁকে আকৃষ্ট করেছিলো। সে দেশের মতো এ দেশের সামাজিক ও শিক্ষা ব্যবস্থা যদি হতো- তবে এ দেশও এগিয়ে যেত বহুদূর। সে দেশে ধনী-দরিদ্রের বর্ণ বিভেদ নেই, সবাই সাম্যের গান গাইছে, প্রত্যেক শিশু সে দেশের ভবিষ্যৎ রূপে বেড়ে উঠছে। তিনি তাঁর 'সোভিয়েতের দিনগুলি' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন-

> সোভিয়েত দেশকে আজ নারীরাজ্য বলে আখ্যায়িত করলে খুব অত্যুক্তি করা হবে না। সমস্ত দেশময় নারীরা কর্মী হিসেবে কাজ করছেন। কারখানা, ফ্যাক্টরি, ট্রাম, রেলের কর্মী, অথবা বিচারক, ম্যাজিস্ট্রেট, ডাক্তার, বৈজ্ঞানিক, শিক্ষক- এমন কি মন্ত্রীর তো কোন হিসাবই নেই, মহাশূন্যচারিণীও সেখানেই প্রথম অভ্যুদিতা হয়েছেন। অথচ এদের সকলের স্বামী-সংসারও আছে আর এদের সুন্দর সুষ্ঠু জীবনযাত্রা প্রণালীও যে কোন দেশের চাইতে উন্নততর। এর কারণ, দেশের সন্তানেরা রাষ্ট্রের মহামূল্যবান সম্পদ হিসেবে সংরক্ষিত ও শিক্ষিত হচ্ছে এবং তাদের ভবিষ্যৎ জীবন-যাত্রা—পথের নির্দেশও তারা পেয়ে যাচ্ছে যার যার যোগ্যতা অনুসারে।[৩১] (কামাল (সম্পা), ২০০২, পৃষ্ঠা ৫৫৫)

নিজের দেশের মানুষদের সুন্দর ও সুখী দেখতে চেয়েছেন সুফিয়া কামাল। তিনি একটি সুন্দর অসাম্প্রদায়িক দেশের স্বপ্ন দেখেছিলেন। যেখানে সবাই মিলে মিশে কাজ করবে, জাতি ভেদাভেদ থাকবে না।

সুফিয়া কামাল মানতেন একটি রাষ্ট্র যদি চায় তবে তার নাগরিকদের সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার সক্ষমতা রাখে। এর জন্য প্রয়োজন মহৎ উদ্যোগের। নাগরিকের মৌলিক চাহিদা পূরণের ভার রাষ্ট্র নিয়ে নিলে নাগরিকদের সম্ভাবনা কাজে লাগিয়ে তাদের সম্পদে পরিণত করা যায়। রাষ্ট্র এবং সরকার সম্মিলিতভাবে এ কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। সুফিয়া কামাল শিক্ষার বিষয়ে অত্যন্ত দূরদর্শী ব্যক্তিত্ব ছিলেন কারণ একজন নাগরিকের জন্য শিক্ষার প্রয়োজন যে কারণে- সে উদ্দেশ্য অর্জন হচ্ছে না সরকার ও রাষ্ট্রের সম্মিলিত প্রচেষ্টার অভাবে। কোন রাষ্ট্রই রাতারাতি উন্নয়ন করে না। তার জন্য থাকে পরিকল্পনা, সময় এবং একনিষ্ঠ শ্রম। যদি শিক্ষা ক্ষেত্রে উন্নয়নের জন্য একনিষ্ঠ হতে পারা যায় তবে শিক্ষা এ দেশের মানুষদেরও সম্পদে পরিণত করবে।

৩.৩ নারীর শিক্ষা ও ক্ষমতায়ন বাস্তবায়নে মনন, কর্ম ও উদ্যোগ: লীলা নাগ, শামসুন নাহার ও সুফিয়া কামাল

৩.৩.১ লীলা নাগ

নারীর শিক্ষা ও ক্ষমতায়ন লীলা নাগের চিন্তায় বা মানসেই কেন্দ্রীভূত ছিল না। তৎকালীন নারী সমাজের প্রতিনিধিত্বকারী একজন নারী হিসেবে নিজ অবস্থান থেকে নারীর শিক্ষা ও ক্ষমতায়নে অবদান রাখার জন্য প্রচেষ্টা ও ছিলো। ছাত্রী অবস্থা

থেকেই তিনি এই বিষয়ে উদ্যোগ নিয়েছিলেন। সমাজের রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গি এবং দেশের পরাধীন ও অস্থিতিশীল অবস্থা তখনকার সময়ে নারীর দেয়ালে আবদ্ধ জীবনকে ঠেলে দিয়েছিলো আরও অন্ধকার ও পশ্চাদপদ অবস্থার মধ্যে। নারীর জীবনের অন্ধকারের সাথে পুরুষ সমাজের সহিংস অত্যাচারও করাল থাবা বসিয়েছিল।

একটি বিষয় এখানে প্রাসঙ্গিকভাবেই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে; সেটি হচ্ছে অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে শিক্ষাকে কাজে লাগানো। কারণ তখনকার সমাজে বাঙালি নারীরা পুরুষের কাছে সব দিকে আনুগত্য শিকার করে নিতে বাধ্য হয়েছিলো। তাদের জীবনের ভালো-মন্দ নির্ধারণ করতো পুরুষ। কোন বিষয়ে সিদ্ধান্তে পুরুষের কথাই ছিল শেষ কথা। এর মূল কারণ ছিল অর্থনৈতিক আধিপত্য। নারীর সকল রকম ভরণ পোষণের দায়িত্ব যেহেতু পুরুষের সেহেতু নারীর সকল বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকারও তার হস্তগত হয়ে গিয়েছিলো। সিদ্ধান্ত গ্রহণ বা বাক-স্বাধীনতার ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক বিষয়টি মুখ্য হয়ে উঠেছে। সেজন্যই লীলা নাগ এম.এ পাশ করার পর নারী সমাজের জন্য কাজ করার সিদ্ধান্ত নেন। নারীর শিক্ষা লাভের পাশাপাশি তাদের অর্থনৈতিক কাজে লাগানোর বিষয়টি সামনে রেখে ১৯২৩ সালের ডিসেম্বর মাসে 'দীপালি সংঘ' প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর এই উদ্যোগে পাশে ছিলেন ঠাকুর বাড়ির এনা রায়, ঢাকার ব্যারিস্টার পি.কে বসুর দুই কন্যা মনোরমা বসু, কমলা বসু, ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম ডা: নেপাল রায়ের দুই কন্যা লতিকা রায়, লীলা রায়, শ্রীহট্ট মুরারীচাঁদ কলেজের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ অপূর্বচন্দ্র দত্তের কন্যা বীণা দত্ত, অমলচন্দ্র বসুর সহধর্মিণী সরোজ বসু ছাড়াও অমলা বসু, ফুলা গুপ্ত, মিসেস আর সি রায় প্রমুখ প্রগতিশীল নারীরা। ১৯২৪ সালে বঙ্গলক্ষ্মীর প্রথম বর্ষের দ্বিতীয় সংখ্যায় দীপালি সংঘের সম্পাদিকা লীলা নাগ দীপালি সংঘের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেছিলেন, দীপালির উদ্দেশ্য জ্ঞান-কর্ম-আনন্দহীন নারী সমাজকে জ্ঞানে ও কর্মে প্রতিষ্ঠিত করে সজীব, সতেজ ও আনন্দময় জীবন গঠন করতে সহায়তা করা। অবরুদ্ধ জীবনের জড়তা ত্যাগ করে নারী সমাজকে স্বনির্ভর ও মুক্তির দিগন্তে আসার আহ্বান করেছিলেন লীলা নাগ। দীপালি সংঘের উদ্দেশ্য সাধনে তার কর্মক্ষেত্র ছিল ব্যাপক— সমাজসেবা, শিল্পচর্চা, জ্ঞান ও শিক্ষা বিস্তার। সমাজসেবা বিভাগের কাজ ছিল নারীদের অর্থকরী শিল্প, স্বাস্থ্য ও শিল্পায়ন সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া। দীপালি সংঘ সকল স্তরের নারীর মধ্যে দেশপ্রেম, জাতীয়তাবোধ ও প্রাণের সঞ্চার করতে সক্ষম হয়েছিলো। নারী সমাজে সচেতনতা জাগানো, সামাজিক কুপ্রথা ও দুরাচার প্রভৃতি দূর করার লক্ষ্যে দীপালি সংঘ কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলো।

দীপালি সংঘের মাধ্যমে লীলা নাগ গোড়াতেই শিক্ষা বিস্তারে ব্রতী হয়েছিলেন। একই সাথে নারী পুরুষের সমান অধিকার নিয়ে প্রবলভাবে সোচ্চার হয়েছিলেন। দীপালি সংঘের জনপ্রিয়তার কারণে বিভিন্ন স্থানে দীপালি সংঘের শাখা গড়ে উঠেছিলো। প্রতি সপ্তাহে একদিন করে শাখা সমিতির অধিবেশন বসতো। লেখাপড়া, শিল্পকর্ম, হাতের কাজ যেমন- বেতের কাজ, সুতার কাজ, চরকায় সুতা কাটা ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষাদান করা হতো। এছাড়া অল্প ব্যয়ে সেলাই, বস্ত্র বয়ন, চিত্রাঙ্কন ও সঙ্গীত শিক্ষার ব্যবস্থাও করা হতো। সচেতনতা বৃদ্ধি করতে জ্ঞান ও শিক্ষা বিভাগ থেকে নানা বিষয়ে বক্তৃতা ও আলোচনার আয়োজন করা হতো।

লীলা নাগ তাঁর দূরদর্শী দৃষ্টিভঙ্গির কারণে বুঝতে পেরেছিলেন নারী সমাজকে স্বদেশের কাজে লাগাতে না পারলে সমাজ ও দেশ এর গঠনে ভারসাম্যহীন অবস্থা থেকে যাবে। নারী সমাজকে দেশ সম্পর্কে সচেতন করতে হবে, বুঝাতে হবে পুরুষ সমাজের মতো তারাও এ দেশের সকল কাজে সমান অংশীদার। দেশের কাজে নিজেদের সম্পৃক্ত করার সম্যক যোগ্যতা

নারীদের। বিশেষ করে স্বদেশী আন্দোলনে যুক্ত হওয়ার জন্য অনেকেই লীলা নাগের কাছে প্রশিক্ষণ নিতে এসেছিলেন। সর্বজনবিদিত চট্টগ্রামের বিপ্লবী মাস্টারদা সূর্যসেনের সংঘ ছিল 'যুগান্তর দল'। তাঁদের নিজেদের প্রতিষ্ঠিত সংঘের মধ্যে আদর্শগত সাদৃশ্য তাঁদের যোগাযোগ, সুসম্পর্ক ও পারস্পারিক শ্রদ্ধাবোধের মূল ভিত্তি। স্বদেশী আন্দোলনের অন্যতম অকুতোভয় বিপ্লবী প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার ঢাকায় ইডেন কলেজে পড়তে এসে লীলা নাগের দীপালি সংঘের সদস্য হয়েছিলেন। তিনি লীলা নাগের কাছ থেকে অস্ত্র শিক্ষা নিয়েছিলেন। তখনকার স্বদেশী আন্দোলনের প্রশিক্ষণ চলতো লোক চক্ষুর অন্তরালে। বিপ্লবী সদস্যদের বিভিন্ন ধাপে নানা পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হতো, প্রমাণ করতে হতো দলের প্রতি ও দেশের প্রতি তার দায়বদ্ধতা ও বিশ্বস্ততা। এসকল পরীক্ষায় যারা উত্তীর্ণ হতো তাঁরা দেশের জন্য সর্বত্যাগী তদুপরি দেশের জন্য আত্মত্যাগী হতে বদ্ধপরিকর- এটাই প্রমাণিত হতো। প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার নিঃসন্দেহে তেমনি একজন বিপ্লবী ছিলেন, ইতিহাস আমাদের সেই সাক্ষ্য দেয়। দীপালি সংঘের সশস্ত্র প্রশিক্ষণের মুখ্য ছিলেন স্বয়ং লীলা নাগ। তাঁর হাতেই প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার এর অস্ত্র শিক্ষার পাঠ সম্পন্ন হয়েছিলো। "দীপালি সংঘের সাবেক সদস্যা প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার ভারতের প্রথম মহিলা শহিদ হিসেবে আত্মাহুতি দিয়েছিলেন।"[৩২] (হোসেন, দাশগুপ্ত এবং অন্যান্য, ১৯৯৮, পৃষ্ঠা- ৩৩)

এই রাজনৈতিক প্রশিক্ষণ ছাড়াও দীপালি সংঘে আরও বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো। নারী সমাজকে বিভিন্ন দিক থেকে সচেতন করার জন্য এ সকল কার্যাবলী ছিল প্রাসঙ্গিক ও সময়োপযোগী। শিক্ষাদানের বিষয়গুলো ছিলো—

- কুটির শিল্প শিক্ষা — কাপড় উৎপাদন, বাঁশ-বেত ও সেলাইয়ের কাজ
- স্বাস্থ্যশিক্ষা
- শিশু পালন ও পরিচর্যা
- স্টাডি সার্কেল গঠন ও পাঠাগার স্থাপন
- বয়স্কশিক্ষা
- শিশুশিক্ষা
- আমোদ-প্রমোদ চিত্তবিনোদন
- খেলাধুলা
- ব্যায়ামশিক্ষা
- সঙ্গীতশিক্ষা
- অভিনয়

সংঘের এই কার্যক্রম পরিচালনার নেতৃত্বে ছিলো লীলা নাগের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধান। পাশাপাশি প্রতি মাসে দীপালি সংঘে মাসিক সভা আয়োজন করা হতো যেখানে সদস্যদের নিয়মিত উপস্থিতি ছিল আবশ্যক। এর মাধ্যমে যেন নারী সমাজে পারস্পারিক ঐক্য সৃষ্টি হতে পারে। এছাড়াও দীপালি সংঘের সদস্য হওয়ার প্রতিজ্ঞাপত্রে কিছু কার্যক্রমে অংশগ্রহণের শর্ত থাকত। এসব কাজের মধ্যে ছিল সম্মিলিতভাবে বৃক্ষরোপণ, সব্জিবাগান করা, বয়স্ক মহিলাদের স্বদেশ-ধর্ম চিন্তায় উদ্বুদ্ধকরণ, বাল্যবিবাহ রোধ, অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ ও মেয়েদের স্কুলে পাঠানো। এ কাজগুলোর মধ্য থেকে প্রতিদিন ন্যূনতম একটি কাজ সম্পন্ন করা ছিল প্রতিজ্ঞাপত্রের অন্যতম শর্ত। দীপালি সংঘের এসব কার্যক্রম ছিল নারী সমাজকে সবদিক থেকে চার দেয়ালের বাইরের জগৎ ও প্রকৃত সংঘর্ষের সাথে পরিচিত করানো। যাতে বাস্তব পরিস্থিতির সাথে সমাজে নিজেদের অবস্থানকে প্রত্যক্ষ করে সেখান থেকে উত্তরণের চেষ্টা করতে পারে। স্ব স্ব অবস্থানে নিজেদের জীবনের প্রতি দায়িত্ববোধ জাগ্রত করা, উপার্জন দক্ষতা উন্নয়ন ও মতামত দেওয়ার ক্ষমতা বৃদ্ধি করা নারী সমাজের মুক্তির পথে অত্যাবশ্যক ছিল। সেদিক থেকে দেখলে লীলা নাগের এই মহতী উদ্যোগ প্রশংসার দাবি রাখে। সামাজিক প্রগতিশীলতায় দীপালি সংঘের ভূমিকা সম্পর্কে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সুকুমার দত্তের অভিব্যক্তি প্রণিধানযোগ্য—

দীপালির আলো অনেকদিন হয় নিভিয়া গিয়াছে। কিন্তু ঢাকা শহরে স্বাধীনতা আন্দোলনের ইহা প্রথম আলোর অভ্যুদয়।[৩৩] (মোহান্ত, ১৯৯৯, পৃষ্ঠা- ৩০)

নারীর উচ্চশিক্ষা

দীপালি সংঘ নারী সমাজে ইতিবাচক সাড়া জাগানোর পরে লীলা নাগ অনুধাবন করলেন নারী সমাজের জন্য দীপালি সংঘের আয়োজিত প্রাথমিক শিক্ষা যথেষ্ট নয়। নারীদের উচ্চশিক্ষার জন্য বিশের দশকে ঢাকায় স্কুল ছিল অপ্রতুল। নারীদের উচ্চশিক্ষার জন্য একটি মাত্র উচ্চবিদ্যালয় ইডেন স্কুল যথেষ্ট নয়। তিনি ১৯২৩ সালে অভয় দাস লেন-এ 'দীপালি হাইস্কুল' স্থাপন করেন। তিন বছর তিনি বিনা বেতনে কাজ করে এই স্কুলকে স্থিতিশীল অবস্থায় নিয়ে আসেন। বর্তমানে এই স্কুলটি 'কামরুন্নেসা হাইস্কুল' নামে পরিচিত। এর পরে ১৯২৪ সালে লীলা নাগ আরও একটি স্কুল স্থাপন করেন তবে সে স্কুল সম্পর্কে কোন তথ্য জানা যায়নি। লীলা নাগ নিজে এই স্কুলের প্রসঙ্গে লিখেন–

> বর্তমান যুগে নারীশিক্ষার প্রয়োজন আছে কিন্তু সুযোগ ও ব্যবস্থার অভাব যথেষ্ট রহিয়াছে। বিদ্যালয়ের স্থানাভাব হেতু বহু বালিকাকে শিক্ষা লাভে বঞ্চিত থাকিতে হইতেছে। এই অভাব দূর করিবার আকাঙ্ক্ষায় ১৯২৪ সনে আর একটি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়। এই কার্যেহ বহু অর্থ ও অবৈতনিক সাহায্য দানে দীপালি সঙ্ঘ বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন।[৩৪] (মোহান্ত, ১৯৯৯, পৃষ্ঠা- ৩১)

১৯২৮ সালের ২রা ফেব্রুয়ারি তিনি 'নারীশিক্ষা মন্দির' স্থাপন করেন। টিকাটুলিতে বর্তমানে সেটি 'শেরেবাংলা বালিকা মহাবিদ্যালয়' নামে পরিচিত। এছাড়া লীলা নাগের উদ্যোগে ঢাকার বিভিন্ন স্থানে প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়গুলো– ১। নিউ হাই স্কুল (অভয় দাশ লেন), ২। শিক্ষাভবন (বকসী বাজার), ৩। শিক্ষায়তন (কায়েতটুলি), ৪। বাংলাবাজার বালিকা বিদ্যালয় (বাহাদুর শাহ পার্ক সংলগ্ন), ৫। শিক্ষালয় (হেয়ার স্ট্রিট)। এই বিদ্যালয়গুলো ছাড়াও শহরের বিভিন্ন পাড়ায় ১২টি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ঢাকা ছাড়াও সিলেটে মায়ের নামে 'কুঞ্জলতা বালিকা বিদ্যালয়' স্থাপন করেন; মানিকগঞ্জে জীবনসঙ্গী অনিল রায়ের সহযোগে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়, একটি হাইস্কুল ও মেয়েদের জন্য একটি পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করেন। এছাড়া ১৯৩০ সালে কলকাতায় দীপালি সংঘের কর্মকাণ্ড সম্প্রসারণের জন্য 'দীপালি শিক্ষা মন্দির' নামে মেয়েদের জন্য বিদ্যালয় স্থাপন করেন।[৩৫] (মোহান্ত, ১৯৯৯, পৃষ্ঠা- ৩৩)

বয়স্ক নারী শিক্ষা

সমাজের বয়স্ক নারীদের শিক্ষা ও সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য ত্রিশের দশকে 'গণশিক্ষা পরিষদ' নামে একটি সংগঠন গড়ে তুলেছিলেন। দীপালি সংঘের মেয়েরা এখানে শিক্ষাদান করতো। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, জে. এম. সেনগুপ্ত প্রমুখের স্বাক্ষর নিয়ে এর যাত্রা শুরু করেন। ঢাকার বিভিন্ন স্থানে বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে উঠেছিলো, যেমন- টিকাটুলি, ওয়ারী, বকশীবাজার, ঠাঠারিবাজার, শাঁখারিপট্টি, কায়েতটুলি ইত্যাদি অঞ্চলে।

স্বদেশী আন্দোলনের অংশ হিসেবে কুটির শিল্পের সংশ্লিষ্টতা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ। 'স্বদেশী পণ্য কিনে হও ধন্য' এই স্লোগানের ভিতরে স্বদেশী আন্দোলনের ডাক ও কুটির শিল্পের উত্থানের বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। লীলা নাগ চেয়েছিলেন নারীরা শিক্ষার পাশাপাশি অর্থনৈতিকভাবে স্বাধীন হয়ে উঠুক এবং তারা তাদের কাজের মাধ্যমে দেশের জন্য অবদান রাখুক। দীপালি সংঘের আওতায় পৃথক একটি শাখা শিল্পশিক্ষা কেন্দ্রের কাজ তত্ত্বাবধান করতো।

পাঠাগার স্থাপন

জ্ঞানের বিশাল দিগন্তের সাথে পরিচয় ঘটাতে হলে বিদ্যালয়ের ধরা-বাধা পাঠ্যবইয়ের বাইরেও বই পড়তে হয়। অবরুদ্ধ নারী সমাজের জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধির উপায় হিসেবে লীলা নাগ পাঠাগার স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিলেন। মেয়েদের প্রগতিশীল মানস গঠন, স্বদেশপ্রেম জাগ্রত করা, সমাজের কুসংস্কার-কূপমণ্ডূকতা দূরীভূত করে বিজ্ঞানমনস্ক করে তোলার ক্ষেত্রে পড়াশোনার বিকল্প নেই। তাই দীপালি সংঘের উদ্যোগে মেয়েদের জন্য পাঠাগার তৈরি করা হয়েছিলো। পাঠাগারে তখনকার সময়ের পত্রিকার সংগ্রহ ছিল অধিক। সমকালীন বাস্তবতার সাথে মেয়েদের পরিচয় করানোর জন্য এই উদ্যোগটি ছিল প্রশংসনীয়। এছাড়াও উচ্চশিক্ষার পথ সুগম করার জন্য দূর দূরান্তের ছাত্রীদের জন্য হেয়ার স্ট্রিটে ছাত্রীনিবাস স্থাপন করেন। মেয়েদের সামাজিক নিরাপত্তা প্রদান, আসা-যাওয়ার অসুবিধা ও সার্বক্ষণিকভাবে কাজে অংশগ্রহণের প্রতিবন্ধকতা রোধ করার জন্য থাকার জায়গার ব্যবস্থা করেন লীলা নাগ। এছাড়া শিক্ষিত মেয়েরা নিরাপদ বাসস্থানের অভাবে বাইরে চাকুরি করতে বাধার সম্মুখীন হচ্ছিলো, লীলা নাগ চাকুরীজীবী নারীদের জন্য কর্মজীবী মহিলা হোস্টেলও চালু করেছিলেন। কিন্তু পরে সেটি বিপ্লবী নারীদের আশ্রয়স্থল হয়ে উঠেছিলো।

দীপালি ভাণ্ডার

দীপালি সংঘের মূলধন দিয়ে দীপালি ভাণ্ডার খোলা হয়েছিলো। তখনকার সমাজের মহিলাদের পুনর্বাসন ও উন্নয়ন কাজের উদ্দেশ্যে এই ভাণ্ডার স্থাপন করা হয়েছিলো। পুনর্বাসিত নারীরা তাদের হাতের কাজের জিনিস তৈরি করে ক্রয়-বিক্রয় করে তাদের আয়ের পথ সুগম করতে পারবে এই চিন্তা থেকে 'দীপালি ভাণ্ডার' তৈরি করেছিলেন লীলা নাগ। এর পাশাপাশি 'নারী রক্ষা ফান্ড' গড়ে তোলেন। বিধবা, স্বজনহীন বৃদ্ধা, সমাজকর্তৃক বহিষ্কৃত নারী, ধর্ষিতা, নিপীড়িত নারীদের জীবন রক্ষা ও সাহায্যের জন্য এই ফান্ড গড়ে তোলেন তিনি। এই নারীদের শিক্ষার পাশাপাশি আত্মরক্ষার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও করেন তিনি। লাঠিখেলা, কুস্তি ইত্যাদি অনুশীলন করতেন এখানকার পুনর্বাসিত নারীরা। শুধু পুনর্বাসিত নারী নয়, দীপালি সংঘের সকল সদস্যের কথা মাথায় রেখে ব্যায়াম ও খেলাধুলা মৌলিক কার্যক্রমের অংশ ছিল। লীলা নাগ তখনকার সমাজের অবস্থা দেখতে পেয়েছিলেন, নারীরা পুরুষ শাসিত সমাজে বিশ্বস্ত ব্যক্তি দ্বারা রুদ্ধ থাকলেও তারা অরক্ষিতা, তাদের আত্মরক্ষার কৌশল জানা নেই। নিজেদের শরীর ও স্বাস্থ্য নিয়ে অজ্ঞ, উদাসীন এবং সর্বোপরি লজ্জাশীল। শারীরিক বিষয়ে নারীর এই সংকোচ তার কাজে প্রভাব ফেলে। তখনকার সময়ে বিপ্লবী কাজে আত্মরক্ষা এবং দ্রুত শরীর সঞ্চালনের প্রয়োজন ছিল। তাই লীলা নাগ নারীদের শারীরিক ও মানসিক শক্তি বৃদ্ধির জন্য ব্যায়ামাগার স্থাপন করেন। ছুরি, লাঠি

চালনা ব্যায়ামের অংশ ছিল। এছাড়া দশ জনের সামনে এসে মেয়েদের দাঁড়ানো বা কথা বলার যে সংকোচ সেগুলো কাটানোর জন্য খেলাধুলা, সঙ্গীত, অভিনয় ইত্যাদি শেখানোর ব্যবস্থা করেছিলেন। এতে করে নারীদের বিনোদনেরও যেমন ব্যবস্থা হয়েছিলো তেমনি ঘরের বাইরে মুক্ত পরিবেশে আসার সুযোগ তৈরি করে দিয়েছিলো।

ভারতবর্ষের প্রথম ছাত্রী সংগঠন

বাংলা তথা ভারতের প্রথম ছাত্রী সংগঠন গড়ে ওঠে লীলা নাগের হাত ধরে। "১৯২৬ সালে 'দীপালি ছাত্রী সঙ্ঘ' নামে ছাত্রী সংগঠন (ভারতে প্রথম) করে তার মাধ্যমে ছাত্রীদের মধ্যে রাজনীতি চর্চা শুরু করেন।"[৩৬] (বসু সম্পা, ১৯৭৬, পৃষ্ঠা- ৫০২) নারী জাগরণকে ত্বরান্বিত করা ও উচ্চশিক্ষিত মেয়েদের মধ্যে স্বদেশী চেতনাকে ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে ১৯২৬ সালে লীলা নাগ গঠন করেন 'দীপালি ছাত্রী সঙ্ঘ'। উনিশ শতকের শুরুর দিকে রাজনৈতিক সংগঠন ও তাদের কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ নারীদের পক্ষে কষ্টসাধ্য ছিল। সে অবস্থায় 'দীপালি সঙ্ঘ' এক উপযুক্ত এবং পরিমার্জিত সংগঠন হিসেবে ছাত্রীদের সুযোগ করে দিয়েছিলো নিজেদের দাবি ও মতামত প্রকাশ, সামাজিক, রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশ নেওয়ার। বেথুন কলেজ, ইডেন হাইস্কুল, জগন্নাথ কলেজ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এই সংঘের কাজ কর্মের পরিধি ছিল বিশাল। লীলা নাগের এই সংগঠনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে ড. রঙ্গলাল সেন বলেন,

> ১৯২৬ সালে তার প্রচেষ্টায় 'দীপালি ছাত্রী সংঘ' স্থাপিত হয়। ছাত্রী-তরুণীদের আবেগ প্রবণতাকে সংহত শক্তিতে রূপদান করাই ছিল এর উদ্দেশ্য।[৩৭] (মোহান্ত, ১৯৯৯, পৃষ্ঠা- ৩৬)

নারীশিক্ষা ও ক্ষমতায়ন নিয়ে লীলা নাগ জীবনের শুরু থেকেই কাজ করে গেছেন। ১৯৩০ সালের পর বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে সক্রিয় হয়ে যাওয়ার পর স্বদেশী আন্দোলনে দীর্ঘ সময় কারাভোগ, দেশভাগ নিয়ে সাম্প্রদায়িক সহিংসতা, দাঙ্গা, অস্থিতিশীল অবস্থায় নারীর শিক্ষা নিয়ে সরাসরি কাজ করার সুযোগ না হলেও নারী তথা মানুষের পাশে আজীবন তিনি সক্রিয় ছিলেন। ১৯৪৯ সালে দেশভাগের দ্বিজাতি তত্ত্বের সাম্প্রদায়িক বিষয়টিকে তুলে ধরে লীলা নাগকে পূর্ব পাকিস্তান ত্যাগ করতে হয়। ভারতে গিয়েও তিনি সক্রিয় ছিলেন সমাজ ও দেশের কাজে। মানুষের জীবনে শিক্ষা-সচেতনতা ছড়িয়ে সুন্দর সমাজ গঠনের স্বপ্ন দেখেছিলেন এবং এগিয়ে গিয়েছিলেন সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নের দিকে।

৩.৩.২ শামসুন নাহার মাহমুদ

সামাজিক কাজের হাতেখড়ি

শামসুন নাহার মাহমুদ বাংলা নারী সমাজের শিক্ষা ও ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে নিজ অবস্থান থেকে কর্ম উদ্যোগ নিয়েছিলেন। নিজ জীবনে দেখেছিলেন সমাজের রক্তচক্ষু কিভাবে তাঁকে বারবার জীবন সংগ্রামের দিকে ঠেলে দিয়েছিলো। নারী সমাজের শিক্ষা ও ক্ষমতায়নের কাজে বেগম রোকেয়ার কাছে তাঁর হাতেখড়ি। তাঁর জীবনে বেগম রোকেয়ার আদর্শ ও দর্শনের প্রভাব প্রবল লক্ষ করা যায়। বেগম রোকেয়া কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'আঞ্জুমনে খাওয়াতীনে ইসলাম' ছিল তাঁর কাজের প্রেরণা। বাংলার

নারী সমাজের জন্য 'আঞ্জুমনে খাওয়াতীনে ইসলাম' ছিল নারীদের অসূর্যম্পশী অন্ধকার জীবনে এক আলোকবর্তিকাস্বরূপ। বেগম রোকেয়া নিজে শামসুন নাহার মাহমুদকে উত্তরাধিকার হিসাবে 'আঞ্জুমনে খাওয়াতীনে ইসলাম' এর কাজে প্রত্যক্ষভাবে সম্পৃক্ত করেছিলেন। বেগম রোকেয়ার অকাল প্রয়াণের পর এই সংগঠনের দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন। চেষ্টা করেছিলেন বেগম রোকেয়ার অসম্পূর্ণ কাজগুলো সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে। বাঙালি মুসলিম নারীদের বিশেষ করে বস্তির মেয়েদের পড়াশোনা শেখানো, হাতের কাজ শেখানো যাতে তাদের মধ্যে সচেতনতার সৃষ্টি হয় এবং তাদের দক্ষতা যেন আর্থিকভাবে কাজে লাগাতে পারে- সেটি ছিল 'আঞ্জুমনে খাওয়াতীনে ইসলাম' এর উদ্দেশ্য।

বেগম রোকেয়ার অকাল প্রয়াণ ও নতুন করে দায়িত্ব গ্রহণ

নিখিল বঙ্গীয় মুসলিম মহিলা সমিতির সাথে শামসুন নাহার মাহমুদ যুক্ত হয়েছিলেন। বেগম রোকেয়া ও তাঁর উদ্যোগে ১৯৩২ সালের মে মাসে মহিলা সভার আয়োজন করা হয়েছিলো। সেখানে নারীর শিক্ষা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছিলো। মেয়েরা যেন স্কুল কলেজের শিক্ষা লাভ করতে পারে সেজন্য সুষ্ঠু উদ্যোগ নিতে হবে। শিক্ষা ব্যবস্থায় পদ্ধতিগত পরিবর্তন নিয়ে কথা বলা হয়েছে, নারীর জন্য শিক্ষা ক্ষেত্রে দ্বার উন্মুক্ত করতে হলে পরিবর্তন আবশ্যক। এসকল বিষয় নিয়ে এই সভায় বক্তব্য রাখা হয়। সরকারের প্রতি সুপারিশ করা হয় বিশেষজ্ঞ মহিলাদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করে এই বিষয়ে কাজ শুরু করার। নারীদের শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত করার জন্য তারা আন্দোলন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং আন্দোলন করার জন্য যে কমিটি করা হয়, তাতে শামসুন নাহার মাহমুদকে সেক্রেটারি নির্বাচন করা হয়েছিলো। কলকাতায় মুসলিম নারীদের এত বড় সভা আর আয়োজিত হয়নি। এই সভার পরে মুসলিম নারী সমাজে জাগরণের চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছিলো। কিন্তু সে অবস্থার ছন্দপতন ঘটে ১৯৩২ সালেই ৯ ডিসেম্বর বেগম রোকেয়ার অকাল প্রয়াণের মধ্য দিয়ে। শামসুন নাহার মাহমুদ এই অবস্থায় হাল ধরেছিলেন মুসলিম নারী সমাজের জাগরণ কার্যের।

১৯৩৩ সাল থেকে নিখিল ভারত নারী সম্মিলনের সাথেও নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত হন তিনি। নারী সম্মিলনের বার্ষিক অধিবেশনে যোগদান করতে করাচি গিয়েছিলেন। সেখানে ভারতের ও বিদেশের নারী জাগরণ ও মুক্তির আরও অনেক কর্মী উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে সরোজিনী নাইডু, রাজকুমারী অমৃত কাউর, বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত, বেগম শাহনওয়াজ, বেগম হবীবুল্লাহ, বেগম শরিফা হামিদ আলী, লেডী হারুন প্রমুখ ছাড়া বিলেতের ডক্টর মডরয়ডেন, মিস আগাথা হ্যারিসন, চীনের মিস টিয়ন প্রমুখ সমাজ কর্মী এসেছিলেন। নারী জাগরণের এই অধিবেশন সে সময় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলো।

এর পরের বছর ১৯৩৪ সালে কলকাতায় নিখিল ভারত নারী সম্মিলনের বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মিলনে শামসুন নাহার মাহমুদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। সে সময় বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় অবৈধ নারী ব্যবসা দমন প্রসঙ্গে Immoral Traffic Bill পেশ করা হয়। তখন এই বিলের স্বপক্ষে নারীদের মতামত সৃষ্টি করার জন্য তিনি নারী সমাজে ব্যাপক আন্দোলন চালান। আইন পরিষদে বিল উত্থাপনের দিন গ্যালারিতে নারীদের উপচে পড়া ভিড় হয়েছিলো। নারীদের শিক্ষা ও ক্ষমতায়নের সাথে সাথে তাদের নিরাপদ সামাজিক জীবন নিয়েও সোচ্চার হয়েছিলেন শামসুন নাহার মাহমুদ। নারীর উপর সমাজের অনৈতিক কার্যক্রমের বিপক্ষে তিনি ছিলেন সর্বদা দৃঢ় ও অটল অবস্থানে।

রাজনীতি সচেতন নারী সমাজ

নারীকে শুধু পারিবারিক ও সামাজিকভাবে সচেতন করা ও সুদৃঢ় করার সাথে সাথে রাজনৈতিকভাবে সচেতন ও সম্পৃক্ত না করতে পারলে রাষ্ট্রের সিদ্ধান্ত ও কাজে নারীর প্রবেশাধিকার রদ থাকবে। শামসুন নাহার মাহমুদ ছিলেন তখনকার সময়ের একজন রাজনীতি সচেতন নারী এবং সক্রিয় রাজনীতিক। ১৯৩৫ সালে ভারত শাসন সংস্কার-এর গৃহীত কার্যবিধির বিরুদ্ধে নারী সংগঠনগুলো আন্দোলন শুরু করে। ভারতের শাসনবিধি অনুসারে নারীদের ভোটাধিকার দেওয়া হলেও তা ছিল সীমাবদ্ধ ও খণ্ডিত। আইন অনুসারে কয়েকটি নির্দিষ্ট এলাকায় মহিলা সীট বরাদ্দ করা হয় এবং সমাজের অভিজাত নারীদের জন্য শুধু ভোটাধিকার প্রদান করা হয়েছিলো। নারীদের সার্বজনীন ভোটাধিকারের জন্য শুরু হয়ে যায় প্রবল আন্দোলন। বাংলায় এই আন্দোলনের পুরোভাগে ছিলেন শামসুন নাহার মাহমুদ। এমন কি বাংলার নারীদের রাজনৈতিক দাবি নিয়ে যখন উড়িষ্যার ভূতপূর্ব গভর্নর স্যার লরী হ্যামন্ডের কমিটিতে প্রতিনিধিত্ব করতে বলা হয় তখন প্রতিনিধি হিসেবে গিয়েছিলেন মিসেস এন.সি. সেন এবং শামসুন নাহার মাহমুদ। ভোটাধিকার প্রসঙ্গে হ্যামন্ড কমিটির সাথে যথেষ্ট বাদানুবাদ হয়, শেষে বঙ্গীয় আইন সভায় নারীদের ভোটাধিকার ও আসন সংরক্ষণের সুব্যবস্থা করা হয়।

১৯৩৬ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে কলকাতায় একটি আন্তঃদেশীয় নারী সম্মিলন অনুষ্ঠিত হয়। এর উদ্যোক্তা ছিলেন 'ইন্টারন্যাশনাল কাউন্সিল অব উইমেন'। চল্লিশটি দেশের নারী প্রতিনিধিরা এই সম্মিলনে অংশগ্রহণ করেন। শামসুন নাহার মাহমুদ এই সভায় আঞ্জুমনে খাওয়াতীনে ইসলাম এর পক্ষ থেকে বাংলার মুসলিম নারীদের প্রতিনিধি হিসেবে যোগদান করেন। এই সম্মিলনে আন্তর্জাতিক পর্যায়ের নারী সমাজের মত বিনিময় ছাড়াও তিনি তাদের নানা সুযোগ-সুবিধা-অসুবিধার দিকগুলো তুলে আনেন। এই অধিবেশনের আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে ছিল গ্রাম সংস্কার, শিক্ষা পদ্ধতি, সমাজসেবা, শিশু পালন , ছাত্রীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা, খাদ্য ও স্বাস্থ্য, নারীর আইনগত অধিকার, নারীর রাষ্ট্রীয় অধিকার, মাতৃমঙ্গল, নারী ও শিশু ক্রয়-বিক্রয়, বাল্য বিবাহ, পণ ইত্যাদি। শামসুন নাহার মাহমুদ এই অধিবেশনে তাঁর বক্তব্যে তুলে ধরেছেন- বাংলার মুসলিম নারী সমাজ পাশ্চাত্য সমাজের তুলনায় পিছিয়ে নেই; তাদের চলার পথের অন্তরায় বিষয়গুলো তুলে ধরে সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণ করলে বাংলার নারী সমাজও কোন অংশে পিছিয়ে থাকবেনা। তাদের মধ্যে যে মেধা ও মনন রয়েছে তা বিকশিত করার উপযুক্ত ক্ষেত্র তৈরি করে দিতে হবে। বাংলার নারীদের পশ্চাদপদতার কারণ হিসেবে শিক্ষার অভাবকে স্পষ্ট করে দেখিয়েছিলেন তিনি।

শিক্ষা ও সংস্কৃতির মেলবন্ধন

শামসুন নাহার মাহমুদ চাইতেন, নারী সমাজের জাগৃতি হোক শিক্ষার মাধ্যমে। কিন্তু তার পাশাপাশি সাহিত্য শিল্পকলার মাধ্যমেও নারীর মননের যথার্থ প্রকাশ ঘটুক সে বিষয়েও তিনি সজাগ দৃষ্টি রেখেছিলেন। তাই নারীর সাহিত্য সাধনাকে তিনি সাদরে অভিবাদন জানিয়েছিলেন। সাহিত্যের মধ্য দিয়ে জীবনের উপলব্ধিগুলো সমাজের মানুষের সামনে তুলে ধরার এটি এক অনন্য মাধ্যম। মসির শক্তি অসির চেয়েও বেশি- এ কথা যুগে যুগে প্রমাণিত। বেগম রোকেয়া পুরুষ সমাজের কাছে তাদের অসঙ্গতির কথা তুলে ধরেছিলেন তাঁর লেখনীর মধ্য দিয়ে। লেখনীর মধ্য দিয়ে তাঁর যে মনন প্রকাশ পেয়েছিল, তা এখনও অমর হয়ে আছে। তাই শামসুন নাহার মাহমুদ সাহিত্য চর্চার দিকে নারী জাতিকে উৎসাহিত করেছিলেন। তিনি নিজে

সাময়িক পত্র সম্পাদনা করতেন। তাঁর 'বুলবুল' পত্রিকায় নারীদের লেখার জন্য দ্বার ছিল অবারিত। 'মুসলিম মহিলা সাহিত্য সম্মেলনে' সভানেত্রীর ভাষণে তিনি আক্ষেপ করে বলেছেন, বাঙালি মুসলিম নারী সমাজ সাহিত্য চর্চায় এখনও অনেক পিছিয়ে। তবে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন যে, খুব বেশি দেরী নেই যখন মুসলিম নারী সমাজও সাহিত্য চর্চায় অংশ নিবে।

শত প্রতিবন্ধকতা উপেক্ষা করে বি.এ পাশ করার পর ১৯৩৯ সালে প্রথমে তিনি কলকাতায় লেডী ব্রেবোর্ন কলেজে শিক্ষকতা শুরু করেন। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর তিনি সপরিবারে পূর্ব পাকিস্তানে চলে আসেন। সে সুবাদে তিনি কলকাতা থেকে ঢাকায় ইডেন গার্লস কলেজে বদলি হয়ে এসেছিলেন। নিখিল পাকিস্তান শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ডের বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন তিনি। ১৯৫১ সালে ব্রিটেনের শিক্ষা দফতরের স্থায়ী সহকারী সেক্রেটারি মি এস এইচ উডের সাথে এদেশের শিক্ষা ক্ষেত্রে বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা করে সমাধানের উপায় চিহ্নিত করেছিলেন। ১৯৫৫ সালে তিনি কলম্বোতে অনুষ্ঠিত 'ইন্টারন্যাশনাল কাউন্সিল অব উইমেন' এর সম্মিলনে মাধ্যমিকস্তরে স্ত্রী শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা ও নানা সমস্যা চিহ্নিত করে রিপোর্ট পেশ করেন। মেয়েদের জন্য যুগোপযোগী পাঠ্যক্রম উন্নয়ন, শিক্ষক সমস্যা, সহশিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ ও শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ভাষা সমস্যা ইত্যাদি বিষয় তিনি রিপোর্টে উল্লেখ করেন।[৩৮] (পারভিন, ২০১২, পৃষ্ঠা- ১৪৫)

এছাড়াও কর্ম জীবনে তিনি বিভিন্ন সংস্থার সাথে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে ছিলেন। জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি পরিষদের পূর্ব পাকিস্তান শাখা, বাংলা ভাষা সংস্কার কমিটি, প্রাদেশিক রেড ক্রস সোসাইটির সম্মানিত সদস্য ছিলেন। [৩৯] (দাশপুরকায়স্থ, ১৯৯৯, পৃষ্ঠা- ১১৫)

পূর্ব পাকিস্তানে এসেও তাঁর নারী জাগরণের কাজ থেমে থাকেনি। পূর্ব পাকিস্তানে এসে তিনি জাতীয়, প্রাদেশিক ও অন্যান্য নারী কল্যাণ সংস্থার সাথে যুক্ত হয়েছিলেন এবং কাজ করেছেন। পূর্ব পাকিস্তানে তিনি নিখিল পাকিস্তান মহিলা সমিতি (All Pakistan Woman's Association) সংক্ষেপে APWA 'আপওয়া' গঠিত। ১৯৫০ সালের ১৫ ডিসেম্বর 'নিখিল পাকিস্তান মহিলা সমিতি' পূর্ব পাকিস্তান শাখার এক সম্মিলন অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে ১৯৫০-৫১ সালের জন্য পূর্ব পাকিস্তান শাখার নির্বাহী পরিষদে শামসুন নাহার মাহমুদ সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন।[৪০] (পারভিন, ২০১২, পৃষ্ঠা- ১০৫)

ধর্মীয় আদর্শ ও রক্ষণশীলতা

১৯৫৩ সালে মুসলিম বিয়ে ও তালাক সংক্রান্ত বিল নিয়ে বাঙালি মুসলিম নারী সমাজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ দেখা দিয়েছিলো। শামসুন নাহার মাহমুদ বুঝতে পেরেছিলেন এই বিল মুসলিম নারী সমাজের কল্যাণের বিপক্ষে যাবে। তিনি 'নিখিল পাকিস্তান মহিলা সমিতি'র এক সভায় এই বিল নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন এবং এই প্রস্তাবকে অপ্রয়োজনীয় অকার্যকরী বলে অস্বীকার করেছিলেন। যদিও শামসুন নাহার মাহমুদ সারা জীবন ইসলামিক মর্যাদাকে সম্মান করে এসেছেন। চেয়েছেন নারীদের জীবন আচরণ ইসলামি আদর্শে গড়ে উঠুক। তাই কখনো কখনো আমরা দেখতে পাই তিনি ধর্মীয় ঐতিহ্যের সাথে আপস করে আধুনিকতার দিকে ধাবিত হয়েছিলেন। পাশ্চাত্য সমাজের নারী জীবনের কোন বিষয় বাঙালি নারী সমাজের উপর প্রভাব ফেলবে এর পক্ষে তিনি কখনোই ছিলেন না। তিনি ইউরোপ আমেরিকা বিমুখ ছিলেন এ বিষয়টি তখনকার সময়ের জন্য কিছুটা হলেও রক্ষণশীল মনোভাবের পরিচয় তুলে ধরে। তারপরেও তিনি নারী সমাজের জন্য অনেক কল্যাণমূলক কাজ করেছেন যা অবশ্য স্মরণীয়।

বেগম ক্লাব

বেগম ক্লাব এর মাধ্যমে তিনি নারী মুক্তির আদর্শকে প্রচার করতে চেয়েছেন। ক্লাবের সভানেত্রী হিসেবে তিনি সমাজে নারীদের অগ্রগতির জন্য কাজ করার চেষ্টা করেছেন। যদিও বেগম ক্লাব অভিজাত শ্রেণির নারীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল; তবু নারী সমাজের কল্যাণের জন্য তাঁরা কাজ করে গেছেন। ১৯৫৪ সালে ক্লাবের প্রতিষ্ঠা দিনে সভানেত্রী হিসেবে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেছিলেন যেন এই ক্লাবের শিল্প-সাহিত্য ও সমাজের কাজে আগ্রহী সদস্যরা সম্মিলিত হয়ে আলোচনার মাধ্যমে সুস্থ ও সুন্দর পরিবেশ গড়ে তুলতে পারে। এছাড়াও শিক্ষামূলক বিনোদনের মধ্য দিয়ে মহিলাদের অবসর যাপনের ব্যবস্থাও ক্লাবের অন্যতম উদ্দেশ্য। এই ক্লাবের মাধ্যমে আন্তঃদেশীয় লেখকদের সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলার বিষয়েও গুরুত্ব প্রদান করেন তিনি।

১৯৬০ সালে তিনি প্রাদেশিক উপদেষ্টা পরিষদের একমাত্র মহিলা সদস্য নিযুক্ত হন। বিবাহ ও পারিবারিক আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন নিয়ে তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিলেন। এই আইনের প্রয়োগে, সমাজে নারী পুরুষ উভয়ের জীবনে অনাবশ্যক জটিলতা হ্রাস করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ১৯৬১ সালের জুলাই থেকে মুসলিম পরিবার অর্ডিন্যান্স কার্যকরী করা হয়। মুসলমান সমাজের যথেচ্ছ বিবাহ ও তালাক নিয়ন্ত্রণ এই অর্ডিন্যান্সের অন্যতম বিষয়। এই আইনের মাধ্যমে নারীর বিবাহোত্তর জীবনের অনিশ্চয়তা হ্রাস করার সুযোগ হয়েছিলো। পুরুষ সমাজের একদল এই আইন বানচাল করার চেষ্টা করেছিলো। ১৯৬৩ সালে জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে এই বিলের বিপক্ষে জামাতে ইসলামি সমর্থক জনৈক সদস্যর আনা 'মুসলিম পরিবার আইন' ভোটে অগ্রাহ্য হয় এবং 'পরিবার আইন' বিলটি সমর্থন করা হয়। এই বিলটি অনুমোদনের ক্ষেত্রে শামসুন নাহার মাহমুদের ভূমিকা অপরিহার্য ছিল।

৩.৩.৩ সুফিয়া কামাল

আধুনিক যুগের শুরুতে হিন্দু সমাজে নারীদের শিক্ষার দ্বার যেটুকু উন্মোচন করা হয়েছিল বাঙালি মুসলিম নারী সমাজে তা সম্ভব হয়নি। বেগম রোকেয়ার মতো মহৎ প্রাণ এগিয়ে এলেন এই হতভাগ্য নারীদের পাশে। তিনি একা সমাজের এই সব চাপিয়ে দেওয়া নিয়মের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছেন। লড়ে গেছেন আকুতোভয় অবিচল দৃঢ় চিত্ত নিয়ে। নারীর শিক্ষা নিয়ে বেগম রোকেয়া কাজ করে গেছেন আমৃত্যু। নিজে সমাজের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে নারীদের জন্য শিক্ষার যে প্রয়োজনীয়তা তা উচ্চারণ করে গেছেন। নারীর ম্রিয়মাণ হয়ে থাকা সম্ভাবনাময় শক্তিটিকে জাগিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন। জাগাতে চেয়েছেন নারীর চেতনাকে, যে চেতনা নারীকে ধাবিত করবে চার দেয়ালের অন্ধকার থেকে আলোর দিকে, অন্তঃপুরের সীমাবদ্ধ ছাদ থেকে অসীম আকাশের পানে। বেগম রোকেয়ার সেই স্বপ্ন তাঁর অকাল প্রয়াণের মধ্য দিয়ে শেষ হয়ে যায়নি। সেই স্বপ্নকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন বেগম রোকেয়ার অগ্রগণ্য উত্তরসূরী সুফিয়া কামাল। তিনি জীবনের শুরু থেকে নারীর জীবনের অসহায়ত্ব কেমন তা উপলব্ধি করেছিলেন নিজের জীবন দিয়ে। মায়ের অসহায়ত্ব, অল্প বয়সে এক সন্তান নিয়ে বিধবা হওয়ার পর নিজ জীবনের অসহায়ত্ব এ সব কিছুই সুফিয়া কামালকে গড়ে তুলেছিল নতুন এবং ভিন্ন আঙ্গিকের সুফিয়া কামাল করে। নারী মর্যাদা পাবে তাঁর পরিবারে ও সমাজে, অধিকার পাবে রাষ্ট্রে; এর জন্য বার বার অকুণ্ঠিত চিত্তে রাজপথে দাঁড়িয়েছেন মহীয়সী এই প্রাণ। নারী যদি শিক্ষিত হয় তবে তাকে অবহেলিত হয়ে থাকতে হবে না। নিজ বলে স্থান করে

নিতে পারবে সমাজে। একটি বিষয় লক্ষণীয়, সমাজ ও অর্থনীতির উপর নারীর প্রভাব যতদিন ছিল সমাজে নারীর প্রাধান্যও ছিল ততদিন। যখন এ বিষয়গুলো থেকে নারীকে সরিয়ে নেওয়া হলো তখনই নারী অবরুদ্ধ হয়ে পড়লো। শিক্ষার পাশাপাশি নারীকে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করে তুলতে হবে- তা না হলে ক্ষমতা অর্জনের সাথে সাথে ক্ষমতার প্রয়োগের বিষয়টি অপূর্ণ থেকে যাওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়।

সামাজিক কর্মকাণ্ডের সূচনা

সুফিয়া কামাল বেড়ে উঠেছিলেন রক্ষণশীল ও সম্ভ্রান্ত এক নবাব পরিবারে। শিক্ষা লাভের ক্ষেত্রে তিনি পদে পদে বাধা পেয়েছিলেন পরিবার তথা সমাজের অনমনীয় অনুশাসনের কাছ থেকে। নিজের নারী জীবনের উত্থান-পতন দেখেছিলেন তিনি নিবিড়ভাবে। ১৯১৮ সালে মাত্র সাত বছর বয়সে কলকাতায় বেগম রোকেয়ার সাথে প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছিলো তাঁর। সুফিয়া কামালের শিশু মনে সেদিনের প্রভাব সারা জীবন প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর জীবনের প্রতিটি সংগ্রামে।

বেগম রোকেয়ার আদর্শের প্রেরণায় জীবনের শুরু থেকে নারী সমাজের জাগরণ, মুক্তি ও উন্নয়নে মাঠ পর্যায়ে কাজ করেছেন তিনি। তৎকালীন সময়ে যখন নারীদের ঘরের বাইরে আসাটাই দুরূহ ছিল, সে সময় থেকেই সুফিয়া কামাল নিজেকে সামাজিক কর্মকাণ্ডের সাথে যুক্ত করলেন। বঙ্গভঙ্গের ফলে হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে যে বিভেদ সৃষ্টি হয়েছিল, তার প্রভাবমুক্ত হয়ে হিন্দু নারীদের সাথে অসাম্প্রদায়িক মনোভাব লালন করে তিনি কাজ করে গেছেন মানুষের মঙ্গলের জন্য। উপরন্তু মাত্র বার বছর বয়সেই বিয়ে হয়ে যায় তাঁর। তখন সম্ভ্রান্ত রক্ষণশীল মুসলিম পরিবারের পুত্রবধূ হয়ে এ সকল সামাজিক কাজে ঘরের বাইরে যাওয়ার পরিণতি নেতিবাচক হওয়ার আশঙ্কাই বেশি ছিল, সুফিয়া কামালের তা অজানা ছিল না। এ সকল ভয়ের বাধা তাঁকে বিরত রাখতে পারে নি মানুষের পাশে দাঁড়ানোর মতো মানবিক কাজ থেকে। সুফিয়া কামাল নিজে তাঁর সামাজিক কাজের সূচনা সম্পর্কে 'একালে আমাদের কাল' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

> বরিশালে ফিরে এলাম। তখন লেখাও চলল আর শুরু হলো সেই সময়েই সামান্য করে সমাজ সেবার কাজ। সুকুমার দত্তের স্ত্রী বি-এ পাশ করে বরিশাল এলেন- মাতৃমঙ্গল, শিশুসদন, সমিতি করলেন। বরিশাল বালিকা বিদ্যালয়ের মধ্যে সভা হত, বোরখা পরে বদ্ধ ঘোড়ার গাড়ী করে সাবিত্রী দিদির সাথে যেতাম। কী হাস্যকর সে যাত্রা। তবুও কী অসীম তৃপ্তি লাভ করতাম অসহায়া, অশিক্ষিতা মায়েদের শিশুদের সাথে। আরও হিন্দু মহিলারা ছিলেন। আমার তখনও কৈশোর কাটেনি।[৪১] (কামাল,(সম্পা), ২০০২, পৃষ্ঠা- ৫৮০)

সুফিয়া কামাল তাঁর প্রথম জীবনে ১৯২৫ সালে বরিশালে সাবিত্রী দেবীর সাথে শিশুসদন ও মাতৃমঙ্গল সমিতিতে কাজ করতেন। শিশুদের স্বাস্থ্য ও বেড়ে ওঠা সম্পর্কে মায়েদের সচেতন করা এবং মায়েদের নিজের স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন করা তাদের কাজ ছিল। সবাইকে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা দেওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না কিন্তু মানুষের মধ্যে যতটুকু পেরেছেন সচেতনতা সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছেন। তবুও যদি তাদের অবস্থার পরিবর্তন ঘটে এতেই অনেক কিছু।

পরে বরিশাল থেকে কলকাতায় গিয়ে ১৯২৭ সাল থেকে ১৯৩২ সাল পর্যন্ত তিনি একনিষ্ঠভাবে কাজ করেছেন বেগম রোকেয়ার হাতে গড়া সংগঠন 'আঞ্জুমানে খাওয়াতীন ইসলাম'। সে সময়ে তিনি বেগম রোকেয়ার ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য লাভের সুযোগ পান। সমাজের আরোপিত বিধি নিষেধ উপেক্ষা করে বস্তিতে বসবাসকারী নারীদের উন্নয়নের জন্য কাজ করে যান নিরলসভাবে। সে সময় যে নারীরা বস্তিতে বসবাস করতো তাদের জীবন ছিল আরও দুর্বিষহ। বস্তিতে ঘুরেঘুরে এই পিছিয়ে

থাকা মানবেতর জীবনযাপনকারী নারীদের স্বাবলম্বী, সাক্ষর ও স্বাস্থ্যবিষয়ে সচেতন হওয়ার জন্য শিক্ষা দিয়েছেন, কাজ করেছেন। সুফিয়া কামাল তাঁর এক সাক্ষাৎকারে কলকাতার বস্তির তৎকালীন নারীদের অবস্থা সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন,

> কলকাতার বস্তিতে বস্তিতে আমরা কাজ করেছি। কী রকম অসহায় ! ওরা জানে না তার স্বামী কী এনে দেবে- কী খাবে, সে কথা- তার বাচ্চা আছে। ঘরের মধ্যেই আবদ্ধ। তারপর ঘরের বাইরে যে একটা দুনিয়া আছে, তা জানে না।[৪২] (চৌধুরী, ২০১০, পৃষ্ঠা ৬৩)

এরপর সুফিয়া কামাল ১৯৪৬ সালে দাঙ্গা নিপীড়িত অসহায় শিশুদের জন্য 'রোকেয়া মেমোরিয়াল স্কুল' স্থাপনের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। এই শিশুগুলো যাতে অসহায়ভাবে সমাজ থেকে হারিয়ে না যায়, সুন্দর এক জীবনের সন্ধান পায় সে জন্য এই স্কুল স্থাপন করেছিলেন। সুফিয়া কামাল দুরদর্শী ছিলেন বলেই নিপীড়িত শিশুদের শিক্ষার আলো দিয়ে সাহায্য করেছিলেন। আর্থিক সাহায্য সাময়িক কাজে লাগলেও, শিক্ষার আলো সারাজীবন কাজে লাগবে। এই ভাবনা থেকেই তিনি স্কুল তৈরি করলেন।

দেশ ভাগের আর্ত মানুষের পাশে দাঁড়ানো

সমাজের সব শৃঙ্খল ভেঙ্গে এই অসহায় নারীদের পাশে জীবনের শুরু থেকে দাঁড়িয়েছিলেন সুফিয়া কামাল। দেশ ভাগের পর কলকাতা থেকে ঢাকায় চলে আসেন মাতৃভূমির টানে। সুফিয়া কামাল ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর মাতৃভূমির টানে ঢাকায় চলে আসেন। কিন্তু তাঁর সামাজিক কর্মকাণ্ড থেমে থাকেনি। যেখানেই অবস্থান করেছেন সে অবস্থায় তিনি তাঁর কাজ চালিয়ে গেছেন। কাজ থেকে তাঁকে বিচ্যুত করতে পারেনি পরিবার, সমাজ ও দেশের কোন বাধা। এখানে এসে লীলা নাগের দাঙ্গা নিরসনে 'শান্তি কমিটি'তে সম্মিলিতভাবে কাজ করেছেন তিনি। সবার মাঝে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি থাকবে এমন একটি সুন্দর স্বাধীন দেশের স্বপ্ন দেখেছিলেন তিনি। দেশ বিভাগের সময় একটা ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে মানুষের জীবন যাত্রায়। নারীরা সে সময় নানাবিধ নিগ্রহের শিকার হয়। অর্থনৈতিক দিক দিয়ে মানুষ তখন চরমভাবে বিপর্যস্ত। দুদেশের মানুষ তাদের ঘর-বাড়ি ফেলে উদ্ভ্রান্তের মত জীবন-যাপন করছিল। শিক্ষা ক্ষেত্রেও তৈরি হয় শূন্যতার। সুন্দর সমাজ গড়ার ক্ষেত্রে সুফিয়া কামালও এ দেশের প্রগতিশীল মানুষদের সাথে কাজ করেন নারী ও শিশুদের জন্য। সুফিয়া কামালের ঘনিষ্ঠ সহকর্মী ও নারী আন্দোলনের কর্মী মালেকা বেগম তার বইয়ে উল্লেখ করেছেন, 'সুফিয়া কামাল সে ডাকে প্রাণপণে সাড়া দিয়েছিলেন। গভীরভাবে দৃষ্টি দিয়েছিলেন তিনি শিশুদের দিকে। চারাগাছ যত্ন না পেলে মহিরুহ হবে কিভাবে? দাঁড়িয়েছেন তিনি নারীদের পাশে।[৪৩] (বেগম, ২০১৪, পৃষ্ঠা- ৩৭) সুফিয়া কামাল ১৯৪৮ সালে পূর্ব-পাকিস্তানের বিভিন্ন জেলার প্রগতিশীল নারীদের নিয়ে গঠন করেন 'পূর্ব-পাকিস্তান মহিলা সমিতি'। তিনি এর সভানেত্রী হিসেবে নির্বাচিত হন। লীলা নাগ, যুঁইফুল রায়, নিবেদিতা রায় প্রমুখ ব্যক্তিদের নিয়ে সমাজের উন্নয়নের কাজে এগিয়ে যান সুফিয়া কামাল। তাঁর নারীদের নিয়ে কাজ করার অন্তরালে ছিল মানবতার বাণী, তাঁর প্রত্যেকটি পদক্ষেপ ছিল মানুষকে কেন্দ্র করে।

নারীর শিক্ষা ও ক্ষমতায়ন নিয়ে কাজ ও আন্দোলন

সুফিয়া কামাল নারী শিক্ষা ও ক্ষমতায়ন নিয়ে মাঠ পর্যায়ে কাজ করেছেন। সাথে সাথে সমাজের উঁচু স্তরের মানুষের কাছেও সমাজের অসঙ্গতি তুলে ধরতে চেয়েছেন। 'বেগম' পত্রিকার সম্পাদকের ভূমিকায় থাকা অবস্থায় তিনি চেয়েছিলেন নারী সমাজের প্রকৃত চিত্র নারীদের লেখনীর মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হোক। নারী মনের উপলব্ধি, অভিজ্ঞতা উঠে আসুক সমাজের সামনে, দেশের সামনে। নারীদের মত প্রকাশ এবং নিজের কথা মন খুলে প্রকাশ করার একটি নির্ভরশীল মাধ্যম হয়ে উঠেছিলো 'বেগম'। শিক্ষার পাশাপাশি নারীরা সাহিত্য চর্চার সাথে যুক্ত হয়ে নিজের চেতনাকে উন্মুক্ত করে দিতে কুণ্ঠা বোধ না করে এবং লেখনীর মাধ্যমে সমাজের চিত্র তুলে ধরতে পারে নির্ভয় চিত্তে।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পূর্ব থেকেই নারীসমাজের অধিকার আদায়ে আন্দোলন করে গেছেন সুফিয়া কামাল। আজীবন নারী জাগরণ ও আন্দোলনের সাথে যুক্ত থেকেছেন। 'নারী আন্দোলন নারীর অবস্থা পরিবর্তনের আন্দোলন। অর্ধেক মানুষ থেকে পূর্ণ মানুষ হয়ে ওঠার আন্দোলন। নারী-পুরুষ সমতা প্রতিষ্ঠার আন্দোলন।'[৪৪] (বানু, ২০১২ এপ্রিল-জুন, পৃষ্ঠা- ১০)

'নারী অধিকার আন্দোলন বিষয়ক গবেষক এবং লেখক পেগি অ্যানথ্রোবাস- এর মতে নারী আন্দোলন বলতে বোঝায়:

১। নারী আন্দোলন হলো একটি রাজনৈতিক আন্দোলন: বৃহত্তর পরিসরে ব্যাপ্ত ও যুক্ত। সমাজের প্রগতিশীল পরিবর্তন ও উন্নয়নমুখী ধারা অগ্রসরের প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত একটি গতিশীল ধারা।

২। নারী আন্দোলনের অর্থ হলো নারীর সামাজিক অবস্থান নির্ণয়ের এবং নারীর সামাজিক সম্পর্ক নির্ণয়ের প্রক্রিয়ায় নিহিত। নারীর শ্রেণি, গোত্র, ধর্ম, বর্ণ, বয়স কিভাবে তার সামাজিক অবস্থান তৈরি করছে তা চিহ্নিত করার প্রক্রিয়া।

৩। নারী আন্দোলন হলো অবিরাম চলমান ঐতিহাসিক একটি ধারা যা কখনো নমনীয়, কখনো কখনো সংস্কারমূলক, কখনো বিপ্লবাত্মক ভঙ্গিতে কাজ করে, এগিয়ে চলে। সামাজিক বিকাশের মতোই এই ধারা। নারী আন্দোলনও একটি দেশ ও সমাজের ধারাবাহিক বিকাশের মতোই এগিয়ে চলে।

৪। পুরুষতন্ত্র সম্পর্কে সচেতন হওয়া আর একই সাথে নারীর অধিকার-বিরোধী সেই সংস্কৃতিকে অঙ্গীকার করে এগিয়ে চলা এবং সেই সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের চেষ্টা করা— এর নামই নারী আন্দোলন।

৫। নারীর নিজের বিচ্ছিন্ন অবস্থান, বিযুক্ত অবস্থান সম্পর্কে সচেতন হওয়া।'[৪৫] (খানম, ২০১৪ এপ্রিল-জুন, পৃষ্ঠা ৭)

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর নারীর অধিকার আন্দোলন নিয়ে সুফিয়া কামালের কাজ আরও সংগঠিত হয়েছে। তাঁর ঘনিষ্ঠ সহকর্মী মালেকা বেগম এ প্রসঙ্গে তাঁর এক গ্রন্থে উল্লেখ করেন,

> নারীর স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা, মানবাধিকার আদায়, সব ধরনের নারী নির্যাতন বন্ধ করা, আইনের নিশ্চয়তা বিধানের জন্য লড়াই করা, সেই আইন বাস্তবায়নের জন্য প্রশাসনের সঙ্গে, সরকারের সঙ্গে নিরলস যুদ্ধ করা- এ সবই সুফিয়া কামালকে করতে হয়েছে।[৪৬] (বেগম, ২০১৪, পৃষ্ঠা ৫৪)

নারী ও তার ক্ষমতায়নে উদ্যোগ

বাংলাদেশের নারী ও শিশুর অবস্থান বাংলাদেশে তথা বিশ্ব দরবারে যেন মর্যাদাপূর্ণ হয় সুফিয়া কামাল সে চেষ্টায় ব্যাপৃত থেকেছেন সারা জীবন। এদেশের নারী ও শিশু সমাজের পরিপূর্ণ অংশ হয়ে উঠবে, মর্যাদা অর্জন করে নিতে পারবে এ স্বপ্ন ছিল তাঁর চোখে। দেশের মোট জনসংখ্যার অর্ধেকেরও বেশি নারী। পারিবারিক, রাজনৈতিক, প্রশাসনিক, প্রাতিষ্ঠানিক, রাষ্ট্রীয় সকল ক্ষেত্রে সকল পর্যায়ে নারীর অংশগ্রহণ থাকতে হবে। রাষ্ট্রের সার্বিক উন্নয়নের জন্য নারীর অংশগ্রহণ ও সমঅংশীদারিত্ব একান্তভাবে অপরিহার্য। এ ক্ষেত্রে একটি বিষয় মুখ্যভাবেই চলে আসে- তা হচ্ছে নারীর আর্থিক স্বাধীনতা। নারীকে তার উত্তরাধিকার সূত্রের সম্পত্তি ও তার স্ব-উপার্জিত সম্পত্তিতে অধিকার না দেওয়া হলে নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে বাধা দেখা দিতে পারে। এটি যেমন পরিবারের ক্ষেত্রে সত্য, তেমনি সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবেও সত্য। সুফিয়া কামাল নারীসমাজের অধিকারের জন্য লড়ে গেছেন সমাজ ও রাষ্ট্রের সাথে। ১৯৪৮ সালে সুফিয়া কামালের নেতৃত্বে গঠিত 'পূর্ব পাকিস্তান মহিলা পরিষদ' যা ৭১' পরবর্তী সময়ে 'বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ' নামে গত ৪ দশকের বেশি সময় ধরে নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে আন্দোলন করে চলেছে। নারীর এই আন্দোলনের মূল ভিত্তি শিক্ষা। শিক্ষা পারে নারীর এই অবস্থা থেকে উত্তরণ ঘটাতে। এছাড়া ১৯৫৪ সালে তিনি 'ওয়ারী মহিলা সমিতি' প্রতিষ্ঠা করেন। উপেক্ষিত অবহেলিত নারী সমাজের মুক্তির জন্য তিনি কাজ করে গেছেন সারা জীবন।

নারী নির্যাতন ও মানবাধিকার

ভারত উপমাহাদেশে নারীকে যদি প্রাচীন কাল থেকে দেখি তবে দেখব প্রাচীন কালে মাতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা ছিল। যেখানে সমাজ ও অর্থনৈতিক জীবনে নারীর প্রাধান্য বিদ্যমান ছিল। খ্রিস্টপূর্ব ২০০০ সাল থেকে মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা লুপ্ত হওয়ার সাথে সাথে সমাজে নারীর প্রাধান্য ক্ষুণ্ণ হয়। পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় নারী তার অধিকার এবং মর্যাদা হারায়, তার স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হয়, নারীকে শৃঙ্খলিত করে পুরুষ তার অধীনস্ত করে, নানাভাবে বৈষম্য ও নির্যাতনের শিকার হয় নারী। তার মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয়। ক্রমশ সমাজে নারীর অধস্তন অবস্থান নির্ণিত হয়। আর তা নির্ণয় করা হয় ধর্মীয় বিধান, সামাজিক অনুশাসন, বৈষম্যমূলক ও নিপীড়নমূলক আইন দ্বারা। মধ্যযুগেও অবরোধ প্রথার নামে নারীকে সকল সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন রাখা হয়; যেখানে পুরুষদের একচেটিয়া কর্তৃত্ব বহাল থাকে। শিক্ষা-দীক্ষায়, জ্ঞান-বিজ্ঞানে, মননে, নেতৃত্বে, যুক্তি-তর্কে সৃজনশীলতায়, শৌর্যে-বীর্যে পুরুষ নারীকে পিছনে ফেলে অনেক অগ্রসর হয়ে যায়। মানুষ হিসেবে নারীর স্বাভাবিক বিকাশের পথ রুদ্ধ বা সীমিত হয়ে যায়।

শিশু শিক্ষা

সুফিয়া কামাল শুধু নারীর শিক্ষা সচেতনতা নিয়ে সীমাবদ্ধ ছিলেন না। তিনি উপলব্ধি করতেন শিশুরাই দেশের ভবিষ্যৎ, এ দেশ ও জাতির কর্ণধার। তারা যদি প্রকৃত শিক্ষা ও সংস্কৃতির আলো থেকে বঞ্চিত থাকে তবে ধীরে ধীরে দেশ নিমজ্জিত হবে

অন্ধকারে। ১৯৫৬ সালে শিশুদের জন্য তিনি আয়োজন করেন 'কচি-কাঁচার মেলা'র। তাঁর নিজ বাড়ির আঙ্গিনায় বসে শিশুদের 'কচিকাঁচার মেলা'। 'অধ্যাপক অজিত গুহ, এম. এ. ওয়াদুদ, দাদাভাই রোকনুজ্জামান খান, বিজ্ঞানী আব্দুল্লাহ আল মুতী, শামসুজ্জামান খান প্রমুখ শিশুদরদীর আগ্রহে সুফিয়া কামালের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হলো কচি-কাঁচার মেলা, কবির তারাবাগের বাসভবনে।[৪৭] (বেগম, ১৯৯৭, পৃষ্ঠা ৩৭) আজ কচি-কাঁচার মেলা তারাবাগের আঙ্গিনা অতিক্রম করে নিজবলে অর্জন করে নিয়েছে বাংলার বুকে বিশাল আঙ্গিনা। 'কচি-কাঁচার মেলা' ও সুফিয়া কামাল যেন এক অভিন্ন সত্তা। এ সম্পর্কে সুফিয়া কামালের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য : "আমি বহুদিক দিয়ে বহুজনের দানে ধন্য, কিন্তু কচি-কাঁচার মেলা আমার গৌরবের।"[৪৮] (হক, ২০১৩, পৃষ্ঠা ৬৩)

ছায়ানট প্রতিষ্ঠা ও সংস্কৃতি চর্চা

শিক্ষা অধিকারের পাশাপাশি সাহিত্য-ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে নারীর পদচারণা নিশ্চিত করতে ১৯৬১ সালে রবীন্দ্র জন্ম শতবর্ষে ছায়ানট প্রতিষ্ঠা করেন। বাঙালি সংস্কৃতির চর্চাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য সুফিয়া কামাল এবং আরও উৎসাহী কয়েকজন মিলে প্রতিষ্ঠা করেন ছায়ানট সঙ্গীত বিদ্যায়তন। 'রবীন্দ্র জন্ম শতবার্ষিকী উদযাপনের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীর নিষেধাজ্ঞার প্রতিবাদে আন্দোলন করার সময় রবীন্দ্র-নজরুল-পল্লীগীতির গায়কের অভাব উপলব্ধি হলো। রবীন্দ্রচর্চার লক্ষ্যে কবি সুফিয়া কামালকে সভানেত্রী, ফরিদা হাসানকে সাধারণ সম্পাদক ও মোখলেসুর রহমান সিধুভাইকে কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত করে ছায়ানট সঙ্গীত বিদ্যায়তন প্রতিষ্ঠিত হলো।[৪৯] (বেগম(সম্পা), ১৯৯৭, পৃষ্ঠা- ৪০) নিজের সংস্কৃতির চর্চা ও সেটি ভালোভাবে জানা প্রতিটি নাগরিকের কর্তব্য। 'ছায়ানট বাঙালি সংস্কৃতির স্বরূপ চেতনার আন্দোলনকে প্রাণিত করেছে এবং বাঙালিকে শেকড়ের আত্মানুসন্ধানী করেছে। এই অঞ্চলের বাঙালি সমাজের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষা ও বাঙালির সংস্কৃতি-চর্চাকে একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পরিচালিত করবার উদ্দেশ্য নিয়ে গঠিত ছায়ানট এ দেশের সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে বহুমাত্রিকতা দান করেছিল। বাঙালি হওয়ার সাধনা, রবীন্দ্রচর্চা ও বাঙালির সকল মানবিক গুণাবলিসমৃদ্ধ সৃজন এদেশের সাংস্কৃতিক মনোভূমির অবিচ্ছেদ্য অংশ- এই শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে গড়ে উঠেছিল ছায়ানট।[৫০] (হক, ২০১৩, পৃষ্ঠা ৫৯ ও ৬০) আর সুফিয়া কামাল ছিলেন এই ছায়ানটের প্রাতিষ্ঠানিক পদযাত্রায় একজন শুভাকাঙ্ক্ষী, উদ্যোগী, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য রক্ষায় অঙ্গীকারবদ্ধ অন্যতম পাথেয়।

মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ

শুধু নিপীড়িত-নির্যাতিত নারীদের পাশে তিনি ছিলেন তা নয়, দেশের প্রতিটি সংকটের সময় সচেতন ও অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন, ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে তাঁর ছিল অসামান্য অবদান। বাহান্নর ভাষা তথা বাক-স্বাধীনতার আন্দোলনেও রাজপথে তাঁকে দেখা যায় সামনের সারিতে। 'একুশের গুলিবর্ষণের প্রতিবাদে তাৎক্ষণিক মিছিলে দেখা গেল সুফিয়া কামালকে রাজপথের সামনের কাতারে। ঢাকার মানুষ যে কতকাল কতভাবে তাকে দেখেছে এ প্রতিবাদিকার ভূমিকায় তাঁর বুঝি কোনো লেখাজোখা নেই।[৫১] (হক, ২০০০,

পৃষ্ঠা ৪৪) নারীদের নিয়ে অন্যায়ের বিরুদ্ধে সুকঠোর অবস্থান নিয়ে রাজপথে নেমেছেন। রাষ্ট্রের ক্ষমতাসীনদের রক্তচক্ষু কখনোই তাঁকে দমাতে পারেনি। মহান মুক্তিযুদ্ধে তাঁর অবস্থান ছিল অনস্বীকার্য। ১৯৭০ সালে বাংলাদেশে প্রথম সাধারণ নির্বাচনের পর গণরায় বানচালের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে নারীসমাজের মিছিলের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন সুফিয়া কামাল।

> এখন আমি এ দেশ ছেড়ে বেহেশতেও যেতে রাজি নই। আমার দেশের মানুষেরা শান্তি পাক, সোয়াস্তি লাভ করুক- এ দেখে যেন আমি এ মাটিতেই শুয়ে থাকতে পারি।[৫২] (জাহাঙ্গীর, ১৯৯৯, পৃষ্ঠা ৭৪)

যুদ্ধাপরাধীদের বিচার দাবিতে শহীদ জননী জাহানারা ইমামের পাশে ছিলেন তিনি। একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল জাতীয় সমন্বয় কমিটিতে সুফিয়া কামাল নেতৃত্ব দিয়েছেন। তিনি অন্যায়ের সাথে আপস করেন নি কখনো। অকুতোভয় ব্যক্তিত্ব নিয়ে লড়ে গেছেন আজীবন। সুফিয়া কামালের ঘনিষ্ঠ সহযোদ্ধা মালেকা বেগম তাঁর 'রাজপথে জনপথে সুফিয়া কামাল' গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন-

> জাতীয় সমন্বয় কমিটির বিশাল সমাবেশে সভানেত্রী সুফিয়া কামাল বলেন, 'কোন আইনে শহীদ মুক্তিযোদ্ধা জননী জাহানারা ইমামসহ মুক্তিযোদ্ধা জনতার গায়ে পুলিশ হাত তুলেছে, বাংলাদেশের জনগণের সেটা জিজ্ঞাসা। আন্দোলনের মাধ্যমে জনগণকে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার আহ্বান জানান। ঘাতক গোলাম আজমসহ যুদ্ধাপরাধীদের বিচার চাওয়ার জন্য জাহানারা ইমামের উপর পুলিশ হামলা ও নির্যাতন চালিয়েছে। আপনারা জনতার আদালতে এর বিচার করুন। কারণ এর আগেও ঘাতকরা মা-বোনদের গায়ে হাত তুলেছে। বিচার হায়নি।[৫৩] (বেগম (সম্পা.), ১৯৯৭, পৃষ্ঠা- ৪৭)

সুফিয়া কামাল আমরণ মানুষের সাথে থেকেছেন, মানুষের পাশে থেকেছেন। তাঁর কণ্ঠে আজীবন এই কথাই ছিল- "মানবমুক্তি না হওয়া পর্যন্ত নারীমুক্তি হবে না, নারীমুক্তি না হলে মানবমুক্তি হবে না।"[৫৪] (বেগম, ১৯৮৯, পৃষ্ঠা ১৭৮)

সুফিয়া কামাল তাঁর জীবনবোধ থেকে উপলব্ধি করেছেন নারীর জীবনে এগিয়ে যাওয়ার জন্য শিক্ষা কতটা জরুরি। নারীর নির্জীব অবস্থা তথা সব ধরনের অধস্তনতা থেকে মুক্তি পেতে, তার উপর অত্যাচার, নিপীড়ন সব বন্ধ করতে হলে নারীকেই তার আপন শক্তিতে জাগ্রত হতে হবে। নিজের অধিকার বুঝে নেয়ার চেতনাকে জাগ্রত করার জন্যই সুফিয়া কামাল সারাটি জীবন কাজ করে গেছেন। 'নারীশিক্ষার বিকাশের জন্য যা সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন তা হচ্ছে উদার ও উন্নত দৃষ্টিভঙ্গি। যে সমাজে মানুষ যত শিক্ষিত হয়েছে সে সমাজের মানুষ তত অধিকার সচেতন, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ বিকাশে তৎপর এবং মানবিক গুণাবলীতে বিকশিত হয়ে উঠেছে।'[৫৫] (আকবর এবং অন্যান্য, ১৯৯৮) সুফিয়া কামাল নারী শিক্ষা নিয়ে প্রগতিশীল চিন্তা-চেতনায় বিশ্বাসী ছিলেন। তা তিনি লালন করেছেন আজীবন। নিজ জীবনে ও কর্মে প্রতিফলন ঘটিয়েছেন সে চিন্তার।

তথ্য নির্দেশ

১. আকবর, শ্যামলী এবং অন্যান্য (১৯৯৮), *নারীশিক্ষা উদ্ভব ও বিকাশ,* ঢাকা: স্টুডেন্ট ওয়েজ।

২. বেগম, মালেকা (১৯৮৯), *বাংলার নারী আন্দোলন,* ঢাকা: দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লি:।

৩. বানু, মালেকা (২০১২ এপ্রিল-জুন), *উপমহাদেশের নারী আন্দোলন ও বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, মহিলা সমাচার,* ঢাকা: মহিলা পরিষদ।

৪. প্রাগুক্ত।

৫. বেগম, মালেকা (১৯৮৯), পূর্বোক্ত।

৬. দাশপুরকায়স্থ, ড. নিবেদিতা (১৯৯৯), *মুক্তি মঞ্চে নারী,* ঢাকা: প্রিপ ট্রাস্ট।

৭. প্রাগুক্ত।

৮. প্রাগুক্ত।

৯. হোসেন, সেলিনা ও মাসুদুজ্জামান (২০০৩), *নারীর ক্ষমতায়ন: রাজনীতি ও আন্দোলন,* ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স।

১০. দাশপুরকায়স্থ, ড. নিবেদিতা (১৯৯৯), পূর্বোক্ত।

১১. খানম, আয়শা (২০১৪ এপ্রিল-জুন), *নারীর মানবাধিকার ও ক্ষমতায়নের পথে সংগ্রামের চুয়াল্লিশ বছর, মহিলা সমাচার,* ঢাকা: বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ।

১২. আনিসুজ্জামান (সম্পা) (২০০৩), *লীলা নাগ শতবর্ষের শ্রদ্ধাঞ্জলি,* ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ।

১৩. মোহান্ত, দীপংকর (১৯৯৯), *লীলা নাগ,* ঢাকা: বাংলা একাডেমী।

১৪. প্রাগুক্ত।

১৫. প্রাগুক্ত।

১৬. পারভিন, শাহিদা (২০১২), *শামসুন নাহার মাহমুদ ও সমকালীন নারীসমাজের অগ্রগতি,* ঢাকা: বাংলা একাডেমী।

১৭. প্রাগুক্ত।

১৮. হক, মফিদুল (২০১০, এপ্রিল-জুন), *উপমহাদেশের নারী আন্দোলন ও সুফিয়া কামাল, মহিলা সমাচার,* ঢাকা: বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ।

১৯. কামাল, সাজেদ (সম্পা) (২০০২), *সুফিয়া কামাল রচনাসংগ্রহ প্রথম খণ্ড,* ঢাকা: বাংলা একাডেমী।

২০. বেগম, মালেকা (সম্পা) (১৯৯৭), *রাজপথে জনপথে সুফিয়া কামাল,* ঢাকা: আগামী প্রকাশনী।

২১. প্রাগুক্ত।

২২. প্রাগুক্ত।

২৩. হাসান, মোরশেদ শফিউল (২০১২,এপ্রিল-জুন), *আলোকিত সমাজ গড়ার আন্দোলন এবং সুফিয়া কামাল, মহিলা সমাচার,* ঢাকা: বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ।

২৪. হক, নাসিমা (২০১৩), *শতাব্দীর সাহসিকা সুফিয়া কামাল,* ঢাকা: ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ।

২৫. প্রাগুক্ত।

২৬. জাহাঙ্গীর, সেলিম (১৯৯৯), *সুফিয়া কামাল,* ঢাকা: বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী।

২৭. হক, নাসিমা (২০১৩), পূর্বোক্ত।

২৮. প্রাগুক্ত।

২৯. বেগম, মালেকা (সম্পা.) (১৯৯৭), পূর্বোক্ত।

৩০. প্রাগুক্ত।

৩১. কামাল, সাজেদ (সম্পা.), (২০০২), পূর্বোক্ত।

৩২. হোসেন, সেলিনা এবং অন্যান্য (সম্পা.) (১৯৯৮), *সংগ্রামী নারী যুগে যুগে, প্রথম খণ্ড,* ঢাকা: বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ।

৩৩. মোহান্ত, দীপংকর (১৯৯৯), পূর্বোক্ত।

৩৪. প্রাগুক্ত।

৩৫. মোহান্ত, দীপংকর (১৯৯৯), *লীলা রায় ও বাংলার নারী জাগরণ,* ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ।

৩৬. বসু, অঞ্জলি (সম্পা.) (১৯৭৬), *সংসদ বাঙালি চরিতাভিধান,* কলকাতা: শিশু সংসদ প্রা. লি.।

৩৭. মোহান্ত, দীপংকর (১৯৯৯), পূর্বোক্ত।

৩৮. পারভিন, শাহিদা (২০১২), পূর্বোক্ত।

৩৯. দাশপুরকায়স্থ, ড. নিবেদিতা (১৯৯৯), পূর্বোক্ত।

৪০. পারভিন, শাহিদা (২০১২), পূর্বোক্ত।

৪১. কামাল, সাজেদ (সম্পা.) (২০০২), পূর্বোক্ত।

৪২. চৌধুরী, আবুল আহসান (২০১০), *সুফিয়া কামাল অন্তরঙ্গ আত্মভাষ্য,* ঢাকা: প্রথমা প্রকাশনা।

৪৩. বেগম, মালেকা (২০১৪), *সুফিয়া কামাল,* ঢাকা: প্রথমা প্রকাশন।

৪৪. বানু, মালেকা (২০১২ এপ্রিল-জুন), পূর্বোক্ত।

৪৫. খানম, আয়শা (২০১৪ এপ্রিল-জুন), *নারীর মানবাধিকার ও ক্ষমতায়নের পথে সংগ্রামের চুয়াল্লিশ বছর, মহিলা সমাচার,* ঢাকা: বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ।

৪৬. বেগম, মালেকা (২০১৪), পূর্বোক্ত।

৪৭. বেগম, মালেকা (সম্পা.) (১৯৯৭), পূর্বোক্ত।

৪৮. হক, নাসিমা (২০১৩), পূর্বোক্ত।

৪৯. বেগম, মালেকা (সম্পা.) (১৯৯৭), পূর্বোক্ত।

৫০. হক, নাসিমা (২০১৩), পূর্বোক্ত।

৫১. হক, সৈয়দ শামসুল (সম্পা.) (২০০০), *জননী সাহসিকা বেগম সুফিয়া কামাল শেষ প্রণতি,* ঢাকা: অন্যপ্রকাশ।

৫২. জাহাঙ্গীর, সেলিম (১৯৯৯), পূর্বোক্ত।

৫৩. বেগম, মালেকা (সম্পা.) (১৯৯৭), পূর্বোক্ত।

৫৪. বেগম, মালেকা (১৯৮৯), পূর্বোক্ত।

৫৫. আকবর এবং অন্যান্য (১৯৯৮), পূর্বোক্ত।

চতুর্থ অধ্যায়

নারীর শিক্ষা ভাবনা ও নারীর ক্ষমতায়ন বিষয়ে চিন্তা, কর্ম ও উদ্যোগ: বর্তমান সমাজের প্রেক্ষাপটে প্রাসঙ্গিকতা

লীলা নাগ, শামসুন নাহার মাহমুদ এবং সুফিয়া কামালের মনন-কর্ম-উদ্যোগের ক্রিয়া-কেন্দ্র ছিল পশ্চাদপদ নারী সমাজ। কিন্তু তা বলে তাঁরা শুধু নারী সমাজের গণ্ডিতেই আবদ্ধ ছিলেন না। তাঁরা কাজ করেছেন মানব সমাজের জন্য, সে কাজ নারী-পুরুষ উভয়ের জন্যই সমান গুরুত্বপূর্ণ ও মাহাত্ম্যপূর্ণ। সমাজের সুবিন্যাস্ত উন্নয়নের লক্ষ্যে একপেশে পুরুষতান্ত্রিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে তাঁরা নারীর অধিকার নিয়ে সমাজকে জাগিয়ে তোলার কাজ করেছেন। সমাজকে নারীর অধিকার সম্পর্কে সচেতন করতে চেয়েছিলেন। এই গবেষণায় নারীর শিক্ষা ও ক্ষমতায়ন নিয়ে আলোকপাত করা হচ্ছে কিন্তু প্রাসঙ্গিকভাবেই নারীর মানবাধিকারের বিষয়টি চলে আসে। জাতীয় ও বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে নারী আন্দোলনের দীর্ঘ পথপরিক্রমা নারীদের সামনে এক সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করেছে। সম্ভাবনার সাথে নারীর জন্য পদে পদে রয়েছে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ। সে চ্যালেঞ্জ নারীর অগ্রসরমানতাকে পিছনে টেনে ধরছে। বর্তমান পরিবর্তিত বৈশ্বিক এবং জাতীয় বাস্তবতায় সার্বজনীন মানবাধিকার বিপন্ন; সন্ত্রাস, মৌলবাদ, জঙ্গিবাদ, রক্ষণশীলতা, সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে প্রাধান্য বিস্তার করে চলেছে। ফলে নারীর মানবাধিকার নানাভাবে বিপন্ন হচ্ছে এবং নারীর প্রতি সহিংসতার মাত্রা ও ভয়াবহতা বেড়েই চলছে। নারীর প্রতি অন্যায়-অত্যাচার এবং সহিংস অবস্থা রোধে ইতিবাচক পরিবর্তনের জন্য নারীদের সাংগঠনিকভাবে এগিয়ে আসতে হবে। নারীদের এই অবস্থার পরিবর্তনে লক্ষ্যে বিভিন্ন নারী সংগঠন, মানবাধিকার সংগঠন ও সামাজিক সংগঠন কাজ করে যাচ্ছে। কিন্তু সমাজে পুরুষের পাশাপাশি নারীর সমমর্যাদা ও অধিকার নিয়ে অগ্রসর হতে চাইলেও বৈষম্যমূলক আইন, সামাজিক প্রথা, কুসংস্কার, অন্ধ বিশ্বাস ইত্যাদি বিষয়ের কারণে তা বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। এই বাধাকে সরানোর জন্য এবং বৈষম্যহীন নিরাপদ জীবনের জন্য আজও লীলা নাগ, শামসুন নাহার মাহমুদ এবং সুফিয়া কামালের চিন্তা, কর্ম, উদ্যোগ বর্তমানেও প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে।

নারীর মানবাধিকার নিয়ে কথা বলার শুরুতে প্রাসঙ্গিকভাবে মানবাধিকার সম্পর্কে কিছু কথা বলা প্রয়োজন। '১৭৭৬ সালে ঐতিহাসিকভাবে মানবাধিকারের ধারণাটির আনুষ্ঠানিক পরিচয় ঘটে আমেরিকার স্বাধীনতার ঘোষণার মধ্য দিয়ে। আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষণায় বলা হয়েছে অবিভাজ্য অধিকার (Inalienable Right) সম্পর্কে। এর কয়েক বছর পরে ১৭৮৯ সালে ফরাসি বিপ্লবের ঘোষণায়ও ধ্বনিত হয় মানব জাতির অধিকারের (Rights of Man) কথা। মানুষের অধিকার বিষয়টি আরও বৃহৎ পরিসরে সামনে আনা হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ আলোড়নের পর জাতিসংঘের ঘোষণার মধ্য দিয়ে। আমেরিকার স্বাধীনতা ও ফরাসি বিপ্লবের মানবাধিকার চেতনাকে সামনে রেখে ১৯৪৮ সালে জাতিসংঘ মানবাধিকারের সার্বজনীন (UDHR- Universal Declaration of Human Rights 1948) ঘোষণা গৃহীত হয়।[১] (খানম, ২০১৫, পৃষ্ঠা- ২১)

এই ঐতিহাসিক ঘোষণার প্রেক্ষিতে বিদগ্ধজনেরা তাঁদের মতামত ব্যক্ত করেছেন। সেখান থেকে আয়েশা খানমের মন্তব্য তুলে ধরা হলো। তিনি মন্তব্য করেছেন, "এ মানবাধিকার ধারণা কোন লিখিত আইন নয় বা সাংবিধানিক বই নয়, এটা হচ্ছে

নীতিগতভাবে গৃহীত বিষয় যা দেশে ও সমাজে বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন।"[২] (খানম, ২০১৫, পৃষ্ঠা- ২২) এ বিষয়ে তিনি আরও বলেছেন, "বস্তুত এসব নীতিমালা ঘোষণার মূল দাবি হল যে এই বিষয়গুলোর ভিত্তিতে রাষ্ট্রীয় ও সমাজ জীবন ও কার্যক্রম পরিচালিত হবে এবং সেই আলোকে রাষ্ট্রীয় আইন তৈরি হবে।"[৩] (খানম, ২০১৫, পৃষ্ঠা- ২৩) ১৯৪৮ সালে মানবাধিকারের যে সার্বজনীন নীতিমালা ঘোষিত হয়েছিল তার মূল প্রত্যাশা ছিলো পরবর্তীতে এই নীতিমালা আগামী দিনের আইনের মূল ভিত্তি হবে এবং সেসব আইনের ভাবকল্পে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ পরিচালিত হবে। শুধু তাই নয়, রাষ্ট্র ও সমাজের প্রয়োজনে সেই আইন তৈরি হবে এবং বাস্তবায়িত হবে।

'ফরাসি আইন বিশেষজ্ঞ ও কূটনৈতিক রেনে কাসিন (Rene Cassin)-সার্বজনীন আন্তর্জাতিক মানবাধিকারের ঘোষণার (১৯৪৮) অন্যতম খসড়া প্রণয়নকারী- মানবাধিকারকে মন্দিরের চূড়ার সঙ্গে তুলনা করেছেন (Portico of a Temple)। ফরাসি বিপ্লবের ধ্বনির সাম্য (Equality), মৈত্রী (Fraternity), স্বাধীনতার (Liberty) উপর ভিত্তি করে ঘোষিত মানবাধিকারের ঘোষণার ৪টি স্তম্ভের কথা তুলে ধরেন রেনে কাসিন (Rene Cassin)। এগুলো হলো— মর্যাদা (Dignity), স্বাধীনতা (Liberty), সমতা (Equality), ভ্রাতৃত্ববোধ (Brotherhood/ Sisterhood) সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণায় ২৭টি ধারা এই চারটি স্তম্ভকে (The pillars) প্রতিনিধিত্ব করে।'[৪] (খানম, ২০১৫, পৃষ্ঠা- ২৭)

শিক্ষা, মূল্যবোধ, সততা, নৈতিকতা, সমাজের প্রচলিত বিশ্বাস, দৃষ্টিভঙ্গি, ঐতিহ্যকে বিবেচনায় না এনে কোন প্রক্রিয়াতেই নারীর ক্ষমতায়ন সম্ভব নয়। ক্ষমতায়নকে মানবিক অভিধায় ব্যবহার করার জন্য প্রয়োজন সচেতনতা। নারীর ক্ষমতায়ন লাভের জন্য আগে নিজেকে সচেতন হতে হবে। ক্ষমতায়ন লাভের যে পূর্বশর্তগুলো আছে সেগুলো অর্জন করতে হবে। যারা ক্ষমতায়ন লাভ করবে তাদের সচেতনতার পাশাপাশি সমাজে যারা চিন্তাশীল মানুষ আছেন, যারা এই বিষয়গুলো নিয়ে ভাবেন তাদেরও সচেতন হতে হবে। বিশ্বায়নের যুগে তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়নের সাথে সাথে আমাদের সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং কাঠামোগত সংস্কার হয়নি। তবুও বাংলাদেশের নারীরা প্রতিকূলতাসত্ত্বেও চেষ্টা করছে এগিয়ে যেতে সামনের দিকে। একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে নারীর প্রতি যে সহিংস আচরণের প্রমাণ মেলে সমাজে তা মধ্যযুগের বর্বরতাকেও হার মানায়। সমাজের এই চিত্রের পিছনে নানা ধরনের কারণ বিদ্যমান।

নারীর জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করার পাশাপাশি কর্মক্ষেত্রে অর্জিত শিক্ষার প্রয়োগ ঘটিয়ে নারীর ক্ষমতায়নের পথ প্রসারিত করতে হবে। শিক্ষার সাথে নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করতে পারলে সমাজে নারীর প্রতি সহিংস আচরণের পরিবর্তন ঘটতে পারে বলে গবেষক মনে করেন। নারীর ক্ষমতায়ন প্রসঙ্গে বিধগ্ধজনেরা নানারূপ চিন্তাভাবনার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন। বাংলাদেশের নারী আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা আয়েশা খানম নারীর ক্ষমতায়নের বিষয়টি সম্পর্কে যে ভাবনা প্রকাশ করেছেন তা হচ্ছে,

> আত্ম-উন্নয়ন ছাড়া স্বাধীনতা এবং যে কোনো ধরনের ক্ষমতায়নের কথা ভাবা সম্ভব নয়।.. নারীর ক্ষমতায়নের জন্য নারীর সকল ধরনের স্বাবলম্বিতা প্রয়োজন। বাংলাদেশ এর প্রেক্ষাপটে নারীর দরিদ্র অবস্থার সাথে নারীর নিম্ন অবস্থানের একটা আন্তঃসম্পর্ক রয়েছে। অর্থনীতির মূলস্রোত ধারায় নারীকে যুক্ত করা এবং অর্থনীতি ও উন্নয়নের ধারাকে নারী-পুরুষের সমতামুখী করা নারী আন্দোলনের অন্যতম প্রধান কাজ। অতীতের মতো বর্তমানেও সাম্প্রতিক অনেকগুলো গবেষণায় ও সমীক্ষাতে দেখা যাচ্ছে, নারী দরিদ্রদের মাঝেও দরিদ্রতর। এটার তেমন কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হচ্ছে না, আপাতত অনেক উন্নয়ন দেখা গেলেও। এর একটা মূল কারণ পারিবারিকভাবে অর্জিত সকল ধরনের সম্পদ, পিতা ও স্বামীর সম্পত্তিতে নারীর সমঅধিকার নেই। এমনকি কর্মজীবী, বিভিন্ন পেশাজীবী নারীর প্রশিক্ষণ গ্রহণে, দক্ষতা অর্জনে প্রয়োজনের তুলনায় সুযোগের অভাবে অনেক নারী দরিদ্রতম অবস্থানে এবং সামাজিক

নানাবিধ বাধার কারণে প্রান্তিক অবস্থানে বাস করছে। কর্মজীবী, পেশাজীবী তরুণ, হাজার হাজার নারীদের আবাসন সমস্যা, যানবাহন তথা যাতায়াত সমস্যা তীব্র ও প্রকট।[৫] (খানম, ২০১৫, পৃষ্ঠা- ২০৩)

নারীর জীবনে পরিবার থেকে শুরু করে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে প্রতিনিয়ত চড়াই উৎরাই মুখোমুখি হতে হয়। অবরোধপ্রথা ভেঙ্গে আকাশের নিচে এসে দাঁড়াতে পারলেও এখনো লড়াই চলছে নিজের মৌলিক অধিকার নিয়ে, অবস্থান নিয়ে। নারীর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন এখানে বড় ভূমিকা পালন করবে। নারীকে সমাজে তার যোগ্য স্থান দিতে হবে নাহলে সমাজে সামঞ্জস্যতা হুমকির সম্মুখীন হবে। উন্নয়নের ধারা সংকীর্ণই থেকে যাবে— অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সকল পর্যায়ে। সমাজে নারীর হীন অবস্থার চিত্র যুগে যুগে পরিবর্তনশীল হলেও উত্তরণের পথ ভিন্ন হয়নি। একপেশে রক্ষণশীল পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ও তাদের মানসিকতার বিরুদ্ধে লড়াই আজও চলছে। সমাজে অবরোধ প্রথার বেড়াজাল যতটা ছিন্ন হয়েছে বাইরে নারীর চলার পথে বাধা আর চ্যালেঞ্জ ততটা বেড়েছে। বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে নারীর প্রতি মৌলিক বিষয়গুলোতে সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি এখনো গণ্ডিবদ্ধ। সমাজে সন্তান হিসেবে নারীর অধিকার পুরুষের তুলনায় অসম। ধর্ম, সমাজ ও রাষ্ট্র সম্পদ বন্টনের ক্ষেত্রে তো বটেই এছাড়া নারী আর পুরুষের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যায়নের ক্ষেত্রেও অনেক পার্থক্য বিদ্যমান। নারীর দরিদ্র অবস্থাই শুধু আজ সমাজে প্রকট হয়ে উঠেছে তা নয়, নারীর নিরাপত্তার বিষয়টি আরও বৃহৎ হয়ে দাঁড়িয়েছে। নারী ঘরে আর বাইরে দুটি স্থানেই শারীরিক ও মানসিকভাবে কতটা নিরাপদ এটা ভাবনার বিষয়। নারীর প্রতি সহিংস অত্যাচারে সমাজ ও রাষ্ট্রে আইনের সুরক্ষাও অনেক ব্যয়বহুল এবং সময়সাপেক্ষ। কোন ক্ষেত্রে নারীর অত্যাচারের কথা সমাজের চোখে অসম্মানের ভেবে চেপে রাখা হয়, আবার কখনো অত্যাচারের অভিযোগ আইনি ব্যবস্থার আওতায় নিয়ে যাওয়ার সুযোগ পায় না নারী। এ ধরনের অবস্থায় সমাজে নারীর জীবন আতঙ্কগ্রস্ত অবস্থার মুখোমুখি হচ্ছে।

মানব ইতিহাসের শুরু থেকেই লিঙ্গ-বৈষম্য ছিল না। সেখানে ছিলনা কোনো শোষণ, ছিলনা কোনো বঞ্চনা। নারী এবং পুরুষ ছিল একে অপরের সহযোগী, তারা ছিল পরস্পরের পরিপূরক। মনীষীদের অধিকাংশের মতেই সম্পত্তিতে যখন ব্যক্তিগত মালিকানার সৃষ্টি হয় তখন থেকেই মূলত শুরু হয় লিঙ্গ-বৈষম্য। মানুষ যখন বন্যযুগ থেকে কৃষিযুগে উত্তরণ করে তখন জমির উপর পুরুষের একচ্ছত্র মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়। সম্পদই নারীর জন্য হয় মহাশত্রু। পুরুষ যেমন জমির মালিক হয়, তেমনি নারীর উপরও তার মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়। সামনে চলে আসে উত্তরাধিকারের প্রশ্ন। মাতৃপ্রধান প্রথা ভেঙ্গে সৃষ্টি হয় পিতৃপ্রধান প্রথা। এটাকে বলা চলে পুরুষতান্ত্রিক বিপ্লব। এরপর থেকে আজ অবধি পুরুষ নারীকে করে রেখেছে নিজের দাস, করেছে শৃঙ্খলিত। নারী হয়ে আছে পুরুষের ভোগের সামগ্রী এবং ব্যবহৃত হচ্ছে সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র হিসেবে। পরাধীনতার সে সময় থেকে এখন পর্যন্ত দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায়- পৃথিবীর কোথাও নারী পূর্ণ স্বাধীন নয়, পৃথিবীর কোথাও নারীর পূর্ণ নিরাপত্তা নেই, পৃথিবীর কোথাও নারী পূর্ণ মানুষের মর্যাদা পায়নি। তবে একটি কথা বলা যেতে পারে তুলনামূলক বিচারে যেখানেই নারী কিছুটা স্বাধীনতার আলো দেখেছে সেখানেই সভ্যতা এগিয়ে যাচ্ছে। [৬] (আকবর এবং অন্যান্য, ১৯৯৮, পৃষ্ঠা ১)

বর্তমান সময়ে বাংলাদেশে নারীর অবস্থা

বর্তমান সমাজে নারীর অবস্থার দিকে তাকালে প্রথমেই স্মরণ করতে হয় নারী জাগরণের পথিকৃৎ বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনকে। বাঙালি নারীদের অবস্থার ইতিবাচক পরিবর্তনের জন্য পুরুষতান্ত্রিক সমাজের সাথে আমরণ লড়ে

গেছেন তিনি। হার মেনে কখনো পিছিয়ে আসেননি। নারীর শিক্ষা, মুক্তি ও জাগরণ নিয়ে তিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন এবং কাজও করেছিলেন অনেকদূর পর্যন্ত, কিন্তু মাত্র ৫২ বছর বয়সে মারা যান তিনি। নারী সমাজের কল্যাণকল্পে তাঁর পরিকল্পিত কাজগুলো অসমাপ্ত রেখেই তাঁকে চলে যেতে হয়েছে। তাঁর অসম্পূর্ণ স্বপ্নের কথা না জানলেও লীলা নাগ নারী জাগরণ তথা মানব সমাজের উন্নয়নে আজীবন কাজ করে গেছেন। পাশাপাশি বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের স্নেহধন্য দুইজন ব্যক্তিত্ব—সুফিয়া কামাল এবং শামসুন নাহার মাহমুদ; তাঁরা স্ব স্ব অবস্থান থেকে সমাজে নারীর হীন অবস্থানকে উন্নয়নের পথে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে গেছেন। বর্তমান সমাজে নারীর অবস্থার চিত্র দেখে লীলা নাগ, সুফিয়া কামাল এবং শামসুন নাহার মাহমুদের চিন্তা, কর্ম ও উদ্যোগ প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠছে।

তাঁদের চেতনা ও কর্ম পরাধীন ভারতবর্ষ এবং পরাধীন ভারতবর্ষের অবগুণ্ঠিত নারী সমাজের জন্য যেমন সময়ের দাবি মিটিয়ে ছিল তেমনি দেশভাগের সাত দশক পরে আজকের সমাজের পরিস্থিতি প্রেক্ষাপটেও যৌক্তিকতা অনুভূত হয়। বর্তমান সময়কে আমরা আধুনিক যুগ বলেই অভিহিত করে থাকি। আধুনিক সময়ে দাঁড়িয়ে এত পাশবিক আচরণ সমাজে কাম্য নয়। নারীর উপর পুরুষতান্ত্রিক সমাজের সহিংস অত্যাচারের নজির মধ্যযুগকে মনে করিয়ে দেয় বারবার। বিজ্ঞান, তথ্য, প্রযুক্তির এত উন্নতির সাথে সমাজের মূল্যবোধ নৈতিকতার বিকাশ সমান জরুরি, বর্তমান সময়ে তা আরও অধিক জরুরি হয়ে পড়েছে। নারীর শারীরিক গঠন প্রকৃতিগতভাবে পুরুষের চেয়ে ভিন্ন। তাঁর দৈহিক শক্তি পুরুষের চেয়ে কম। এই প্রভেদ সৃষ্টিকর্তা প্রদত্ত। কিন্তু তাই বলে অপেক্ষাকৃত কম শক্তিশালীর উপর অত্যাচার যে করতেই হবে তার বিধান নেই। আর শুরুতে এরকমটা ছিল না নারী পুরুষের সমাজে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আধুনিক সমাজে নারীর নিরাপদ জীবনযাত্রার একটি চিত্র তুলে ধরার মধ্য দিয়ে প্রকৃত চিত্র কিছুটা হলেও বোঝা যাবে। বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ এর ২০১১ ও ২০১২ সালের নারী নির্যাতন বিষয়ক রিপোর্টের ফলাফলের অংশ এই গবেষণা কাজে সহায়ক হবে বলে তুলে ধরা হল। এতে সমাজে নারীর জীবন যাত্রা সম্পর্কে গবেষণালব্ধ চিত্র ফুটে উঠেছে।

> নারী নির্যাতনের মধ্যে যৌন হয়রানি, নিপীড়ন ও নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে সবচেয়ে বেশি (৪৭%), যার মধ্যে ধর্ষণ ও গণধর্ষণের দুটোকে একসাথে হিসেব করে দেখা যায় ধর্ষণের ঘটনাই সর্বাধিক (২৭.৬৬%)। এরপর আছে উত্ত্যক্ততার ঘটনা (১৯.৩৯%)। যৌতুক (১৫%) ও পারিবারিক নির্যাতনের (১২%) ঘটনা আছে এর পর পর। ২০১১ সালের সঙ্গে তুলনা করা হলে একই চিত্র পাওয়া যায়, সেই সময়েও ধর্ষণ এর ঘটনা সবচেয়ে বেশি ঘটেছে (ধর্ষণ ও গণধর্ষণ এর ঘটনা সহ ৯২৫টি) এবং এর পর পর আছে উত্যক্তকরণের ঘটনা (৮৫৮টি)।
>
> সকল বয়সের নারীদেরকেই নির্যাতনের শিকার হতে হয়েছে, ২ থেকে শুরু করে ৭৫ বছর বয়সী কোন নারীই নিস্তার পায়নি নির্যাতনের হাত থেকে। ২ বছরের শিশুর প্রতি সমাজের যে দৃষ্টিভঙ্গি ৭৫ বছরের নারীর প্রতি সমাজের একই দৃষ্টিভঙ্গি বিরাজ করছে। কেবল নারী হওয়ার কারণে তাকে নির্যাতনের শিকার হতে হয়েছে, তবে নির্যাতনের ধরন অনুযায়ী বয়সের পার্থক্য বিদ্যমান। যেমন, যৌতুক ও পারিবারিক নির্যাতন, এসিড নিক্ষেপ এবং ফতোয়া এ ধরনের নির্যাতনের ক্ষেত্রে প্রাপ্তবয়স্করা অর্থাৎ ১৮ বৎসরের অধিক বয়সী নারীরা নির্যাতনের শিকার বেশি হয়। তবে অন্যান্য নির্যাতনের (যৌন হয়রানি ও নির্যাতন, অপহরণ, পাচার এবং উপর্যুক্ত কারণ ছাড়া অন্যান্য কারণে হত্যা) ক্ষেত্রে দেখা যায় শিশুরা অর্থাৎ ১৮ বৎসরের কম বয়সীরা বেশি নির্যাতনের শিকার হয়। ২০১১ সালের চিত্রও তাই, যৌন হয়রানি, নিপীড়ন ও নির্যাতনের শিকার হয়েছে শিশুরাই বেশি। অর্থাৎ একটি মেয়ের পরিপূর্ণ শারীরিক ও মানসিক বিকাশের আগেই তাকে বিভিন্ন নির্যাতনের মুখোমুখি হতে হয় যা তাদের শারীরিক, মানসিক ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলে একই সঙ্গে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও এর প্রভাব লক্ষ করা যায়। এই ধরনের নির্যাতনের শিকার নারীকে কখনো আত্মহননের মতো সিদ্ধান্তের দিকে ঠেলে দেয়, কখনোবা মৃত্যু ঘটে আবার কখনো মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে একধরনের ট্রমার মধ্যে কাটাতে হয় সারা জীবন।

সকল ধরনের নির্যাতনের ঘটনা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ৫৬% প্রাপ্তবয়স্ক এবং ৪৪% শিশু নির্যাতনের শিকার হয় অর্থাৎ নির্যাতনের প্রায় অর্ধেকই শিশু। শিশুদের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, ১৪ বৎসর থেকে ১৮ বৎসরের কম বয়সীরা নির্যাতনের মুখোমুখি হয় তুলনামূলক বেশি তবে ধর্ষণ ও গণধর্ষণের ক্ষেত্রে এই বয়সসীমা ১০ থেকে ১৮ বৎসরের কম। প্রাপ্তবয়স্কদের ক্ষেত্রে দেখা যায়, ১৮-২২ বৎসর বয়সসীমার নারীরা বেশি নির্যাতনের শিকার হয়। এই প্রেক্ষিতে বলা যায়, ১০ থেকে ২২ বৎসর বয়সসীমার নারীরা সাধারণত নির্যাতনের শিকার বেশি হয়।

যৌন হয়রানি, নিপীড়ন ও নির্যাতনের ক্ষেত্রে দেখা যায়, ছাত্রীরাই তুলনামূলকভাবে বেশি নির্যাতনের শিকার হচ্ছে- উত্যক্তকরণের ক্ষেত্রে শিশু ৫০% ও প্রাপ্তবয়স্ক ৪৮%; ধর্ষণের ক্ষেত্রে শিশু ৯৩% ও প্রাপ্তবয়স্ক ১৮%; গণধর্ষণের ক্ষেত্রে শিশু ৬১% ও প্রাপ্তবয়স্ক ২০%; অশ্লীল আচরণের ক্ষেত্রে শিশু ৪ জন ও প্রাপ্তবয়স্ক ৪ জন এবং প্রযুক্তিগত অপরাধের ক্ষেত্রে শিশু ১৪ জন ও প্রাপ্তবয়স্ক ৬ জন।

নির্যাতনের শিকার নারীদের উপর নির্যাতনের প্রভাব বিভিন্নভাবে পড়ে। মানসিক, শারীরিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সকল ক্ষেত্রেই এর প্রভাব লক্ষ করা যায়। শারীরিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব চোখে দেখা যায়। তবে নির্যাতনের ধরন, নির্যাতনের শিকার নারীর বয়স, মানসিক গঠন ও ধারণ ক্ষমতা এগুলোর উপর নির্ভর করে নারীর উপর এর প্রভাব কতটুকু পড়বে বা কীভাবে পড়বে। এসিড নিক্ষেপের ঘটনায় নারীকে শারীরিক ক্ষতি ও প্রতিবন্ধকতা নিয়ে সারাজীবন কাটাতে হয়। অনেকক্ষেত্রে পঙ্গুত্বের শিকার হতে হয় যা তাকে শারীরিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করার সাথে সাথে মানসিকভাবে যেমন বিপর্যস্ত করে তোলে তেমনি সামাজিক জীবনেও প্রভাব ফেলে।[৭] (মোসলেম, ২০১৩, পৃষ্ঠা- ১৩৬, ১৩৭, ১৩৮)

সময়ের সাথে নারীর প্রতি অত্যাচার ও সহিংসতার অবয়ব বদলেছে। নির্যাতনের মাত্রা একেক সময় একেক দিকে প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে সমাজের সামনে। আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক) কর্তৃক সংগৃহীত গত কয়েক বছরের নারী নির্যাতন রিপোর্টের কিছু তথ্য দেওয়া হল— এর মাধ্যমে নারীর প্রতি অত্যাচারের ভিন্ন ভিন্ন স্তরের চিত্র স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

সারণি- ১

যৌন হয়রানি ও বখাটেদের উৎপাত – ২০১০

জানুয়ারি-ডিসেম্বর

নির্যাতনের ধরন	নারী	পুরুষ	মোট
আত্মহত্যা	৩২	১	৩৩
আত্মহত্যার চেষ্টা	৮	০	৮
আত্মহত্যার হুমকি	৫	০	৫
খুন	৩	১৭	২০
লাঞ্ছিত	৩৭৮	১২৮	৫০২
মোট	৪২৬	১৪৬	৫৬৮

সারণি- ২

যৌন হয়রানি ও বখাটেদের উৎপাত – ২০১৫

জানুয়ারি-ডিসেম্বর

ধরন	নারী	পুরুষ	মোট
আত্মহত্যা	১০		১০
আত্মহত্যার চেষ্টা			০
প্রতিবাদ করায় খুন	৫	১	৬
বখাটে কর্তৃক এবং প্রতিবাদ করায় লাঞ্ছিত	২০৫	৬	২১১
বখাটেদের উৎপাতকে কেন্দ্র করে সংঘাতে আহত		৮৯	৮৯
স্কুলে যাওয়া বন্ধ	৪		৪
মোট	২২৪	৯৬	৩২০

সারণি- ৩

যৌন হয়রানি ও সহিংসতা – ২০১৯

জানুয়ারি-আগস্ট

ধরন	নারী	পুরুষ	মোট
আত্মহত্যা	১১		১১
আত্মহত্যার চেষ্টা			০
প্রতিবাদ করায় খুন	৪	৬	১০
বখাটে কর্তৃক এবং প্রতিবাদ করায় লাঞ্ছিত	১৭৪	১১	১৮৫
বখাটেদের উৎপাতকে কেন্দ্র করে সংঘাতে আহত	৫	২	৭
স্কুলে যাওয়া বন্ধ	২		২
মোট	১৯৬	১৯	২১৫

সারণি- ৪

এসিড নিক্ষেপ – ২০০০

জানুয়ারি-ডিসেম্বর

কারণ	বয়স						বয়সের উল্লেখ নেই	মোট	মামলা
	০-৬	৭-১২	১৩-১৮	১৯-২৪	২৫-৩০	৩০+			
পারিবারিক কলহ		৪	৪	২	২	১১	১৫	৩৮	১২
প্রেমে ব্যর্থ হয়ে		১	৮	৩	১	৩	১১	২৭	১০
বিয়ের প্রস্তাবে রাজি না হওয়ায়			৫	১	১		৪	১১	৫
যৌন সম্পর্কে রাজি না হওয়ায়		১		১	১		৩	৬	১
যৌতুকের জন্য	১	১	২	৫	৩	১	৫	১৮	৭
অপহরণের চেষ্টা				১		১		২	০
অপহরণের পর							১	১	
ধর্ষণের চেষ্টার পর			২		২	২		৬	১
পাচার				১				১	
গর্ভপাত ঘটাতে সম্মত না হওয়ায়			১					১	
স্বামীকে তালাক দেওয়ায়			১					১	
কারণ উল্লেখ নেই	১	১	১২	৯	৪	১১	১৫	৫৩	১৮
মোট	২	৮	৩৫	২৩	১৪	২৯	৫৪	১৬৫	৫৪

সারণি- ৫

এসিড নিক্ষেপ – ২০১০

জানুয়ারি-ডিসেম্বর

কারণ	বয়স						বয়সের উল্লেখ নেই	মোট	মামলা
	০-৬	৭-১২	১৩-১৮	১৯-২৪	২৫-৩০	৩০+			
পারিবারিক কলহ	৩		১	৩	৪	৫	৫	২১	১০
যৌতুকের জন্য				২	১		৩	৬	৩
শত্রুতা					১	২	৪	৭	
জমিজমা সংক্রান্ত					২	৫	৩	১০	৫
কুপ্রস্তাবে রাজি না হওয়ায়		১				১	৬	৮	১
পাওনা টাকা চাইতে গেলে								০	
বিয়ের প্রস্তাবে রাজি না হওয়ায়			২	২		১		৫	৪
প্রেমে ব্যর্থ হয়ে			১	২			২	৫	২
ধর্ষণের পর		১						১	
স্বামীর বিরুদ্ধে মামলা করায়							১	১	
পরকীয়া সম্পর্কে বাধা দেওয়ায়								০	
ম্যানেজিং কমিটির নির্বাচনে ভোট না দেওয়ায়								০	
মামলা প্রত্যাহারে রাজি না হওয়ায়				১			১	২	
স্বামীকে তালাক দেওয়ায়			১				১	২	
সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করায়								০	

যৌতুকের মামলা করায়				১				১	১
কারণ উল্লেখ নেই			২	৭	৪	৬	৫	২৪	১২
মোট	৩	২	৮	১৭	১২	২০	৩১	৯৩	৩৯

সারণি- ৬

এসিড নিক্ষেপ – ২০১৯

জানুয়ারি-আগস্ট

কারণ	বয়স						বয়স উল্লেখ নেই	মোট	মামলা	মামলার উল্লেখ নেই
	০-৬	৭-১২	১৩-১৮	১৯-২৪	২৫-৩০	৩০+				
পারিবারিক কলহ	১			১	১			৩	২	১
জমিজমা সংক্রান্ত			১				১	২	১	১
প্রেম প্রত্যাখ্যান করায়							১	১		১
মামলা প্রত্যাহার না করায়								০		
যৌন সম্পর্কে রাজি না হওয়ায়				১				১	১	
শত্রুতা		১		১				২		২
স্বামীকে তালাক দিতে চাওয়ায়								০		
মাদকের টাকা না পাওয়ার জন্য								০		
যৌতুকের কারণে							১	১		১
কারণ উল্লেখ নাই			১				১	২	১	১
মোট	১	১	২	৩	১	০	৪	১২	৫	৭

সারণি- ৭

ধর্ষণ – ২০০০ সাল

জানুয়ারি-ডিসেম্বর

ধরন	বয়স						বয়স উল্লেখ নেই	মোট	মৃত্যু	মামলা
	০-৬	৭-১২	১৩-১৮	১৯-২৪	২৫-৩০	৩০+				
ধর্ষণের চেষ্টা	৫	১	৭	৩	৩	২	৬৭	৮৮	৪	১৭
একক ধর্ষণ	৩৬	৭৭	৪৫	১৪	১০	৯	১৫২	৩৪৩	৯	১৭২
গণধর্ষণ	২	১৮	৬৭	১৮	১৬	৭	১৮৫	৩১২	৩১	১৮৩
পুলিশ দ্বারা ধর্ষণের চেষ্টা					১		১৩	১৪		২
পুলিশ দ্বারা ধর্ষণ		৩	৩	১	১		৯	১৭		৮
ধর্ষণের ধরন উল্লেখ নেই	১	৫	১৫	১৩	৩	২	৪২	৮১	৬৩	২২
মোট	৪৪	১০৪	১৩৭	৪৯	৩৪	২০	৪৬৭	৮৫৫		৪০৪
মৃত্যু	১	৯	২৯	১৮	৬	২	৪২		১০৭	২৫

সারণি- ৮

ধর্ষণ – ২০১০ সাল

জানুয়ারি-ডিসেম্বর

ধরন	বয়স						বয়স উল্লেখ নেই	মোট	হত্যা	আত্মহত্যা	মামলা
	০-৬	৭-১২	১৩-১৮	১৯-২৪	২৫-৩০	৩০+					
ধর্ষণের চেষ্টা	৬	১১	৩	৫	৪	৬	৫৬	৯১	১		৪৪
একক ধর্ষণ	৩৪	৬০	৪৩	১৫	৩	৪	১৩১	২৯০	১১	৪	১৭০
গণধর্ষণ	৩	১০	৩২	১২	১০	৭	১৪৫	২১৯	৪৪	৩	১০২
ধর্ষণের ধরন উল্লেখ নেই	১	৪	১	৩		১	১৬	২৬	২৩		৭

মোট	৪৪	৮৫	৭৯	৩৫	১৭	১৮	৩৪৮	৬২৬			৩২৩
ধর্ষণ পরবর্তী হত্যা	৫	৭	১৩	৯	৪	৭	৩৪		৭৯		২৯
ধর্ষণের কারণে আত্মহত্যা		১	৩	১			২			৭	৫

সারণি- ৯

ধর্ষণ – ২০১৫ সাল

জানুয়ারি-ডিসেম্বর

ধরন	বয়স						বয়স উল্লেখ নেই	মোট	হত্যা	আত্মহত্যা	মামলা
	০-৬	৭-১২	১৩-১৮	১৯-২৪	২৫-৩০	৩০+					
ধর্ষণের চেষ্টা	২	৪	১		১	২	৮৪	৯৪	২		৪৫
একক ধর্ষণ	৫০	১৩৯	১১১	৮	৪	৫	১৬৭	৪৮৪	৯	১	২৯২
গণধর্ষণ	১	১৬	৫৮	১৮	৯	৪	১৩৯	২৪৫	৩৩	১	১৩৭
ধর্ষণের ধরন উল্লেখ নেই		৪	৯	২	৩	১	৪	২৩	১৬		৩
মোট	৫৩	১৬৩	১৭৯	২৮	১৭	১২	৩৯৪	৮৪৬			৪৭৭
ধর্ষণ পরবর্তী হত্যা	১	১৩	১৫	৬	১০	৩	১২		৬০		
ধর্ষণের কারণে আত্মহত্যা		১					১			২	

সারণি- ১০

ধর্ষণ – ২০১৯ সাল

জানুয়ারি-আগস্ট

ধরন	বয়স						বয়স উল্লেখ নেই	মোট	হত্যা	আত্মহত্যা	মামলা	মামলার উল্লেখ নেই
	০-৬	৭-১২	১৩-১৮	১৯-২৪	২৫-৩০	৩০+						
একক ধর্ষণ	৭৯	১৪৫	১০১	১৯	১০	৮	৩৫০	৭১২	২৭	৪	৫০২	২১০
গণধর্ষণ	১	৬	৫০	১৫	১১	১৩	১২৫	২২১	১৮	২	১৬১	৬০
ধর্ষণের ধরন উল্লেখ নেই	২	৩	২	১		২	৫	১৫	৯	১	৪	১১
মোট	৮২	১৫৪	১৫৩	৩৫	২১	২৩	৪৮০	৯৪৮			৬৬৭	২৮১
ধর্ষণ পরবর্তী হত্যা	৫	১১	১৪	৪	২	৫	১৩		৫৪			
ধর্ষণের কারণে আত্মহত্যা			২		১		৪			৭		
ধর্ষণের চেষ্টার পর হত্যা							১		১			
ধর্ষণের চেষ্টার কারণে আত্মহত্যা							১			২		
ধর্ষণের চেষ্টা	২১	২৪	১০	৩	২		৯৯	১৫৯			১০৫	৫৪

সারণি- ১১

পারিবারিক নির্যাতন – ২০০০

জানুয়ারি-ডিসেম্বর

ধরন	বয়স					বয়স উল্লেখ নেই	মোট	মামলা
	৭-১২	১৩-১৮	১৯-২৪	২৫-৩০	৩০+			
স্বামী কর্তৃক নির্যাতন	১	৩	৯	৬	১	২৫	৪৫	৭
স্বামীর পরিবার কর্তৃক নির্যাতন			১	১		৯	১১	৪
নিজ পরিবারের সদস্য কর্তৃক নির্যাতন						১	১	

স্বামী কর্তৃক হত্যা		১০	৭০	৫৩	২৫	৬৮	২২৬	১৩২
স্বামীর পরিবার কর্তৃক হত্যা		৫	৫	৫	৬	১০	৩১	১৬
নিজ পরিবার কর্তৃক হত্যা		২	৩	৪	৮	১০	২৭	১৮
বিবাহ বিচ্ছেদ						১	১	
মোট	১	২০	৮৮	৬৯	৪০	১২৪	৩৪২	১৭৭

সারণি- ১২

পারিবারিক নির্যাতন – ২০১০

জানুয়ারি-ডিসেম্বর

ধরন	বয়স					বয়স উল্লেখ নেই	মোট	মামলা
	৭-১২	১৩-১৮	১৯-২৪	২৫-৩০	৩০+			
স্বামী কর্তৃক নির্যাতন		২	৪	৮	২	২৬	৪২	৪
স্বামীর পরিবার কর্তৃক নির্যাতন				২		৮	১০	২
নিজ পরিবারের সদস্য কর্তৃক নির্যাতন		১			২	৩	৬	
স্বামী কর্তৃক হত্যা	১	৮	৫৯	৫৫	৩০	৭২	২২৫	৯৩
স্বামীর পরিবার কর্তৃক হত্যা		১	১০	১০	৬	২০	৪৭	১৯
নিজ পরিবার কর্তৃক হত্যা		১	১	১	৭	৬	১৬	৩
আত্মহত্যা	২	২	১৩	১০	৯	১৫	৫১	১১
মোট	৩	১৫	৮৭	৮৬	৫৬	১৫০	৩৯৭	১৩২

সারণি- ১৩

পারিবারিক নির্যাতন – ২০১৫

জানুয়ারি-ডিসেম্বর

ধরন	বয়স				বয়স উল্লেখ নেই	মোট	মামলা
	৭-১৮	১৯-২৪	২৫-৩০	৩০+			
স্বামী কর্তৃক নির্যাতন	৪	৬	১১	৪	১৫	৪০	১১
স্বামীর পরিবার কর্তৃক নির্যাতন		২			৪	৬	৩
স্বামী কর্তৃক হত্যা	৫	৫৩	৫৬	৪৭	৫১	২১২	৯২
স্বামীর পরিবার কর্তৃক হত্যা	৫	১৪	৮	৫	৮	৪০	১৮
নিজ পরিবার কর্তৃক হত্যা	১			১৭	৩	২১	৯
আত্মহত্যা	১	২২	১৭	১০	৪	৫৪	১৩
মোট	১৬	৯৭	৯২	৮৩	৮৫	৩৭৩	১৪৬

সারণি- ১৪

পারিবারিক নির্যাতন – ২০১৯

জানুয়ারি-আগস্ট

ধরন	বয়স				বয়স উল্লেখ নেই	মোট	মামলা	মামলার উল্লেখ নেই
	৭-১৮	১৯-২৪	২৫-৩০	৩০+				
স্বামী কর্তৃক নির্যাতন	১	৩		১	১১	১৬	৬	১০
স্বামীর পরিবার কর্তৃক নির্যাতন		১		৪	৬	১১	৭	৪
স্বামী কর্তৃক হত্যা	১০	৩৩	৩২	৩৫	২২	১৩২	৬৫	৬৭
স্বামীর পরিবার কর্তৃক হত্যা	৪	৯	৫	৩	১১	৩২	১৭	১৫
নিজ পরিবার কর্তৃক হত্যা	১	২	১	২৩	২	২৯	১৩	১৬
নিজ পরিবার কর্তৃক নির্যাতন				৮		৮	২	৬
আত্মহত্যা	২	১২	১৩	৬	৫	৩৮	১৭	২১
মোট	১৮	৬০	৫১	৮০	৫৭	২৬৬	১২৭	১৩৯

সারণি- ১৫

যৌতুককে কেন্দ্র করে নির্যাতন -- ২০০০

জানুয়ারি-ডিসেম্বর

নির্যাতনের ধরন	বয়স						বয়স উল্লেখ নেই	মোট	মামলা
	০-৬	৭-১২	১৩-১৮	১৯-২৪	২৫-৩০	৩০+			
শারীরিক নির্যাতন			৮	১৮	৮	১	৩২	৬৭	৩৭
নির্যাতিত হয়ে আত্মহত্যা			১৮	৬৭	৪০	৮	৪৬	১৭৯	১০১
এসিড নিক্ষেপ	১	১	২	৫	৩	১	৫	১৮	৭
আত্মহত্যা			১	১	২		৫	৯	২
ধর্ষণ			১				১	২	
পরিত্যাক্ত				১	২		৩	৬	১
মোট	১	১	৩০	৯২	৫৫	১০	৯২	২৮১	১৪৮

সারণি- ১৬

যৌতুককে কেন্দ্র করে নির্যাতন -- ২০১০

জানুয়ারি-ডিসেম্বর

নির্যাতনের ধরন	বয়স				বয়স উল্লেখ নেই	মোট	মামলা
	১৩-১৮	১৯-২৪	২৫-৩০	৩০+			
শারীরিক নির্যাতন	১৭	১২৮	৮৪	২১	১৩৮	৩৮৮	৫০
এসিড নিক্ষেপ		২	১		৩	৬	১
স্বামীর গৃহ থেকে বিতাড়িত						০	
তালাক		১				১	
মোট	১৭	১৩১	৮৫	২১	১৪১	৩৯৫	৫১
হত্যা	৯	৯০	৫৫	১৪	৫৬	২২৪	১১২
নির্যাতিত হয়ে আত্মহত্যা		৭			১১	১৮	৬

সারণি- ১৭

যৌতুককে কেন্দ্র করে নির্যাতন - ২০১৫

জানুয়ারি-ডিসেম্বর

নির্যাতনের ধরন	বয়স						বয়স উল্লেখ নেই	মোট	মামলা
	০-৬	৭-১২	১৩-১৮	১৯-২৪	২৫-৩০	৩০+			
শারীরিক নির্যাতন			৭	২০	১৫	৩	৫৬	১০১	৫৬
এসিড নিক্ষেপ								০	
স্বামীর গৃহ থেকে বিতাড়িত								০	
নির্যাতনের কারণে আত্মহত্যা			১	৭	১	১		১০	৩
শারীরিক নির্যাতনের পর হত্যা			১২	৬২	৪৮	১০	৫৫	১৮৭	৯৯
মোট			২০	৮৯	৬৪	১৪	১১১	২৯৮	১৫৮

সারণি- ১৮

যৌতুককে কেন্দ্র করে নির্যাতন - ২০১৯

জানুয়ারি-আগস্ট

নির্যাতনের ধরন	বয়স					বয়স উল্লেখ নেই	মোট	মামলা	মামলার উল্লেখ নাই
	৭-১২	১৩-১৮	১৯-২৪	২৫-৩০	৩০+				
শারীরিক নির্যাতন	১	১	১২	৯		১৮	৪১	২৫	১৬
স্বামীর গৃহ থেকে বিতাড়িত			১	১		২	৪	৪	
নির্যাতনের কারণে আত্মহত্যা			২				২		২
শারীরিক নির্যাতনের পর হত্যা		৪	৩১	১৩	৬	৯	৬৩	৩১	৩২
মোট	১	৫	৪৬	২৩	৬	২৯	১১০	৬০	৫০

আইন ও সালিশ কেন্দ্রের উপর্যুক্ত তথ্য থেকে আমরা বাংলাদেশের নারীর প্রতি অত্যাচার ও সহিংসতার চিত্র সম্পর্কে ধারণা পেতে পারি।[৮] (নারী নির্যাতন রিপোর্ট, ২০০০, ২০১০, ২০১৫, ২০১৯ সাল, আইন ও সালিশ কেন্দ্র) সহিংসতা ও অত্যাচারের ধরন সময়ের পরিক্রমায় ভিন্ন হয় কিন্তু সমাপ্ত হয় না। কখনো এসিড নিক্ষেপের মতো সহিংসতা বেশি ছিল, কখনো আবার ধর্ষণের বীভৎসতা বেড়ে যায়। এ কারণেই দেখা যায় যুগে যুগে নারীর জন্য অত্যাচার ও সহিংসতামুক্ত সমাজের জন্য লীলা নাগ, শামসুন নাহার মাহমুদ ও সুফিয়া কামাল– লড়াই করে গেছেন আজীবন।

নারী ব্যক্তিত্বত্রয়ের ভাবনার আলোকে নারীর শিক্ষা ও ক্ষমতায়ন

গবেষণায় লক্ষণীয়, লীলা নাগ, শামসুন নাহার মাহমুদ এবং সুফিয়া কামালের জন্ম উনিশ শতকের শুরুর দিকে। তাঁদের মধ্যে তিনজনই দেশভাগের এই করাল বীভৎস পরিস্থিতি প্রত্যক্ষ করেছিলেন। সুফিয়া কামাল দেশভাগের ঘৃণ্য অমানবিক রক্তপাতের পর ১৯৭১ এ বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের ধ্বংসলীলাও প্রত্যক্ষ করেছিলেন। রাষ্ট্রবিপ্লব বা রাষ্ট্র অভ্যুত্থান নারীর জীবনে কি ধরনের ক্ষতচিহ্ন রেখে যায় তা এই তিনজন ব্যক্তিত্ব গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। সেজন্যই নারীরা কীভাবে সমাজে নিজের অবস্থানে লড়াই করে টিকে থাকবে এ বিষয়ে তাঁদের জীবন দিয়ে প্রত্যক্ষ করা চিন্তা, কাজ এবং উদ্যোগ বর্তমান সময়ের নিরিখে একেবারে অচল ও নিঃশেষ হয়ে যেতে পারে না। এখানে তিনজন ব্যক্তিত্বের চিন্তা, কাজ ও উদ্যোগের প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে পৃথকভাবে আলোচনা করা হল।

আলোচনায় উঠে এসেছে লীলা নাগের বেড়ে ওঠার পরিমণ্ডলে শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল, পাশাপাশি তাঁর ব্যক্তিত্ব ও বোধকে দৃঢ় ও বহির্মুখী করে তোলার ক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের একটি বিশেষ ভূমিকা ছিল। যেসময় নারীদের ঘরের বাইরে যাওয়ার উপরে সমাজের কঠোর শাসনদণ্ডের প্রভাব, সে সমাজে দাঁড়িয়ে শিক্ষার জন্য লড়াই করা, দেশের মুক্তির জন্য বিপ্লব করার যে শক্তি ও মনোবল তা এমনি এমনি পাননি তিনি। নারীর জীবনের বিকাশে তথা মানুষের জীবনের বিকাশে শিক্ষার বিকল্প নেই। কিন্তু শিক্ষাকে আরও দৃঢ় ও মজবুত ভিত দেওয়ার লক্ষ্যে আরও কিছু আনুষঙ্গিক কাজ করতে হয়। বোধকে আরও মজবুত করতে সাংস্কৃতিক ও সামাজিক কর্মকাণ্ডের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় নারীরা শিক্ষিত হয়ে উঠলেও সে শিক্ষাকে জীবনমুখী করে তোলে সাংস্কৃতিক ও সামাজিক কর্মকাণ্ড। এসকল কাজের মাধ্যমে নিজেকে এবং নিজের চিন্তাকে সবার সামনে তুলে ধরা যায়। লীলা নাগ নারীদের জন্য দীপালি সংঘ গঠন করেছিলেন কারণ সমাজে নারীর অবস্থান তৈরি করতে হলে সাংস্কৃতিক ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে নারীর অংশগ্রহণের বিষয়টি তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। বর্তমান সমাজেও নারীর অবস্থান সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে উন্নয়ন করতে চাইলে সমাজের সাথে যোগ ঘটাতে হবে। জীবনমুখী শিক্ষাই নারীর জন্য তথা মানুষের জন্য কার্যকর ভূমিকা পালন করবে। সেসময়ের রক্ষণশীল সমাজে দাঁড়িয়ে, একটি পরাধীন দেশের অস্থিতিশীল অবস্থার মধ্যেও দীপালি সংঘের দুঃসাহসিক উদ্যোগ নারী জাতির জন্য ভিন্ন দিগন্তের উন্মোচন করেছিলো। আজকের এই স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রে দাঁড়িয়ে এরকম একটি প্রতিষ্ঠান আমরা নারী জাতির জন্য গড়ে তুলতে পারিনি। এই ব্যর্থতার ভার কার কাঁধে বর্তাবে সেটি এখানে মুখ্য নয়। তাই বলে ব্যর্থতাকে আড়াল করা যাবে না তাই বলে। সংঘ গঠনের উদ্যোগটি তখনকার সময়ে যেমন প্রাসঙ্গিক ছিল নিঃসন্দেহে আজকে আরও বেশি প্রাসঙ্গিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। সকল স্তরের নারীর মধ্যে অর্থকরী শিল্প, স্বাস্থ্য ও শিল্পায়ন সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া, দেশপ্রেম, জাতীয়তাবোধ, সমাজে সচেতনতা জাগানো, সামাজিক কুপ্রথা ও দুরাচার প্রভৃতি দূর করার লক্ষ্যে বর্তমান সময়ে কাজ করা আবশ্যক।

নারীর শরীরচর্চা ও নিজের সুরক্ষা

তখনকার সময়ে বিপ্লবী কাজে আত্মরক্ষা এবং দ্রুত শরীর সঞ্চালনের প্রয়োজন ছিল। তাই লীলা নাগ দীপালি সংঘের উদ্যোগে নারীদের শারীরিক ও মানসিক শক্তি বৃদ্ধির জন্য ব্যায়ামাগার স্থাপন করেন। ছুরি, লাঠি চালনা ব্যায়ামের অংশ ছিল। এছাড়া দশ জনের সামনে এসে মেয়েদের দাঁড়ানো বা কথা বলার যে সংকোচ সেগুলো কাটানোর জন্য খেলাধুলা, সঙ্গীত, অভিনয় ইত্যাদি শেখানোর ব্যবস্থা করেছিলেন। তখন বিপ্লব দীক্ষিত প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার অস্ত্র চালনার শিক্ষা পায় দীপালি সংঘে। বর্তমান সমাজে নারীর উপর যে সহিংস নির্যাতনের নিদর্শন চারদিকে— সেদিক থেকে লীলা নাগের দীপালি সংঘের শারীরিক কসরতের পাশাপাশি ছুরি চালনা রপ্ত করানোর বিষয়টি বর্তমান সময়ে প্রাসঙ্গিক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ঢাকা শহরে কতিপয় সংস্থায় জুডো ও তাইকয়ান্ডো নামে আত্মরক্ষার কৌশলের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। কিন্তু সেগুলো জনসংখ্যার তুলনায় অপ্রতুল এবং সাধারণ জনগণের জন্য ব্যয়বহুল। নারী ও শিশুর প্রতি বর্তমান সমাজে যে বীভৎস হিংস্রতা তাতে নারীদের আত্মরক্ষার কৌশল জানা আবশ্যক বলেই প্রতীয়মান হয়। রাষ্ট্রে নিরাপত্তা কর্মী এবং আইন থাকা সত্ত্বেও নিজের সুরক্ষার প্রথম হাতিয়ার নিজেকেই ধরতে হয়।

নারীরা পুরুষ শাসিত সমাজে বিশ্বস্ত ব্যক্তিদ্বারা রুদ্ধ থাকলেও তারা অরক্ষিতা, তাদের আত্মরক্ষার কৌশল জানা উচিত। নিজেদের শরীর ও স্বাস্থ্য নিয়ে অজ্ঞ, উদাসীন এবং সর্বোপরি লজ্জাশীল মনোভাব নিজেদের জন্য ক্ষতির কারণ হয়েই দাঁড়ায়। শারীরিক বিষয়ে নারীর এই সংকোচ তার কাজে প্রভাব ফেলে।

পাঠাগার

সমাজে নারীর শিক্ষার গণ্ডি পাঠ্যপুস্তকের বাইরে বের করে আনতে হবে। জ্ঞানের অসীম রাজ্যের সাথে পরিচয় ঘটাতে হবে নারী সমাজকে। বহু বিষয় আছে জ্ঞানের যেসবের সাথে পাঠ্যপুস্তকের নির্বাচিত বিষয়বস্তুর মধ্য দিয়ে পরিচয় ঘটানো সবসময় সম্ভরপর হয়ে ওঠে না। নারী সমাজের অজ্ঞতা, কূপমণ্ডূকতা, কুসংস্কারের বেড়াজাল কাটিয়ে উঠে বিজ্ঞানমনস্ক করে তোলার ক্ষেত্রে পড়াশোনার বিকল্প নেই। বিদ্যালয়ের পড়াশোনার পাশাপাশি পাঠাগার স্থাপন, স্টাডি সার্কেলের মাধ্যমে নারী সমাজে সচেতনতা বৃদ্ধি করা যায়। শহরকেন্দ্রিক পাঠাগারের সুব্যবস্থা থাকলেও মফস্বল বা গ্রাম এলাকায় পাঠাগার ও পাঠচক্রের ব্যবস্থা করলে নারী সমাজের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা সুবিধা হবে। অনেকসময় নিরাপত্তাজনিত কারণে নারীদের পরিবার থেকে বের হতে দেয় না। সেজন্য নারীদের জন্য এলাকাভিত্তিক পাঠাগার ব্যবহারের ব্যবস্থা রাখা ফলপ্রসূ উদ্যোগ হতো বর্তমান সময়ের জন্য। তখনকার সময়ে দাঁড়িয়ে অবরুদ্ধ নারী সমাজের জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধির উপায় হিসেবে লীলা নাগ পাঠাগার স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিলেন। দীপালি সংঘের উদ্যোগে মেয়েদের জন্য পাঠাগার তৈরি করা হয়েছিলো। পাঠাগারে তখনকার সময়ের পত্রিকার সংগ্রহ ছিল অধিক। সমকালীন বাস্তবতার সাথে মেয়েদের পরিচয় করানোর জন্য এই উদ্যোগটি ছিল প্রশংসনীয়।

দীপালি সংঘের এসব কার্যক্রম ছিল নারী সমাজকে সবদিক থেকে চার দেয়ালের বাইরের জগৎ ও প্রকৃত সংঘর্ষের সাথে পরিচিত করানো। যাতে বাস্তব পরিস্থিতির সাথে সমাজে নিজেদের অবস্থানকে প্রত্যক্ষ করে সেখান থেকে উত্তরণের চেষ্টা করতে পারে। স্ব স্ব অবস্থানে নিজেদের জীবনের প্রতি দায়িত্ববোধ জাগ্রত করা, উপার্জন দক্ষতা উন্নয়ন ও মতামত দেওয়ার

ক্ষমতা বৃদ্ধি করা নারী সমাজের মুক্তির পথে অত্যাবশ্যক ছিল। সেদিক থেকে দেখলে লীলা নাগের এই মহতী উদ্যোগ প্রশংসার দাবি রাখে। সামাজিক প্রগতিশীলতায় দীপালি সংঘের ভূমিকা সম্পর্কে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সুকুমার দত্তের অভিব্যক্তি প্রণিধানযোগ্য "দীপালির আলো অনেকদিন হয় নিভিয়া গিয়াছে।"[৯] (মোহান্ত, ১৯৯৯, পৃষ্ঠা- ৩০)

বর্তমান সময়ে লীলা নাগ এবং তাঁর মনন ও কর্ম দীপালি সংঘের মতই নিভে গেছে। কিন্তু নিভে যাওয়া দীপ জ্বালবার প্রাসঙ্গিকতা আজ সবচেয়ে বেশি। তাঁর নাম, কর্ম কোন কিছুই তাঁর সঠিক অবস্থানে নেই এই ভূখণ্ডে। দেশ শব্দটি না বলে ভূখণ্ড শব্দটি বলার কারণ, দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে যখন ভারতবর্ষ খণ্ডিত করা হয়, সেই ঘটনা লীলা নাগের জীবনে অনেক পরিবর্তন নিয়ে আসে। ধর্মের উপর ভিত্তি করে ইংরেজ যে স্বাধীনতা দিয়ে গেছে তা বহু মানুষের জীবন উজাড় করেছে। তারা না পেয়েছে স্বাধীনতার মুক্তি, না পেয়েছে মাতৃভূমি, না পেয়েছে স্বাধীন মতে বেঁচে থাকার অধিকার। লীলা নাগ তাঁর ধর্মীয় পরিচয়ের কারণে এই ভূখণ্ডে ঠাঁই পাননি। চলে যেতে বাধ্য করা হয়েছিল অন্য ভূখণ্ডে। যেন মাতৃভূমি বলে কিছুই নেই সেই দ্বিজাতিতত্ত্বের ঊর্ধ্বে। লীলা নাগের বিদ্যালয়ের নামও এই ভূখণ্ডে তাঁর মতই অবাঞ্ছিত প্রতিপন্ন হয়েছে। 'নারী শিক্ষা মন্দির', 'দীপালি স্কুল' নামগুলো প্রতিষ্ঠাতার মতো এই ভূখণ্ডের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে না। লক্ষণীয়, লীলা নাগের সাথে সাথে তাঁর চিন্তা, কর্ম উদ্যোগগুলোর পরিচর্যাও প্রচণ্ড উপেক্ষা।

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা

নারীর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা কতটা জরুরি তা লীলা নাগের শিক্ষাজীবন থেকেই জানা গেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নারীদের শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত করার জন্য তিনি পিছপা হননি। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রবেশাধিকার নারীর শিক্ষা ও ক্ষমতায়নের পথকে আরও সুদৃঢ় করে তুলবে। তবে তিনি শুধু প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাকে একপেশে গুরত্ব দেননি। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি নারী সমাজের জন্য হাতে কলমে শিক্ষার কথা বলে গেছেন। শামসুন নাহার মাহমুদ এবং সুফিয়া কামাল— তাঁরাও তাঁদের জীবন দিয়ে উপলব্ধি করেছেন এ বিষয়টি। শামসুন নাহার মাহমুদ কর্মক্ষেত্রে যেয়ে বুঝতে পেরেছিলেন ক্ষমতায়নের সাথে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সমন্বয় কতটা জরুরি। ১৯৩৯ সালে কলকাতায় 'লেডী ব্রেবোর্ন কলেজ'-এ শামসুন নাহার মাহমুদকে প্রস্তাব দেওয়া হয় এই কলেজের বাংলার অধ্যাপক পদে যোগদান করার জন্য; কিন্তু সমস্যা ছিল তাঁর ডিগ্রি নিয়ে। তিনি ছিলেন বি.এ. পাশ; কলেজের শিক্ষকের এম.এ. ডিগ্রি থাকা আবশ্যক ছিল। বি.এ. পাশ করার দশ বছর পর তিনি এম.এ. ডিগ্রি নেওয়ার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলেন। ১৯৪২ সালে প্রাইভেটে পরীক্ষা দিয়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে কৃতিত্বের সাথে এম.এ. পাশ করেন। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার স্বীকৃতি ক্ষমতায়নের পথে সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে। সুফিয়া কামাল তাঁর জীবনে বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতে যেয়ে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি করেন। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সুযোগ তাঁর জীবনে না ঘটলেও প্রয়োজনের তাগিদে তিনি অনানুষ্ঠানিকভাবেই শিক্ষার আলোয় নিজেকে সমৃদ্ধ করেছিলেন।

বৃত্তিমূলক শিক্ষা

লীলা নাগ তাঁর নারী সংঘে নারীদের কর্মসংস্থানের কথা মাথায় রেখে বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও হাতের কাজের ব্যবস্থা করেছিলেন। নারীদের শিক্ষার পাশাপাশি স্বাবলম্বী হওয়ার বিষয়টি সমান জরুরি। অর্থনৈতিক মুক্তি ও ক্ষমতায়ন নারী সমাজকে মুক্তির পথ দেখাতে পারে। শামসুন নাহার মাহমুদ তুরস্ক ভ্রমণে গিয়ে দেখে এসেছেন সেখানে নারীর শিক্ষা অর্জন ও উপার্জনের ক্ষেত্রে বাধা নেই। তারা বৃত্তিমূলক শিক্ষা গ্রহণ করে নিজেরা কাজ করে যাচ্ছেন। আমেরিকা ভ্রমণেও শামসুন নাহার মাহমুদ দেখেছেন সেখানে পুরুষের পাশে নারী সমগতিতে কাজ করে যাচ্ছে। কোন কাজকে তারা ছোট করে দেখে না। শ্রম মানেই সম্মানের। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, ব্যাংক, কলকারখানা, শিল্প প্রতিষ্ঠান, সাংবাদিকতা ইত্যাদি সব ধরনের পেশায় নারীরা পুরুষের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। পোশাকশিল্পে দেখা যায় উন্নত দেশগুলো আমাদের অদক্ষ শ্রম শক্তির সুযোগ কাজে লাগিয়ে সুলভ মূল্যে কাজ করিয়ে নিয়ে যায়। অথচ দক্ষ ও সচেতন শ্রম শক্তি থাকলে শ্রমিকদের শোষণ অনেকাংশে কমে যেত; বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হতো বেশি।

নারী সমাজ প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত যেমন হবে তেমনি সে শিক্ষার প্রয়োগে বিভিন্ন পর্যায়ে তাদের কাজ করতে হবে। সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাজের পাশাপাশি রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও নিজেদের সম্পৃক্ত হতে হবে। এক্ষেত্রে শামসুন নাহার মাহমুদের কথা প্রাসঙ্গিকভাবেই চলে আসে। তিনি শিক্ষকতা করতেন শুরুতে। তারপর তিনি নিজেকে রাজনীতির সাথে যুক্ত করেন। নারীর জন্য তিনি সামাজিক কাজের মাধ্যমে কাজ করে গেছেন কিন্তু নারী জাতির জন্য দেশে যত আইন, প্রকল্প, নীতি নির্ধারণ করা হয় তা করা হয় রাজনীতিকদের দ্বারা। তাই নারী সমাজ নিজেদের উন্নয়নের দিকে ধাবিত হতে চাইলে নিজেরদের সমস্যা ও সমাধানের জন্য নিজেদের এগিয়ে আসতে হবে সবার অগ্রভাগে। রাষ্ট্রের নীতি নির্ধারণ বড় একটি ভূমিকা পালন করে নাগরিক জীবনে। মানুষ সাধারণত রাষ্ট্রের নিয়মের বিরুদ্ধে যাওয়ার সাহস করে না। নারীর উপর মন গড়া নিয়ম চাপিয়ে দেওয়া সহজ হবে না তখন। দেশে নারীদের বাল্য বিবাহ, যৌতুকপ্রথার উপর আইনি ব্যবস্থা করা হয়েছে। বর্তমানে বাল্য বিবাহ ও যৌতুকপ্রথার এই অবস্থার হার অনেকটা কমে এসেছে। একের সমস্যা অন্যে উপলব্ধি করতে পারে না। নারী সমাজের সমস্যার কথা রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে তুলে ধরতে হলে নারী সমাজের প্রতিনিধি সেখানে থাকা জরুরি। শামসুন নাহার মাহমুদ কখনো সমাজকর্মী হয়ে, কখনো লেখিকা হয়ে, কখনো শিক্ষক হয়ে, কখনো রাজনৈতিক অঙ্গনে জনপ্রতিনিধি হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন নারী সমাজের পাশে।

শিশু শিক্ষা

নারীর শিক্ষা শুধু নারীর জীবনের গণ্ডিতেই সীমাবদ্ধ থাকে না। নারী জীবনের বৃহৎ পরিসর জুড়ে থাকে মাতৃত্ব। একটি শিশুর বেড়ে ওঠার ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা থাকে মায়ের। মায়ের শিক্ষা ও সচেতনতার গণ্ডি যত অধিক হবে তাঁর সন্তানের পরিচর্যা ও মানস গঠনে সেটি সেরূপ ভূমিকা পালন করবে। শিশু সবচেয়ে বেশি সময় তার মায়ের সংস্পর্শে থাকে। মায়ের দৃষ্টিভঙ্গি শিশুর মধ্যে নৈতিকবোধ, মূল্যবোধ, শৃঙ্খলা, স্নেহ-মমতা, সত্যপরায়ণতা তৈরি করতে মুখ্য ভূমিকা পালন করে। তাই নারীর শিক্ষার অঙ্গন উন্মুক্ত না হলে পরবর্তী প্রজন্ম বাধাগ্রস্ত হবে। মা সচেতন না থাকলে শিশুর পরিচর্যায় ফাঁক থেকে যাবে। নারী সমাজে শিক্ষা, সচেতনতার সাথে চিন্তা ও বোধের বিষয়টিরও উন্মেষ ঘটাতে হবে। চিন্তার মুক্তি না ঘটলে নারী জীবনে পরিবর্তন আসবে না, সাথে নারীও কারো জীবনে পরিবর্তন ঘটাতে পারবে না।

এই বিষয়টি লীলা নাগ, শামসুন নাহার মাহমুদ এবং সুফিয়া কামাল– তিনজনের জীবনে আলোকপাত করলেই আমরা দেখতে পাই। তিনজনের বেড়ে ওঠা, মানস গঠনে মায়ের ভূমিকা কতটা– তা আমরা আগেও আলোচনা করেছি। সমাজের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে পথ চলার প্রেরণা ও সাহস প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে পেয়েছিলেন মায়েদের কাছ থেকে। মায়েদের দূরদর্শী চিন্তা ও মনন গভীর ছিল বলেই তিনজন নারী তাঁদের কর্মক্ষেত্রে অটল, অবিচল এবং নির্ভীক ছিলেন।

বর্তমানে নারীর শিক্ষা ও ক্ষমতায়ন

লীলা নাগ এই অবিভক্ত বাংলার মাটিতে নারীর অচলায়তন জীবনের যে টানাপড়েন ও মুক্তির চাপা আকুতি প্রত্যক্ষ করেছেন– সে কারণে তিনি নারীর মুক্তির জন্য আজীবন কাজ করে গেছেন। নিজের জীবন দিয়ে প্রত্যক্ষ ও উপলব্ধি করেছেন তিনি নারী জীবনের এই মুক্তির পথ শিক্ষার আলোর পথ ধরে প্রসারিত হতে পারে। শিক্ষাই পারে মানুষকে সংকীর্ণ চিন্তা থেকে প্রগতির দিকে নিয়ে যেতে। শিক্ষার পাশাপাশি শিক্ষার বাস্তবিক প্রয়োগের মাধ্যমে ক্ষমতায়ন ও আর্থিক মুক্তির মাধ্যমেই নারীর মুক্তির পথ আরও সুদৃঢ় হতে পারে। লীলা নাগ তাঁর কর্ম জীবনে নারীর জন্য শিক্ষা ও জীবনের কর্ম ক্ষেত্রে সেই শিক্ষার প্রয়োগ এবং হাতে কলমে শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়গুলো এবং দীপালি সংঘ এই বিষয়ে প্রকৃষ্ট প্রমাণ। শুধু পুঁথিগত শিক্ষার গণ্ডিতে তিনি নারীর জীবনকে দেখতে চাননি। সাহিত্য-সংস্কৃতির চর্চায় নারীর মন ও মননের বিকাশকেও তিনি সমান গুরুত্বের সাথে দেখেছেন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে নারীর জীবনের বহুবছরের শৃঙ্খলকে ছিন্ন করার শক্তি সামর্থ্য নারীকে কেবল প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ও পুঁথিগত জ্ঞান দিতে পারবে না। নারীর অচলায়তন জীবনের পরিবর্তন আনতে হলে শুধু সামাজিক বা অর্থনৈতিক দিকে ক্ষমতায়ন করলেই চলবে না। দেশ তথা রাষ্ট্রের নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রেও নারীর ভূমিকা থাকা আবশ্যক। নারী ও পুরুষের সামঞ্জস্যপূর্ণ সমাজ সৃষ্টি করার জন্য অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের পাশাপাশি রাজনৈতিক ক্ষমতায়নও সমান গুরুত্ব। লীলা নাগের জীবন দর্শনের দিকে আলোকপাত করলে দেখতে পাই নারীর জীবনে শিক্ষার পাশাপাশি রাজনৈতিক দর্শন ও মতামত থাকা গুরুত্বপূর্ণ।

শামসুন নাহার মাহমুদের ব্যক্তিজীবন ও কর্মজীবনের দিকে আলোকপাত করলেও আমারা প্রত্যক্ষ করতে পারি নারীর জীবনের মূল প্রতিবন্ধকতাকে দূর করার প্রথম পদক্ষেপ শিক্ষা। শিক্ষার প্রয়োগের মাধ্যমে অর্থনৈতিক মুক্তি নারীকে ধীরে ধীরে ক্ষমতায়নের দিকে অগ্রসর করতে পারে বলেই শামসুন নাহার মাহামুদ স্বীয় জীবনে প্রত্যক্ষ করেছেন। অর্থনৈতিক মুক্তির পরেও নারীর জীবনে একই সাথে রাজনৈতিক মতাদর্শের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে বলে শামসুন নাহার মাহমুদের জীবনদর্শন থেকে জানতে পারি।

সুফিয়া কামাল একাধারে বাংলাদেশের সামাজিক-সাংস্কৃতিক আন্দোলন ও নারী আন্দোলনের পথিকৃৎ এবং অন্যতম কবি। তাঁর ব্যক্তিত্বের দৃঢ়তা ভাষায় বর্ণনা করা অত্যন্ত দুরূহ কাজ। সুফিয়া কামালের ব্যক্তিত্ব কোন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার ফসল নয়। জীবন চলার পথে প্রতিটি পদক্ষেপ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে নিজেকে তিনি প্রতিষ্ঠিত করেছেন। প্রকৃতি ছিল তাঁর মুখ্য শিক্ষাগার। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা না থাকলেও তিনি স্বশিক্ষিত ছিলেন। তাঁর জীবনের চলার পথে তিনি জ্ঞান আহরণের স্পৃহা হারাননি। এই ইচ্ছা ও ধীশক্তি তাঁর চলার পথে সহায়ক হয়েছে। বর্তমান বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার দিকে তাকালে দেখতে পাই, বর্তমানে বাংলাদেশে শিক্ষার হার বেড়েছে অনেক। প্রতিবছর হাজার হাজার ছেলেমেয়ে জিপিএ ফাইভ পেয়ে পাবলিক পরীক্ষাগুলো অতিক্রম করছে। কিন্তু সেই শিক্ষা পর্যাপ্ত আলো ছড়াতে পারছে না। মধ্যযুগীয় মানসিকতার বৃত্তকে ভেঙে

মুক্তচিন্তা বিকশিত হচ্ছে না। শিক্ষার্থীদের ভেতরের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ লক্ষ করা যাচ্ছে না সেভাবে। বর্তমান সমাজে আদর্শের যে শূন্যতা তৈরি হয়েছে, তার জন্য এখনই প্রয়োজন জরুরি পদক্ষেপ নেওয়া। এক্ষেত্রে সুফিয়া কামাল নিশ্চিতভাবেই প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠেন। তিনি সোভিয়েত ইউনিয়নে যখন গিয়েছিলেন সেখানে তিনি দেখেছিলেন শিক্ষা ও যোগ্যতার সুষম বণ্টন। সেদেশের মানুষের মধ্যে শিক্ষা ও যোগ্যতার পাশাপাশি মানবিক দিকটিও একই সাথে ফুটে উঠেছে। তিনি চেয়েছেন বাংলাদেশেও সুন্দর একটি শিক্ষা ব্যবস্থা হোক যেখানে শিক্ষা ও সংস্কৃতির চর্চা থাকবে।

সংস্কৃতি চর্চা

শিক্ষার পাশাপাশি সংস্কৃতির চর্চার গুরুত্ব বাল্যকাল থেকেই লীলা নাগ জেনেছিলেন। যেহেতু ব্রাহ্ম পরিবারে জন্ম সেই সুবাদে সাহিত্য সংস্কৃতির চর্চার মধ্য দিয়ে বেড়ে উঠেছেন তিনি। লেখাপড়ার পাশাপাশি গান, অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেছেন শিক্ষাজীবনে। পুঁথিগত শিক্ষার বাইরেও একটা দিগন্ত উন্মোচন করে সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চা। মানব মনের দ্বার উন্মোচন করে এবং দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করে। তিনি তাঁর প্রতিষ্ঠিত নারী সংঘ ও বিদ্যালয়গুলোতে সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চার সুব্যবস্থা রেখেছিলেন। অসূর্যস্পর্শা নারীর মনের উন্মেষ ঘটাতে গেলে শুধু পাঠ্যবই যথেষ্ট নয়; পাশাপাশি চাই সংস্কৃতির চর্চা।

তাছাড়া সুফিয়া কামাল এই দর্শনে ছিলেন— বইয়ের শিক্ষার পাশাপাশি প্রকৃতি থেকে শিক্ষা লাভ করা। প্রকৃতির কাছাকাছি না আসলে তার শিক্ষা ও জ্ঞান পরিপূর্ণ হতে পারে না। বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় একটি শিশু সুকুমারবৃত্তি চর্চা করার সুযোগ পাচ্ছে না, খেলাধুলার সুযোগ পাচ্ছে না, বইয়ে মুখ গুজে পরে থাকতে হচ্ছে তাকে। গ্রেড পাওয়ার অসুস্থ প্রতিযোগিতার শিকার হচ্ছে তারা। যা সুস্থ, সুন্দর ও সুশীল সমাজে কখনোই কাম্য নয়। সুফিয়া কামাল পিতা-মাতাদের আহ্বান করেছিলেন শিশুকে স্বাধীনভাবে বেড়ে উঠতে দেওয়ার জন্য। স্বাভাবিক গতিতে শিশু বেড়ে উঠবে, মানসিক বিকাশও হবে সঠিকভাবে। গবেষকের দৃষ্টিতে তাঁর এ দর্শন বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়েও অনেক বেশি প্রাসঙ্গিক বলে মনে হয়।

নারীর শিক্ষার সাথে সাথে বোধকে উন্মোচিত করতে হবে। মনকে তৈরি করতে হবে– চিন্তা করতে, ভালো মন্দ ভেদ বুঝতে। সাহিত্য-সংস্কৃতির চর্চা মানুষের মনকে পরিশীলিত করে। বর্তমানে আমাদের সমাজে সাম্প্রদায়িক মনোভাব যে পর্যায়ে পৌঁছেছে সেখান থেকে শিক্ষার কার্যকারিতা প্রকাশিত হচ্ছে না। ১৯৬৮ সালে প্রতিষ্ঠিত ছায়ানট বাঙালি সংস্কৃতির চর্চা করে চলছে। সুফিয়া কামালের এই প্রতিষ্ঠানের অবদান অনস্বীকার্য। সুফিয়া কামাল একজন ধার্মিক নারী ছিলেন। ধর্ম মেনে চলতেন, কিন্তু সাম্প্রদায়িক মনোভাব কখনো লালন করেননি। তাঁর কোন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ছিল না, তিনি ছিলেন স্বশিক্ষিত। কিন্তু তাঁর মানসিকতায় শিক্ষার প্রকাশ ছিল সর্বক্ষেত্রে। জীবনের শুরু থেকেই তিনি অসাম্প্রদায়িক মানসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। সম্মান করেছেন সকল ধর্মকে, সকল মানুষকে। মানবিক চেতনাই তাঁর কাছে মুখ্য হয়ে উঠেছিল সবসময়। বর্তমান সমাজের দিকে তাকালে ধর্মে ধর্মে যে হানাহানি তা আমাদের মধ্যযুগীয় অবস্থা মনে করিয়ে দেয়। আধুনিক সময়ে দাঁড়িয়ে যে অন্ধকারে আমরা নিমজ্জিত তা থেকে প্রকৃত শিক্ষার আলোই পারে মুক্তি দিতে।

লীলা নাগ, শামসুন নাহার মাহমুদ এবং সুফিয়া কামাল এই তিন জন ব্যক্তিত্ব নারীবাদী আন্দোলনের সাথে জড়িত ছিলেন কিন্তু তাঁকে নারীবাদী না বলে মানবতাবাদী বলে অভিহিত করাই শ্রেয়। বর্তমান সমাজে মানুষের প্রতি মানুষের সহিংসতা নির্মম থেকে নির্মমতর হয়ে উঠছে, তা শুধু নারীর প্রতি নয়। নারী ও শিশুর প্রতি যে বীভৎস আচরণের চিত্র প্রায় প্রতিদিন

আমরা দেখছি তাতে মানবতাকে ক্ষুণ্ণ করা হয়, খেঁতলে দেওয়া হয়। আমরা দেখেছি যখনি মানুষের উপর অন্যায়-অবিচার হয়েছে তখনি লীলা নাগ, শামসুন নাহার মাহমুদ এবং সুফিয়া কামাল প্রতিবাদ করেছেন বলিষ্ঠ কণ্ঠে। আজ তাঁদের পথের দিশারী হয়ে রুখে দাঁড়াতে হবে নারী, শিশু তথা মানুষের প্রতি সমাজের এসব বর্বরতা। সমাজের এসব বর্বরতা আমাদের সভ্য সমাজের সামনে লজ্জা হয়ে প্রতিভাত হচ্ছে। বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে এই তিনজন ক্ষণজন্মা মানুষের জীবন দর্শনকে অনুসরণ করা একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে জানা যায় তিনজন নারী ব্যক্তিত্বই নারীমুক্তি আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিলেন। কিন্তু তাঁদের নারীবাদী বলা শুধু ভুল নয়, অন্যায়। তাঁরা কখনোই পৃথক একপেশে নারী সমাজ কিংবা পৃথক একপেশে পুরুষ সমাজ চাননি। তাঁরা নারী পুরুষের সম্মিলিত সুস্থ সমাজ চেয়েছিলেন। নারী পুরুষ উভয়ে নিজ নিজ অবস্থানে কাজ করে যাবেন। লীলা নাগ, শামসুন নাহার মাহমুদ এবং সুফিয়া কামাল তিনজনের ব্যক্তি জীবনে দেখতে পাই পুরুষের সহযোগিতা না থাকলে তাঁদের বন্ধুর পথ চলা আরও কঠিন হয়ে উঠত। লীলা নাগের নিজের জীবনে পিতা গিরিশচন্দ্র নাগের সহযোগী মনোভাব না থাকলে পড়াশোনা, বিপ্লবী কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হতো না। তাঁর স্বামী অজয় রায় তাঁর পাশে ছিলেন বিপ্লবী কাজের সাথী হয়ে। পুরুষের সহযোগী মনোভাব না থাকলে শুধু নারী এগিয়ে যেতে পারে না। শামসুন নাহার মাহমুদের জীবনে তাঁর মাতামহ খান বাহাদুর আবদুল আজিজ, বড় ভাই হবীবুল্লাহ বাহার এবং স্বামী ওয়াহিদ উদ্দিন মাহমুদের সাহায্য না থাকলে শামসুন নাহার মাহমুদের শিক্ষা লাভের পথ বন্ধ হয়ে যেত। সুফিয়া কামালের জীবনেও তাঁর প্রথম স্বামী সৈয়দ নেহাল হোসেনের হাত ধরে পথ চলা শুরু, তারপর তাঁর দ্বিতীয় স্বামী কামাল উদ্দিন খান সুফিয়া কামালের পাশে সব সময় ছিলেন। নারী জীবনের উন্নয়নে, শিক্ষা ও ক্ষমতায়নে পুরুষ সমাজের সহযোগী মনোভাব না থাকলে পরিবার থেকে শুরু করে সমাজ, রাষ্ট্রের কোন স্তরেই কখনো নারীর অবস্থান পরিবর্তন হবে না।

শুরুতেই নারী হয়ে কেউ জন্মায় না। মানুষের পারিপার্শ্বিক সামাজিক পরিবেশ, রীতিনীতি, দর্শন, সংস্কৃতি, প্রথা তাকে নারী করে তোলে। নারী পুরুষের বিভেদ তৈরি করে সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি। নারীকে পরিবর্তনের বাহক বলে মনে করা হয়। নারীর উন্নয়নের ধারার উপর নির্ভর করে সমাজ ও রাষ্ট্রের কীরূপ পরিবর্তন ঘটবে। সেক্ষেত্রে নারী জাতির শিক্ষা ও ক্ষমতায়ন রাষ্ট্রের ইতিবাচক পরিবর্তনে ভূমিকা পালন করে।

তথ্য নির্দেশ

১. খানম, আয়েশা (২০১৫), *নারীর মানবাধিকার ও ক্ষমতার পথে,* ঢাকা: আগামী প্রকাশনী।

২. প্রাগুক্ত।

৩. প্রাগুক্ত।

৪. প্রাগুক্ত।

৫. প্রাগুক্ত।

৬. আকবর, শ্যামলী এবং অন্যান্য (১৯৯৮), *নারীশিক্ষা উদ্ভব ও বিকাশ,* ঢাকা: স্টুডেন্ট ওয়েজ।

৭. মোসলেম, সীমা (সম্পা.) (২০১৩), *বাংলাদেশের নারী নির্যাতন পরিস্থিতি গবেষণা প্রতিবেদন ২০১২,* ঢাকা: মহিলা পরিষদ।

৮. *নারী নির্যাতন রিপোর্ট, ২০০০, ২০১০, ১০১৫, ২০১৯,* ঢাকা: আইন ও সালিশ কেন্দ্র।

৯. মোহান্ত, দীপংকর (১৯৯৯), *লীলা নাগ ,* ঢাকা: বাংলা একাডেমী।

পঞ্চম অধ্যায়

গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল

লীলা নাগ

১. লীলা নাগ নারী সমাজের পশ্চাদপদতার বেড়াজাল ছিন্ন করতে শিক্ষাকে মূল হাতিয়ার করেছিলেন। তাই নারী জাতির উচ্চশিক্ষার সুবিধার জন্য তিনি আন্দোলন করেছিলেন। নারীর প্রতি সমাজের সংকীর্ণ চিন্তাকে তিনি কখনো প্রশ্রয় দেননি।

২. তাঁর সংগ্রামী জীবনে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সমাজ একই সূত্রে গাঁথা। তাই নারীর মুক্ত, সুস্থ-'মানুষ' হিসেবে বাঁচার পরিবেশ আনতে হলে প্রয়োজন তাঁর শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং সমাজের সাথে নিবিড় পরিচিতি।

৩. গবেষণালব্ধ ফলাফলে প্রতীয়মান হয়, লীলা নাগ দেশের পরাধীনতা ঘোচাতে নারী ও পুরুষকে একত্রে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন যেমন, তেমনি সমাজে নারীর পরাধীনতা ঘুচাতে হলেও নারী-পুরুষকে একত্রে এগিয়ে আসার মনোভাব সৃষ্টি করার কথাও বলেছেন।

৪. তিনি নারীদের শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় স্থাপনার ব্যবস্থা করেছিলেন। কেবল এতেই থেমে থাকেননি তিনি। বয়স্ক নারীদের জন্য শিক্ষা ও কাজের ব্যবস্থা করেছেন। হাতের কাজ, কুটির শিল্পের কাজের ব্যবস্থা করে, তার মধ্য দিয়ে তিনি নারীর অর্থনৈতিক মুক্তির ব্যবস্থাও করে দিয়েছিলেন।

৫. দীপালি সংঘের মূলধন দিয়ে দীপালি ভাণ্ডার খোলা হয়েছিলো। সমাজ পরিত্যক্ত নারীদের তিনি তাঁর সংঘে ঠাঁই দিয়েছিলেন। তাদের জীবনকে কাজে লাগিয়েছিলেন সমাজের অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর জন্য।

৬. গবেষণার ফলাফলে লক্ষণীয়, নিজ সংস্কৃতির সাথে পরিচয় না ঘটলে দেশপ্রেম জাগ্রত হয় না। পরাধীন ভারতবর্ষকে স্বাধীন করার লক্ষ্যে লীলা নাগ নারী সমাজকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ ও সচেতন করতে চেয়েছেন। তাই তাঁর দীপালি সংঘে নারীদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি তাদের শারীরিক ও মানসিক উন্নয়নের জন্য ব্যায়াম, খেলাধুলা, সঙ্গীত, অভিনয় ইত্যাদি বিষয়েও শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়।

৭. সম্মিলিতভাবে বৃক্ষরোপণ, সব্জিবাগান করা, বয়স্ক মহিলাদের স্বদেশ-ধর্ম চিন্তায় উদ্বুদ্ধকরণ, বাল্যবিবাহরোধ, অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ ও মেয়েদের স্কুলে পাঠানো এসকল কাজের মধ্যে একটি কাজ দীপালি সংঘের সদস্যদের করতেই হতো। দীপালি সংঘের এসব কার্যক্রম ছিল নারী সমাজকে সবদিক থেকে চার দেয়ালের বাইরের জগৎ ও প্রকৃত সংঘর্ষের সাথে পরিচয় করানো।

৮. অবরুদ্ধ নারী সমাজের জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধির উপায় হিসেবে লীলা নাগ পাঠাগার স্থাপন করেছিলেন। মেয়েদের প্রগতিশীল মানস গঠন, স্বদেশপ্রেম জাগ্রত করা, সমাজের কুসংস্কার-কূপমণ্ডূকতা দূরীভূত করে বিজ্ঞানমনস্ক করে তোলার ক্ষেত্রে পড়াশোনার বিকল্প নেই— তা উপলব্ধি করে দীপালি সংঘের উদ্যোগে মেয়েদের জন্য পাঠাগার তৈরি করা হয়েছিলো। পাঠাগারে সামসময়িক পত্রিকার সংগ্রহ ছিল যথেষ্ট। এই উদ্যোগটি ছিল সমকালীন বাস্তবতার সাথে মেয়েদের পরিচয় করানোর জন্য।

৯. দীপালি সংঘের উদ্যোগে 'নারী রক্ষা ফান্ড' গড়ে তোলা হয়েছিলো। বিধবা, স্বজনহীন বৃদ্ধা, সমাজকর্তৃক বহিষ্কৃত নারী, ধর্ষিতা, নিপীড়িত নারীদের জীবন রক্ষা ও সাহায্যের জন্য এই ফান্ড গড়ে তোলেন লীলা নাগ। এসব নারীদের শিক্ষার পাশাপাশি আত্মরক্ষার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও করেন তিনি।

১০. বাংলার প্রথম ছাত্রী সংগঠন গড়ে ওঠে লীলা নাগের হাত ধরে। উনিশ শতকের শুরুর দিকে রাজনৈতিক সংগঠন ও তাদের কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ নারীদের পক্ষে কষ্টসাধ্য ছিল। সে অবস্থায় 'দীপালি সঙ্ঘ' এক উপযুক্ত এবং পরিমার্জিত সংগঠন হিসেবে ছাত্রীদের সুযোগ করে দিয়েছিলো নিজেদের দাবি ও মতামত প্রকাশ, সামাজিক, রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশ নেওয়ার। বেথুন কলেজ, ইডেন হাইস্কুল, জগন্নাথ কলেজ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এই সংঘের কাজ কর্মের পরিধি ছিল বিশাল।

১১. লীলা নাগের চিন্তা ও কর্ম ছাপিয়ে এত বছরেও কেন কোন উদ্যোক্তা তাঁর স্থান নিতে পারলেন না তা নিয়ে কোন চিন্তা আমরা করি না। কিন্তু সময় কড়া নাড়ছে ভেবে দেখার জন্য। কর্মের পরিচয়ে মানুষের মূল্যায়ন করা জরুরি, জন্মের পরিচয়ে নয়। আমাদের মানসিকতার পরিবর্তন না হলে চিন্তা আর কর্ম-উদ্যোগে কোন কিছুই পরিবর্তিত হবে না।

শামসুন নাহার মাহমুদ

১. নারী সমাজের শিক্ষা ও ক্ষমতায়নের কাজে বেগম রোকেয়ার কাছে শামসুন নাহার মাহমুদের হাতেখড়ি। তাঁর জীবনে বেগম রোকেয়ার আদর্শ ও দর্শনের প্রভাব যে প্রবল তা লক্ষ করা যায়। বেগম রোকেয়া কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'আঞ্জুমনে খাওয়াতীনে ইসলাম' ছিল তাঁর কাজের প্রেরণা।

২. বাংলার নারী সমাজের জন্য 'আঞ্জুমনে খাওয়াতীনে ইসলাম' ছিল নারীদের অসূর্যম্পশী অন্ধকার জীবনে এক আলোকবর্তিকা স্বরূপ। বেগম রোকেয়া নিজে শামসুন নাহার মাহমুদকে উত্তরাধিকার হিসাবে 'আঞ্জুমনে খাওয়াতীনে ইসলাম' এর কাজে প্রত্যক্ষভাবে সম্পৃক্ত করেছিলেন। বেগম রোকেয়ার অকাল প্রয়াণের পর এই সংগঠনের দায়িত্ব শামসুন নাহার মাহমুদ নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন।

৩. শামসুন নাহার মাহমুদ চেষ্টা করেছিলেন বেগম রোকেয়ার অসম্পূর্ণ কাজগুলো সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে। বাঙালি মুসলিম নারীদের বিশেষ করে বস্তির মেয়েদের পড়াশোনা শেখানো, হাতের কাজ শেখানো যাতে তাদের মধ্যে সচেতনতার সৃষ্টি হয় এবং তাদের দক্ষতা যেন আর্থিকভাবে কাজে লাগতে পারে, সেটি ছিল 'আঞ্জুমনে খাওয়াতীনে ইসলাম' এর উদ্দেশ্য।

৪. ১৯৩৪ সালে কলকাতায় নিখিল ভারত নারী সম্মিলনের বার্ষিক অধিবেশনে শামসুন নাহার মাহমুদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। সে সময় বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় অবৈধ নারী ব্যবসা দমন প্রসঙ্গে Immoral Traffic Bill পেশ করা হয়। এই বিলের স্বপক্ষে নারীদের মতামত সৃষ্টি করার জন্য তিনি তখন নারী সমাজে ব্যাপক আন্দোলন চালিয়েছিলেন।

৫. শামসুন নাহার মাহমুদ ছিলেন তখনকার সময়ের একজন রাজনীতি সচেতন নারী এবং সক্রিয় রাজনীতিক। গবেষণার ফলাফলে লক্ষণীয়, শামসুন নাহার মাহমুদ বুঝতে পেরেছিলেন, নারীকে শুধু পারিবারিক ও সামাজিকভাবে সচেতন করা ও

সুদৃঢ় করার সাথে সাথে রাজনৈতিকভাবে সচেতন ও সম্পৃক্ত করতে না পারলে রাষ্ট্রের সিদ্ধান্ত ও কাজে নারীর প্রবেশাধিকার রদ থাকবে।

৬. নারীদের সার্বজনীন ভোটাধিকারের জন্য বাংলায় প্রবল আন্দোলনের পুরোভাগে ছিলেন শামসুন নাহার মাহমুদ।

৭. নারীদের শিক্ষা ও ক্ষমতায়নের সাথে সাথে তাদের নিরাপদ সামাজিক জীবন নিয়েও সোচ্চার হয়েছিলেন শামসুন নাহার মাহমুদ। নারীর উপর সমাজের অনৈতিক কার্যক্রমের বিপক্ষে তিনি ছিলেন সর্বদা দৃঢ় ও অটল অবস্থানে।

৮. গবেষণার ফলাফলের ভিত্তিতে বলা যায়, শামসুন নাহার মাহমুদ ছিলেন মুক্ত চিন্তক ও অসাম্প্রদায়িক। তাঁর জীবনে বেগম রোকেয়া এবং কাজী নজরুলের প্রভাব তাঁকে মুক্ত চিন্তা করার দিগন্ত দিয়েছিলো। মানুষের সংকটে সবসময় শামসুন নাহার মাহমুদ নিঃস্বার্থভাবে পাশে থেকেছেন। ধর্ম-বর্ণ দিয়ে চিন্তা করেননি কখনো। নিজের মুক্ত চিন্তাকে সবার মাঝে প্রকাশ করার লক্ষ্যে শুরু করলেন সাময়িকপত্র 'বুলবুল'।

৯. আধুনিক ও মুক্তচিন্তা, প্রগতিপন্থী মুসলমান সমাজের মুখপত্র হিসেবে 'বুলবুল' পত্রিকা তার বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখেছিলো। আর এই পত্রিকার মাধ্যমে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সমাজের নারী-পুরুষের চিন্তা প্রকাশ করার উদাত্ত আহ্বান করেছিলেন শামসুন নাহার মাহমুদ।

১০. রাজনীতি সচেতন শামসুন নাহার মাহমুদ দেশভাগের পূর্বে রাজনীতির সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন না। রাজনীতির সাথে তাঁর সম্পৃক্ততা ছিল সামাজিক কর্মের মধ্য দিয়ে। গবেষণায় শামসুন নাহার মাহমুদের সাহিত্যচর্চা, সমাজকর্মের সাথে তাঁর রাজনীতি সচেতনতার পরিচয় পাওয়া যায়।

১১. গবেষণার মাধ্যমে জানতে পারি, শামসুন নাহার মাহমুদ ব্যক্তিজীবনে বিশ্বাস করতেন যে, শিক্ষাহীন সমাজ নিয়ে দেশকে এগিয়ে নেওয়া সম্ভব নয়। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে শিক্ষার আওতায় আনতে হবে। সমাজে সকলের জন্য শিক্ষা সুনিশ্চিত হলে দারিদ্র, রোগ দুটোই নিয়ন্ত্রণে চলে আসবে। শিক্ষা না থাকলে দক্ষ কর্মীর অভাব হবে ফলে তাদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি কষ্টসাধ্য হবে। অপরদিকে শিক্ষা মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করবে ফলে রোগব্যধি সম্পর্কে প্রতিরোধ ব্যবস্থা নিতে সক্ষম হবে।

১২. শামসুন নাহার মাহমুদের কাজের পরিসর ছিল সমাজ ও দেশের অগ্রগতি নিয়ে; তাঁর এই চিন্তা শুধু রাজনীতির আলোকে ছিল না। শিক্ষার মাধ্যমে সমাজকে উন্নত না করতে পারলে দেশ সামনে এগুতে পারবে না। শিক্ষাক্ষেত্রে অসম সমাজ পদে পদে মুখ থুবড়ে পড়বে। তাই শামসুন নাহার মাহমুদের রাজনৈতিক চেতনা তাঁর সমাজ চেতনার একটি অংশ।

১৩. গবেষণা কর্মটিতে উঠে এসেছে, শামসুন নাহার মাহমুদ নারী-পুরুষের শিক্ষার পাশাপাশি শিশুর শিক্ষা নিয়ে কাজ করেছিলেন। আজকের শিশুরাই আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। শিশুর বেড়ে ওঠার শুরুর অবস্থা থেকেই তার প্রতি যত্নশীল না হলে আশানুরূপ ফল চাওয়া বৃথা। সমাজকে নতুন করে গড়ে তুলতে ব্যক্তিকে তার শিশু অবস্থা থেকেই গড়ে তুলতে হবে। হঠাৎ করে তার পরিবর্তন কষ্টসাধ্য। তাই তাঁর সামাজিক কাজের একটি অংশ ছিল শিশুদের নিয়ে ভাবনা।

১৪. শামসুন নাহার মাহমুদ সমাজের বঞ্চিত শিশুদের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর উদ্যোগে পঙ্গু শিশুদের জন্য পুনর্বাসন কেন্দ্র স্থাপিত হয় ১৯৬১ সালে। তিনি বিশ্বাস করতেন প্রতিটি শিশুই সম্ভাবনাময়, প্রতিটি জীবনই মূল্যবান। সঠিক

পরিচর্যায় তাকে বিকশিত করতে হয়। তারাও যেন নিজেদের জীবনকে গঠন করে দেশের আদর্শ নাগরিক হয়ে উঠতে পারে। তাই তিনি আজীবন শিশুদের জন্য নানা কল্যাণমুখী কাজে নিজেকে সম্পৃক্ত রেখেছিলেন।

১৫. সমাজে নারী ও শিশুর ভবিষ্যতের চিন্তা যেমন শামসুন নাহার মাহমুদকে নাড়া দিয়েছে, তেমনি মানুষের দুঃসময়ে তিনি ছুটে গেছেন সেবাব্রতী মন নিয়ে। তাঁর মানবতাবাদী মনন ছিল সর্বোপরি। দুর্ভিক্ষ, দুর্যোগ, বন্যা, মন্বন্তর, দাঙ্গা যে কোন প্রতিকূল অবস্থায় মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি।

১৬. গবেষণায় শামসুন নাহার মাহমুদের মানবিকতা ও মমত্ববোধের প্রমাণ মেলে দেশভাগের তৎকালীন চিত্রে। দেশ ভাগ-কে কেন্দ্র করে বাংলার বুকে শুরু হয়েছিল দাঙ্গা। সংঘর্ষরত হিন্দু-মুসলমান সবার জীবন তখন বিপন্ন। হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে মানুষকে নিরাপদ আশ্রয় প্রদানের জন্য তিনি 'আঞ্জুমানে খাওয়াতীন ইসলাম' এর কর্ণধার হিসেবে এগিয়ে গেছেন মানুষের পাশে। মানুষের প্রতি মমত্ববোধ থেকেই তিনি দাঙ্গা কবলিত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য ছুটে গেছেন। মানুষের প্রতি গভীর মমত্ববোধ তাঁর ভেতরের মাতৃশক্তির ও মাতৃহৃদয়েরও পরিচায়ক।

১৭। দেশ ভাগ-কে কেন্দ্র করে বাংলার বুকে শুরু হয়েছিল দাঙ্গা। তখন রক্তে প্লাবিত বাংলার মাটি। সংঘর্ষরত হিন্দু মুসলমান-এর জীবন তখন বিপন্ন। হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে মানুষকে নিরাপদ আশ্রয় প্রদানের জন্য তিনি 'আঞ্জুমানে খাওয়াতীন ইসলাম' এর কর্ণধার হিসেবে এগিয়ে গেছেন মানুষের পাশে। মানুষে মানুষে এই হানাহানি মানবতার লাঞ্ছনা। মানুষের প্রতি মমত্ববোধ থেকেই তিনি দাঙ্গা কবলিত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য ছুটে গেছেন। ছিন্নমূল মানুষের পুনর্বাসনের জন্য তিনি কাজ করে গেছেন। তাঁর মানবতাবাদী মনন তাঁকে মানুষের কাজে সম্পৃক্ত রেখেছিল সারা জীবন। এসব কাজের মধ্য দিয়ে দৃষ্টিগোচর হয় শামসুন নাহার মাহমুদের জীবনবোধে মানুষ এবং মানবিকতা যেন সকল সামাজিক কর্মের প্রেরণা হয়ে ছিল। মানুষের প্রতি গভীর মমত্ববোধ তাঁর ভেতরের মাতৃশক্তির ও মাতৃহৃদয়েরও পরিচায়ক।

সুফিয়া কামাল

১. সুফিয়া কামাল ছিলেন এমন একজন মানুষ যার চিন্তা-চেতনা ও মননে শুধু নারী জাগরণের বাণীই অনুরণিত হয়নি; তাঁর জীবনবোধের মুল চেতনা ছিল মানুষের কল্যাণ ও মঙ্গলের জন্য নিজেকে নিবেদিত রাখা। মানুষের উন্নয়নে, রাষ্ট্র ও সমাজে ন্যায় প্রতিষ্ঠার লড়াই তিনি করে গেছেন আজীবন নির্ভীক ও নিরলসভাবে।

২. গবেষণায় দেখা যায়, জন্মের পর থেকেই পারিবারিক গণ্ডিতে নারী পুরুষের যে বৈষম্য সুফিয়া কামাল প্রত্যক্ষ করেছেন সেখান থেকেই তিনি নারী সমাজের অগ্রগতি ও অধিকারের জন্য কাজ করার প্রেরণা পেয়েছিলেন। তিনি তাঁর মায়ের অবরুদ্ধতা, বিপর্যস্ততা প্রত্যক্ষ করেছিলেন। দেখেছিলেন অসহায় জীবনযাপন করতে। সে পরিস্থিতি থেকে নারী সমাজকে বের করে আনার তাগিদ অনুভব করেন তিনি।

৩. গবেষণার ফলাফলে লক্ষণীয়, সুফিয়া কামাল চিরায়ত বাঙালি সংস্কৃতিকে ধারণ করেছিলেন গভীরভাবে। নিজ সংস্কৃতিকে না জানলে, নিজের শিকড়ের সাথে সম্পর্ক না থাকলে মানুষ ও সমাজের প্রতি যথেষ্ট শক্তিশালী বন্ধন তৈরি হয় না। সুফিয়া কামাল সবসময় সংস্কৃতি চর্চার ব্যাপারটিকে সকল স্তরে ছড়িয়ে দেয়ার জন্য সচেষ্ট ছিলেন। সেই লক্ষ্যেই দেশের বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক সংগঠন বা প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার সাথে তিনি সরাসরি যুক্ত ছিলেন।

৪. গবেষণায় সুফিয়া কামালের সাহিত্য মানসে প্রথমে যে পরিচয়টি পাওয়া যায়— তা হচ্ছে মানবতাবাদ। তাঁর সাহিত্যে সবসময় মুখ্য হয়েছে মানুষ ও তার আবেগ-অনুভূতি, জীবন চলা। তাঁর সাহিত্য মাটি ও মানুষের সাথে নিবিড়ভাবে সম্পর্কযুক্ত। দেশ, মাটি ও মানুষ থেকে নিজেকে কখনো তিনি বিচ্ছিন্ন করেননি।

৫. বিশ শতকের শুরুর দিক থেকেই সুফিয়া কামাল সামাজিক কর্ম-কাণ্ডের সাথে সম্পৃক্ত হয়েছিলেন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সময়ে সমাজে নারীদের অবস্থান ছিল অত্যন্ত গৌণ। সে অবস্থায় তিনি পরিবার ও সমাজের রক্তচক্ষুর ভয়ে পিছ-পা হননি। শুরু থেকেই তাঁর মধ্যে নির্ভীক এক কর্মীসত্তা লক্ষ করা যায়।

৬. গবেষণায় সুফিয়া কামালের জীবনবোধ ও দর্শনের দিকে আলোকপাত করলে দেখতে পাওয়া যায় সুফিয়া কামালের ব্যক্তিত্বে মানবতাবাদ, নৈতিকতা, সমাজবোধ, নান্দনিকতাবোধ, সম্প্রীতিবোধ, স্বদেশপ্রেম ও স্বজাত্যবোধের প্রকাশ। তিনি আজীবন আপসহীন অবিচল ছিলেন অন্যায়ের বিরুদ্ধে।

৭. সুফিয়া কামাল মানুষ ও মনুষ্যত্বের পরিচয়টিকে সর্বদা সর্বোচ্চ আসনে রেখেছিলেন। তিনি কখনো সাম্প্রদায়িক মনোভাব লালন করেননি। আজীবন নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন মানুষের জন্য। জাত-ধর্ম বিচার না করে যেকোনো মানুষের দুঃখ-কষ্টে পাশে দাঁড়িয়েছেন। কাজ করেছেন ধর্মের সত্য, নৈতিকতা ও মূল্যবোধ থেকে।

৮. সুফিয়া কামালের জীবনভাবনায় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আধুনিক ও উদার মানসিকতা, মানবপ্রেমের দর্শনের ব্যাপক প্রভাব লক্ষ করা যায়। তাঁর শিক্ষাচিন্তায় রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শনের প্রতিফলনও দেখা যায়।

৯. গবেষণায় দেখা যায়, সুফিয়া কামাল সমাজে এমন শিক্ষা ব্যবস্থার কথা বলেছেন যা বাস্তব জীবনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। শিক্ষাকে কাজে লাগিয়ে মানুষ জীবনকে পরিশীলিত করবে, কর্মমুখর করবে এমন শিক্ষা চেয়েছিলেন তিনি।

১০. নারীসমাজকে সুফিয়া কামাল তাঁর সময়ের চিন্তাধারায় যে স্বাবলম্বী, বলিষ্ঠ, মানবিক আঙ্গিকে দেখার আহ্বান করেছিলেন, বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়েও তা ততটাই আবেদন রাখে। নারীকে শুধু পুঁথিগত শিক্ষা দিতে বলেননি তিনি; নারীর চেতনাকে জাগ্রত করার, বোধকে জাগ্রত করার কথাও বলেছেন।

১১. সুফিয়া কামাল নারীর ক্ষমতায়নকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। আর এজন্য উৎপাদনবিমুখতা দূর করে উৎপাদন খাতের সাথে নারী সমাজকে যুক্ত করার প্রয়োজনীয়তা মানুষের উপলব্ধিতে আনার জন্য কাজ করে গেছেন। নারীর অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতাকে তিনি খুব জরুরি বলে মনে করেছেন। কেননা অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতার সাথে পরিবার বা সমাজের যে কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা বা অধিকার নির্ভরশীল।

১২. গবেষণায় জানা যায়, সুফিয়া কামালের শিক্ষা ভাবনায় যুগোপযোগিতা বা সময়ের দাবির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ শিক্ষার বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। সেই লক্ষ্যে অচলায়তন থেকে বেরিয়ে এসে নিজের অধিকার বুঝে নেবার প্রতি তাঁর আহ্বান নারীপ্রগতি ও নারীর ক্ষমতায়নে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

১৩. গবেষণায় দেখা যায়, সকল অশুভ, অন্যায়, অসুন্দর ও অকল্যাণের বিরুদ্ধে সুফিয়া কামালের আপসহীন প্রত্যয়দৃঢ় অবস্থান মানুষের বিবেককে দৃঢ়ভাবে পরিচালিত করতে নিঃসন্দেহে শক্তিশালী প্রভাবকের ভূমিকা রাখবে। শুধু সন্তান উৎপাদন বা প্রতিপালন নয়, যে কোন ক্ষেত্রে স্বীয় মেধা ও পরিশ্রমে নারী হয়ে উঠবে স্বনির্ভর ও পরিপূর্ণ যোগ্য নাগরিক।

১৪. সুফিয়া কামাল নারীদের অধিকার আদায়ে লড়াই করেছেন তবে সমাজের পুরুষদেরকেও তিনি আহ্বান করেছেন একসাথে পথ চলতে। কারণ তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, নারী ও পুরুষ একত্রে চললেই জীবন, পরিবার, সমাজ, দেশ তথা আন্তর্জাতিক পর্যায় পর্যন্ত সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব।

১৫. বর্তমান সমাজে নারী ও শিশুর প্রতি যে সহিংস আচরণ তা অত্যন্ত লজ্জাজনক। গবেষণায় জানা যায়, নারী ও শিশুর প্রতি সহিংস আচরণ রোধের দূরদর্শিতা সুফিয়া কামালের চিন্তা-চেতনায় অনেক আগে থেকেই অনুভূত হয়েছিল। সমাজের তরুণদের প্রতি ছিল তাঁর অগাধ আস্থা ও বিশ্বাস। যে কোন সহিংসতা ও দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতিতে তরুণ সমাজকে এগিয়ে আসার জন্য সুফিয়া কামাল উদাত্ত আহ্বান করেছিলেন।

সুপারিশমালা

১. লীলা নাগ, শামসুন নাহার মাহমুদ এবং সুফিয়া কামালকে নিয়ে কাজ করতে গিয়ে তাঁদের বিভিন্ন লেখা ও তাঁদের সম্পর্কিত সমস্ত তথ্য পেতে গবেষককে অনেক বেগ পেতে হয়েছে। সেই অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে গবেষকের মনে হয়েছে, তাঁদের সমস্ত বই, পত্রিকা, নথিপত্র ও অন্যান্য প্রকাশনাকে সহজপ্রাপ্য করার ব্যবস্থা নেয়া আবশ্যক।

২. সরকারি গণগ্রন্থাগারগুলোতে লীলা নাগ, শামসুন নাহার মাহমুদ, সুফিয়া কামালসহ বিস্মৃতপ্রায় ব্যক্তিত্ব সংশ্লিষ্ট বইপত্রাদি প্রাপ্তির নিশ্চয়তা প্রদান করার ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের উদ্যোগ গ্রহণ বাঞ্ছনীয়।

৩. বর্তমান সময়ে সমাজে শিশু ও নারী অপরাধ মারাত্মকভাবে বেড়ে চলেছে। ছোট ছোট কিশোর-কিশোরীরা নানাধরনের অপরাধমূলক কাজের সাথে যুক্ত হয়ে পড়ছে যা খুবই উদ্বেগজনক। অবাধ তথ্যপ্রবাহের এই সময়ে বিজাতীয় সংস্কৃতির প্রভাবও এক্ষেত্রে বড় ভূমিকা রাখছে। মূল্যবোধের চরম অবক্ষয়ের এই সময়ে লীলা নাগ, শামসুন নাহার মাহমুদ এবং সুফিয়া কামালের জীবনভাবনাকে নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের মাঝে ছড়িয়ে দেয়া খুব জরুরি বলে গবেষক মনে করে। এক্ষেত্রে পাঠ্যবইতে তাঁদের বর্ণময় জীবনের ত্যাগ-তিতীক্ষার সত্যি ঘটনা, জীবনী, জীবনদর্শন ও তাঁদের সাহিত্যকর্ম বিভিন্ন আঙ্গিকে সন্নিবেশিত করা যেতে পারে।

৪. বর্তমান সময়ে নারীর প্রতি সমাজের যে দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণ তা খুবই ন্যাক্কারজনক। লীলা নাগ, শামসুন নাহার মাহমুদ এবং সুফিয়া কামালের চেতনায় সমাজে নারীর যে অবস্থানের ঠিকানা পাওয়া যায়— তা সমাজের সামনে আরও ব্যাপক পরিসরে তুলে আনতে হবে। নারী নিজে উপলব্ধি করুক তার জীবনের সাথে কি করণীয় আছে তার নিজের, মূল্যায়ন করতে শিখুক নিজেকে।

৫. বর্তমান সময়ে সমাজে জাতিগত বিভেদ মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে। সাম্প্রদায়িক মনোভাব পরিহার করে একত্রে চলার যে মনোবৃত্তি তা এই গবেষণার তিনজন ব্যক্তিত্ব—লীলা নাগ, শামসুন নাহার মাহমুদ এবং সুফিয়া কামালের জীবনবোধে ফুটে উঠেছে স্পষ্টভাবে, সেই দর্শনের প্রচার ও প্রসার বর্তমান সমাজে সময়ের দাবী।

৬. নারীর উৎপাদন ক্ষমতাকে কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয়ভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করা আবশ্যক। এতে করে নারী সমাজকে দেশের সম্পদে পরিণত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার সুযোগ সৃষ্টি হবে। বর্তমান যুগে শুধু নারী সমাজ নয়, নারী ও পুরুষ উভয়— সমাজের জন্য হাতের কাজ, বৃত্তিমূলক শিক্ষা, কারিগরি শিক্ষার প্রয়োজন।

৭. লীলা নাগ, শামসুন নাহার মাহমুদ এবং সুফিয়া কামালকে নিয়ে সামগ্রিক কাজের উপর উল্লেখ করার মত তেমন কোন গবেষণা হয়নি। গবেষক মনে করেন, এ বিষয়ে আরও ভিন্ন আঙ্গিকে এবং বৃহৎ পরিসরে গবেষণা হওয়া দরকার। সেক্ষেত্রে গবেষণার উপযোগী পরিবেশ ও সবধরনের সহযোগিতার নিশ্চয়তা থাকা প্রয়োজন।

৮. লীলা নাগ এবং শামসুন নাহার মাহমুদের রচনাসমূহ সংরক্ষণের উদ্যোগ নেওয়া আবশ্যক। বই, পত্রিকার সংরক্ষণ না থাকলে গবেষণা কাজ করা কষ্ট সাধ্য হয় এবং পরবর্তী প্রজন্মের কাছে তাঁদের জীবন এবং কাজ অজানা থেকে যাবার

সম্ভাবনা থাকে। এ সমস্ত ক্ষেত্রে শিক্ষা মন্ত্রণালয়, সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় এবং মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা অপরিহার্য।

৯. নারীদের জন্য দীপালি সংঘের মতো সংগঠন গড়ে তোলা অত্যন্ত জরুরি। শিক্ষার পাশাপাশি নারীদের জন্য শারীরিক শিক্ষা, হাতের কাজ, সামাজিক কাজ, দেশাত্মবোধক কাজ, বিনোদনমূলক কাজের সুযোগ রাখা আবশ্যক।

১০. সমাজের চোখে যারা অস্পৃশ্য তাদের জন্য পুনর্বাসন, শিক্ষার সুযোগ, অর্থনৈতিক কাজের সুযোগ তৈরি করার ব্যবস্থা করা আবশ্যক। প্রতিটি মানুষের জীবন মূল্যবান। সমাজ ও দেশের কাজে লাগানোর জন্য তাদের ক্ষেত্র তৈরির দিকে সচেতনতা প্রয়োজন।

১১. সমাজে নারীদের উপর নৃশংস অত্যাচারের যে চিত্র দেখা দৃশ্যমান তাতে নারীদের প্রতিরোধমূলক কৌশল শিক্ষা দেওয়া বাঞ্ছনীয় হয়ে গেছে।

১২. নারীদের শিক্ষা ও কাজের পাশাপাশি রাজনীতি সচেতন হতে হবে। সচেতন না হলে পরিবার থেকে শুরু করে সমাজে, রাষ্ট্রের যে কোন পর্যায়ে অন্যায় অত্যাচার সম্পর্কেও বুঝতে পারবে না এবং এই শোষণের প্রতিবাদও করতে পারবে না। বর্তমানে নারীর কর্মক্ষেত্রে অংশগ্রহণ তুলনামূলক কিছুটা বাড়লেও রাজনীতির ক্ষেত্রে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ আরও দৃঢ় করা জরুরি।

১৩. প্রাথমিক, মাধ্যমিক থেকে উচ্চস্তর পর্যন্ত লীলা নাগ, শামসুন নাহার মাহমুদ এবং সুফিয়া কামালের লড়াই, কর্ম, উদ্যোগ, দেশপ্রেম, জীবনবোধ ও দর্শন শিক্ষাক্রমের মাধ্যমে পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত করে ভবিষ্যৎ শিক্ষার্থীদের চেতনা ও মননে ছড়িয়ে দিতে হবে। শিক্ষার্থীর বয়স ও উপযোগিতা বিবেচনা সাপেক্ষে সেটি করতে পারলে সমাজে এর গভীর ইতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি করতে সহায়ক হতে পারে।

১৪. সমাজ, দেশ ও জাতির জন্য যারা সারা জীবন কাজ করে গেছেন তাঁদের নাম জন্ম বার্ষিকী, প্রয়াণ দিবস প্রভৃতিতেই যেন সীমাবদ্ধ না থাকে। বইয়ের পাতায় সবাইকে স্থান না দিতে পারলেও বিভিন্ন সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, আলোচনা সভার মাধ্যমে তাঁদের কীর্তি মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়।

১৫. নারীর শিক্ষা ও ক্ষমতায়নের ভাবনাগুলোকে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে বিভিন্ন মাধ্যমে প্রচারণার মধ্য দিয়ে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া অত্যাবশ্যক। তা বর্তমান অস্থিরতা, হিংসা হানাহানির সংস্কৃতি থেকে সমাজ, দেশ ও জাতিকে বেরিয়ে আসতে সাহায্য করবে।

১৬. সমাজ, দেশ ও জাতির জন্য যারা সারা জীবন কাজ করে গেছেন তাঁদের নাম, জন্মবার্ষিকী, প্রয়াণ দিবস প্রভৃতিতেই যেন সীমাবদ্ধ না থাকে। বইয়ের পাতায় সবাইকে স্থান না দিতে পারলেও বিভিন্ন সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, আলোচনা সভার মাধ্যমে তাঁদের কীর্তি মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

১৭. আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও কারিগরি শিক্ষার কোন বিকল্প নেই। আমাদের দেশে শ্রমমূল্য বিশ্বশ্রম বাজারে অনেক সুলভ, বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে দক্ষ শ্রম শক্তি তৈরি করতে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার উপর জোর দেওয়া প্রয়োজন।

১৮. সুফিয়া কামালের ভাবাদর্শকে লালন করেই একটি ইতিবাচক সমাজ ও রাষ্ট্র বিনির্মাণের দিকে অগ্রসর হতে পারি আমরা। তিনি চেয়েছিলেন শিক্ষা শুধু পুঁথিগত হবে না তার প্রয়োগ থাকতে হবে বাস্তবে। সুফিয়া কামাল যে ধরনের জীবনদর্শন মেনে চলতেন তা থেকে আমাদের অনেক কিছু শিক্ষণীয় রয়েছে।

উপসংহার

আমাদের দেশে নারী জাতির পরিবর্তনের লক্ষ্যে এই গবেষণা। আমাদের সমাজ ও দেশের উন্নয়নের প্রধান অন্তরায় নারী-পুরুষের বৈষম্যমূলক সমাজ ব্যবস্থা। নারীর অধিকার ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় নারী-পুরুষের উঁচু-নিচু বৈষম্য ভুলে সুস্থ সমাজ গড়ার লক্ষ্যে সবাইকে একই সমান্তরালে এসে দাঁড়াতে হবে। নারীকে যুগে যুগে অবলা ভেবে নির্যাতন চালিয়ে অধিকার বঞ্চিত রাখা হয়েছে এবং এখনো রাখা হচ্ছে। লীলা নাগ, শামসুন নাহার মাহমুদ এবং সুফিয়া কামাল শৃঙ্খলিত নারী সমাজের প্রতিনিধি। তাঁরা সমাজের গোঁড়ামি, রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে লড়াই করে গেছেন আজীবন। মানুষ এবং মানবতার মুক্তির জন্য ঘরের বাইরে বেরিয়েছেন তাঁরা। রক্তক্ষয়ী দেশভাগ ও মহান মুক্তিযুদ্ধের করাল রূপ তাঁরা প্রত্যক্ষ করেছিলেন। নারীর জীবন তথা মানবতা কীভাবে বিপন্ন হয় তা তাঁরা নিজের চোখে দেখেছিলেন। সেজন্যই তাঁরা মানবতার জন্য লড়ে গেছেন আমৃত্যু। নারী পুরুষের বিভেদমুক্ত সমাজের স্বপ্ন দেখেছেন আজীবন। তাঁরা তাঁদের জীবন দিয়ে প্রত্যক্ষ করেছিলেন— নারীকে তাঁর যথার্থ স্থান ও সম্মান না দিলে সমাজ ভারসাম্য হারাবে এবং সমাজের উন্নয়ন স্থবির হয়ে পড়বে। সমাজে নারীর মর্যাদাপূর্ণ এবং যথাযথ অবস্থান অর্জনের পথে প্রথম ধাপ হচ্ছে শিক্ষা। সর্বস্তরে নারীর জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা নারীর মুক্তির পথ সুগম করতে পারে। নারীর শিক্ষা ও সচেতনতার পাশাপাশি যে বিষয়টি মুখ্য হয়ে ওঠে সেটি হচ্ছে ক্ষমতায়ন। ক্ষমতায়ন বিষয়টি শুধু অর্থনৈতিক নয়। পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতিটি স্তরে ক্ষমতায়ন বিষয়টি নিহিত। নারীর শিক্ষা ও ক্ষমতায়ন শুধু অর্থনৈতিক পরিসরে আবদ্ধ রাখলে নারী মুক্তি সম্ভব হবে না। এই গবেষণায় লীলা নাগ, শামসুন নাহার মাহমুদ এবং সুফিয়া কামাল— তাঁদের জীবন, দর্শন ও কর্ম পরিসর পর্যালোচনা করে এই বিষয়টি স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান নারীর জীবনকে গণ্ডিবদ্ধ করে কখনো মুক্তির পথে পরিচালিত করা যাবে না। সমাজে নারীর মুক্তির জন্য নারীকে যেমন শিক্ষা অর্জন করতে হবে, অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হতে হবে— তেমনি সামাজিক, রাজনৈতিক এবং পারিবারিক ক্ষেত্রে তার অবস্থানকেও সুদৃঢ় করার চেষ্টা করতে হবে। কারণ এই বিষয়গুলো পরস্পর সম্পর্কিতও। কোন একটি বিষয় বাদ দিয়ে অন্যটিকে সুচারুরূপে বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। তাই নারী মুক্তির পথে এগিয়ে যেতে হলে এই বিষয়গুলোর উপর গুরুত্ব প্রদান করতে হবে। বাঙালি নারী মুক্তি আন্দোলন, নারীর শিক্ষা ও ক্ষমতায়ন বিষয়ে লীলা নাগ, শামসুন নাহার এবং সুফিয়া কামাল— এই তিনজন ব্যক্তিত্বের অবদান অনন্য। মানবিকবোধসম্পন্ন সমাজের স্বপ্ন নিয়ে কাজ করে গেছেন তাঁরা আজীবন।

পরিশিষ্ট

সিডও সনদের সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদসমূহ

অনুচ্ছেদ- ১০: শিক্ষা: সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদসমূহ

১। শিক্ষাক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের সমান অধিকার নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে, বিশেষ করে পুরুষ ও নারীর সমতার ভিত্তিতে যেসব বিষয় নিশ্চিত করার লক্ষ্যে রাষ্ট্রসমূহ নারীর প্রতি বৈষম্য দূরীকরণের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে, সেগুলো হচ্ছে:

ক) কর্মজীবন ও বৃত্তিমূলক নির্দেশনা, পল্লী ও শহরাঞ্চলে সকল ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা গ্রহণ ও ডিপ্লোমা লাভের সুযোগের জন্য একই শর্তাবলি; স্কুল-পূর্ব, সাধারণ, কারিগরি, পেশাগত ও উচ্চতর কারিগরি শিক্ষা, সেই সাথে সকল ধরনের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণে এই সমতা নিশ্চিত করা;

খ) একই শিক্ষাক্রম, একই পরীক্ষা, একই মানের যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক এবং একই মানের বিদ্যালয় চত্বর ও সরঞ্জামাদি লাভের সুযোগ প্রদান;

গ) সহশিক্ষা এবং পুরুষ ও নারীর ভূমিকা সম্পর্কিত চিরাচরিত ধারণা দূরীকরণের লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক অন্য ধরনের শিক্ষা উৎসাহিত করার মাধ্যমে, বিশেষ করে পাঠ্যপুস্তক ও বিদ্যালয় কর্মসূচি সংশোধন এবং উপযুক্ত শিক্ষা পদ্ধতি গ্রহণের মাধ্যমে সকল পর্যায়ে এবং সকল ধরনের শিক্ষায় পুরুষ ও নারীর ভূমিকা সম্পর্কিত চিরাচরিত যে কোন ধারণা দূরীকরণ;

ঘ) বৃত্তি ও অন্যান্য শিক্ষামঞ্জুরি থেকে লাভবান হওয়ার সমান সুযোগ প্রদান;

ঙ) বয়স্ক ও কর্মমূলক শিক্ষা কর্মসূচিসহ শিক্ষা অব্যহত রাখার কর্মসূচি, বিশেষ করে পুরুষ ও নারীর মধ্যে শিক্ষাক্ষেত্রে বিরাজমান যে কোন দূরত্ব সম্ভব স্বল্পসময়ের মধ্যে কমিয়ে আনার লক্ষ্যে প্রণীত কর্মসূচিসমূহে সুযোগ লাভের একই সুবিধা প্রদান;

চ) ছাত্রীদের বিদ্যালয় ত্যাগের হার কমানো এবং যেসব বালিকা ও মহিলা নির্দিষ্ট সময়ের আগেই বিদ্যালয় ত্যাগ করছেন, তাদের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন;

ছ) খেলাধুলা ও শারীরিক শিক্ষায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের জন্যে একই সুযোগ প্রদান;

অনুচ্ছেদ- ১১: কর্মসংস্থান

১। পুরুষ ও নারীর সমতার ভিত্তিতে তাদের একই অধিকার, বিশেষ করে নিম্নে বর্ণিত অধিকারসমূহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সর্বপ্রকার নিয়োগ দানের ক্ষেত্রে শরিক রাষ্ট্রসমূহ নারীর প্রতি বৈষম্য দূরীকরণের জন্য সকল উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে:

ক) সকল মানুষের মৌলিক কর্মসংস্থানের অধিকার;

খ) কর্মে নিয়োগের ক্ষেত্রে একই বাছাই মান প্রয়োগসহ একই নিয়োগ সুবিধা পাওয়ার অধিকার;

গ) পেশা ও চাকরি স্বাধীনভাবে বেছে নেয়ার অধিকার; পদোন্নতি, চাকরির নিরাপত্তা এবং চাকরির সকল সুবিধা ও শর্ত ভোগ করার অধিকার এবং শিক্ষানবীশ হিসাবে প্রশিক্ষণ, উচ্চতর বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও পুনঃপ্রশিক্ষণ গ্রহণের অধিকার;

ঘ) বিভিন্ন সুযোগ সুবিধাসহ সমান পারিশ্রমিক, একই মানের কাজের ক্ষেত্রে একই আচরণ, সেই সাথে কাজের মান মূল্যায়নের ক্ষেত্রে সমান আচরণ পাওয়ার অধিকার;

ঙ) বিশেষ করে অবসর গ্রহণ, বেকারত্ব, অসুস্থতা, অক্ষমতা ও বার্ধক্য এবং কাজ করার অন্যান্য অক্ষমতার ক্ষেত্রে সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার এবং সেই সাথে সবেতন ছুটি ভোগের অধিকার;

চ) সন্তান জন্মদান প্রক্রিয়া নিরাপদ রাখাসহ স্বাস্থ্য রক্ষা এবং কাজের পরিবেশে নিরাপত্তা অধিকার।

২। বিবাহ অথবা মাতৃত্বের কারণে নারীর প্রতি বৈষম্য রোধ এবং তাদের কাজ করার কার্যকর অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শরিক রাষ্ট্রসমূহ যেসকল বিষয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে, সেগুলো:

ক) গর্ভধারণ অথবা মাতৃত্ব সংক্রান্ত ছুটির কারণে বরখাস্ত এবং বৈবাহিক অবস্থার ভিত্তিতে বরখাস্ত করার ক্ষেত্রে বৈষম্য নিষিদ্ধ করা;

খ) বেতনসহ ছুটি অথবা পূর্বেকার চাকরি, জ্যেষ্ঠতা অথবা সামাজিক ভাতাদি না হারিয়ে তুলনাযোগ্য সামাজিক সুবিধাসহ মাতৃত্ব সংক্রান্ত ছুটি প্রবর্তন করা;

গ) বিশেষ করে একটি শিশু পরিচর্যা সুবিধা নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়নের মাধ্যমে, পিতা-মাতাদেরকে তাদের কাজের দায়িত্বের সঙ্গে পারিবারিক দায়িত্ব সংযুক্ত করে নাগরিক জীবনে অংশগ্রহণে সক্ষম করে তোলার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সহায়ক সামাজিক সার্ভিসের ব্যবস্থা উৎসাহিত করা;

ঘ) গর্ভাবস্থায় যে ধরনের কাজ নারীর জন্য ক্ষতিকর বলে প্রমাণিত, গর্ভকালে তাদেরকে সে ধরনের কাজ থেকে বিশেষভাবে রক্ষার ব্যবস্থা করা।

৩। এই ধারায় বর্ণিত বিষয়াদি সম্পর্কে রক্ষামূলক আইন, বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত জ্ঞানের আলোকে সময় সময় পর্যালোচনা করা হবে এবং প্রয়োজনমত সংশোধন, বাতিল অথবা সম্প্রসারণ করা হবে।

অনুচ্ছেদ- ১২: স্বাস্থ্য

১। পুরুষ ও নারীর সমতার ভিত্তিতে পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কিত সার্ভিসসহ স্বাস্থ্য পরিচর্যামূলক সার্ভিস পাওয়ার সুবিধা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শরীক রাষ্ট্রসমূহ, স্বাস্থ্য সেবার ক্ষেত্রে নারীর প্রতি বৈষম্য দূর করার জন্য সকল উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

২। একই ধারার অনুচ্ছেদ- ১ এর বিধান ছাড়াও শরীক রাষ্ট্রসমূহ, প্রয়োজনের ক্ষেত্রে বিনামূল্যে সার্ভিস প্রদান করে সেই সাথে গর্ভাবস্থায় ও শিশুকে মায়ের দুগ্ধদান চলাকালে পর্যাপ্ত পুষ্টির ব্যবস্থা করে গর্ভকাল, সন্তান জন্মদানের ঠিক আগে এবং সন্তান জন্মদানের পড়ে মহিলাদের উপযুক্ত সার্ভিস প্রদান নিশ্চিত করবে;

অনুচ্ছেদ- ১৩ : অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুযোগ-সুবিধা

শরিক রাষ্ট্রসমূহ, পুরুষ ও নারীর সমতার ভিত্তিতে, একই অধিকার, বিশেষ করে নিম্নলিখিত অধিকারসমূহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনের অপরাপর ক্ষেত্রে নারীর প্রতি বৈষম্য দূর করার জন্য সকল উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

ক) পারিবারিক কল্যাণের অধিকার; ব্যাংক ঋণ, বন্ধক ও অন্যান্য আর্থিক ঋণ গ্রহণের অধিকার; বিনোদনমূলক কর্মকাণ্ড, খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক জীবনের সকল বিষয়ে অংশগ্রহণের অধিকার।

অনুচ্ছেদ- ১৪ : গ্রামীণ নারী

১। শরিক রাষ্ট্রসমূহ, পল্লী এলাকার মহিলারা যেসব বিশেষ সমস্যার সম্মুখীন হন, সেগুলো এবং দৈনন্দিন জীবনে তাদের যেসব কাজ উপার্জন হিসেবে গণ্য করা হয় না সেসব কাজ এবং পরিবারের অর্থনৈতিক কার্যক্রমে তারা গুরুত্বপূর্ণ যেসব ভূমিকা পালন করেন, সেগুলো বিবেচনা করবে এবং পল্লী এলাকার নারীদের জন্য এই সনদের বিধান প্রয়োগ নিশ্চিত করতে সকল উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

২। শরিক রাষ্ট্রসমূহ, পুরুষ ও নারীর সমতার ভিত্তিতে, পল্লী উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে নারীর অংশগ্রহণ ও তা থেকে তাদের কল্যাণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে, পল্লী এলাকায় নারীর প্রতি বৈষম্য দূরীকরণের সকল উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং বিশেষ করে এসব নারীর জন্য নিম্ন লিখিত অধিকারসমূহ নিশ্চিত করবে:

ক) সকল পর্যায়ে উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্প্রসারণ ও বাস্তবায়নে অংশগ্রহণ করা;

খ) পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে তথ্য, পরামর্শ ও সেবালাভসহ পর্যাপ্ত স্বাস্থ্যসেবা সুবিধা লাভের সুযোগ পাওয়া;

গ) সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি থেকে সরাসরি লাভবান হওয়া;

ঘ) উপযোগী শিক্ষা সম্পর্কিত প্রশিক্ষণসহ আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক সকল ধরনের প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা এবং সেই সাথে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, তাদের কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সকল সামাজিক ও সম্প্রসারণ সার্ভিসের সুবিধা লাভ করা;

ঙ) কর্মসংস্থান অথবা স্ব-কর্মসংস্থানের মাধ্যমে অর্থনৈতিক সুবিধাদি লাভের সমান সুযোগ পাওয়ার উদ্দেশ্যে স্ব- সাহায্য গ্রুপ ও সমবায় সংগঠিত করা;

চ) সকল সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করা;

ছ) কৃষি ঋণ ও অন্যান্য ঋণ, বাজারজাতকরণ সুবিধা ও উপযুক্ত প্রযুক্তি লাভের সুযোগ পাওয়া এবং ভূমি ও কৃষি সংস্কার ও সেই সাথে ভূমি পুনর্বণ্টন স্কিমের ক্ষেত্রে সমান অধিকার লাভ করা;

জ) বিশেষ করে গৃহায়ন, পয়ঃনিষ্কাশন, বিদ্যুৎ ও পানি সরবরাহ, পরিবহন ও যোগাযোগ ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত বসবাস সুবিধা ভোগ করা।

অনুচ্ছেদ- ১৫: আইন সমতা

১। শরীক রাষ্ট্রসমূহ আইনের দৃষ্টিতে নারী ও পুরুষকে সমকক্ষ হিসেবে বিবেচনা করবে।

২। শরীক রাষ্ট্রসমূহ বিভিন্ন নাগরিক বিষয়ে নারীকে পুরুষের বৈধ ক্ষমতার অনুরূপ ক্ষমতা প্রদান করবে এবং সেই ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য একই সুযোগ দেবে। বিশেষ করে রাষ্ট্রসমূহ নারীকে চুক্তি সম্পাদনে ও সম্পত্তি দেখাশোনার সমান অধিকার দেবে এবং আদালত ও ট্রাইব্যুনালে কার্যক্রমের সকল স্তরে তাঁদের সঙ্গে সমান আচরণ করবে।

৩। শরীক রাষ্ট্রসমূহ নারীর বৈধ ক্ষমতা সংকুচিত করার লক্ষ্যে প্রণীত আইনভিত্তিক সকল চুক্তি ও যে কোন ধরনের ব্যক্তিগত দলিল বাতিল করবে।

৪। শরীক রাষ্ট্রসমূহ সকল নাগরিকের চলাচল এবং আবাসস্থল ও বসতি স্থাপন বেছে নেয়ার ব্যাপারে তাঁদের স্বাধীনতা সম্পর্কিত আইনের ক্ষেত্রে পুরুষ ও নারীকে সমান অধিকার দেবে।

তথ্য নির্দেশ

১। https://girlchildforum.org

গ্রন্থপঞ্জি

১. অঞ্জলি বসু (সম্পা.) (১৯৭৬), *সংসদ বাঙালি চরিতাভিধান,* কলকাতা: শিশু সংসদ প্রা. লি.।

২. আনিসুজ্জামান (সম্পা.) (২০০৩), *লীলা নাগ শতবর্ষের শ্রদ্ধাঞ্জলি,* ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ।

৩. আয়েশা খানম (২০১৫), *নারীর মানবাধিকার ও ক্ষমতার পথে,* ঢাকা: আগামী প্রকাশনী।

৪. আয়শা খানম (২০১৪ এপ্রিল-জুন), *নারীর মানবাধিকার ও ক্ষমতায়নের পথে সংগ্রামের চুয়াল্লিশ বছর, মহিলা সমাচার,* ঢাকা: বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ।

৫. আবুল আহসান চৌধুরী (২০১০), *সুফিয়া কামাল অন্তরঙ্গ আত্মভাষ্য,* ঢাকা: প্রথমা প্রকাশনা।

৬. ইয়াছমিন সুলতানা (২০১১), *সুফিয়া কামাল নারী নেতৃত্ব ও সাহিত্যকৃতি,* ঢাকা : ঝিনুক প্রকাশনী।

৭. কমলা দাশগুপ্ত (১৯৬৩), *স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার নারী,* কলিকাতা: জয়শ্রী প্রকাশন।

৮. কাজী মহম্মদ আশরাফ (২০১০), *জীবনী গ্রন্থমালা সুফিয়া কামাল,* ঢাকা : কথা প্রকাশ।

৯. গোপালচন্দ্র রায় (১৯৭২), *ঢাকায় রবীন্দ্রনাথ,* কলকাতা: সাহিত্য সনদ।

১০. জয়শ্রী, (১৩৯৫), *কুঞ্জলতা নাগের ভাষণ,* কলিকাতা: জয়শ্রী প্রকাশন।

১১. ড. নিবেদিতা দাশপুরকায়স্থ (১৯৯৯), *মুক্তি মঞ্চে নারী,* ঢাকা: প্রিপ ট্রাস্ট।

১২. দীপংকর মোহান্ত (১৯৯৯), *লীলা নাগ,* ঢাকা: বাংলা একাডেমী।

১৩. দীপংকর মোহান্ত (১৯৯৯), *লীলা রায় ও বাংলার নারী জাগরণ,* ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ।

১৪. নাসিমা হক (২০১৩), *শতাব্দীর সাহসিকা সুফিয়া কামাল,* ঢাকা : ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ।

১৫. *নারী নির্যাতন রিপোর্ট, ২০০০, ২০১০, ১০১৫, ২০১৯,* ঢাকা: আইন ও সালিশ কেন্দ্র।

১৬. *প্রবাসী,* (১৩৩৮), মাঘ, ৪র্থ সংখ্যা, ৩১ শ ভাগ, ২য় খণ্ড।

১৭. *বুলবুল,* মাঘ, তৃতীয় বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ১৩৪৩।

১৮. মফিদুল হক (২০১০, এপ্রিল-জুন), *উপমহাদেশের নারী আন্দোলন ও সুফিয়া কামাল, মহিলা সমাচার,* ঢাকা: বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ।

১৯. মালেকা বানু (২০১২ এপ্রিল-জুন), *উপমহাদেশের নারী আন্দোলন ও বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, মহিলা সমাচার,* ঢাকা: মহিলা পরিষদ।

২০. মালেকা বেগম (১৯৮৫), *নারীমুক্তি আন্দোলন,* ঢাকা: বাংলা একাডেমী।

২১. মালেকা বেগম (১৯৮৯), *বাংলার নারী আন্দোলন,* ঢাকা: দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লি:।

২২. মালেকা বেগম (সম্পা.) (১৯৯৭), *রাজপথে জনপথে সুফিয়া কামাল,* ঢাকা : আগামী প্রকাশনী।

২৩. মালেকা বেগম (২০১৪), *সুফিয়া কামাল,* ঢাকা: প্রথমা প্রকাশন।

২৪. মোরশেদ শফিউল হাসান (২০১২,এপ্রিল-জুন), *আলোকিত সমাজ গড়ার আন্দোলন এবং সুফিয়া কামাল, মহিলা সমাচার,* ঢাকা: বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ।

২৫. মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন (সম্পা.) (১৯৮৫), *বাংলা সাহিত্যে সওগাত যুগ,* ঢাকা: সওগাত প্রেস।

২৬. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান (২০০৫), *সাময়িকপত্রে সাহিত্যচিন্তা সওগাত,* ঢাকা: বাংলা একাডেমী।

২৭. সাজেদ কামাল (সম্পা.) (২০০২), *সুফিয়া কামাল রচনাসংগ্রহ প্রথম খণ্ড,* ঢাকা: বাংলা একাডেমী।

২৮. সালেহা সুলতানা (২০১৬), *সুফিয়া কামালের জীবনদৃষ্টি ও সাহিত্যকর্ম,* ঢাকা: অয়ন প্রকাশন।

২৯. সেলিনা বাহার জামান (সম্পা.), (২০০০), *বেগম শামসুননাহার মাহমুদ স্মারকগ্রন্থ,* ঢাকা: বুলবুল পাবলিশিং হাউস।

৩০. সেলিনা হোসেন এবং অন্যান্য (সম্পা.) (১৯৯৮), *সংগ্রামী নারী যুগে যুগে, প্রথম খণ্ড,* ঢাকা: বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ।

৩১. সেলিনা হোসেন ও মাসুদুজ্জামান (২০০৩), *নারীর ক্ষমতায়ন: রাজনীতি ও আন্দোলন,* ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স।

৩২. সেলিম জাহাঙ্গীর (১৯৯৯), *সুফিয়া কামাল,* ঢাকা : বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী।

৩৩. সীমা মোসলেম (সম্পা.) (২০১৩), *বাংলাদেশের নারী নির্যাতন পরিস্থিতি গবেষণা প্রতিবেদন ২০১২,* ঢাকা: মহিলা পরিষদ।

৩৪. সুফিয়া কামাল (১৯৮৯), *একাত্তরের ডায়েরী,* ঢাকা: হাওলাদার প্রকাশনী।

৩৫. সুফিয়া কামাল (২০১৩), *কবিতা সমগ্র,* ঢাকা: হাওলাদার প্রকাশনী।

৩৬. সুলতানা কামাল (২০০৯), *ছিলাম কোথায় যেন নীলিমার নিচে,* ঢাকা: জাগৃতি প্রকাশনী।

৩৭. সৈয়দ শামসুল হক (সম্পা.) (২০০০), *জননী সাহসিকা বেগম সুফিয়া কামাল শেষ প্রণতি,* ঢাকা : অন্যপ্রকাশ।

৩৮. শাহিদা পারভিন (২০১২), *শামসুন নাহার মাহমুদ ও সমকালীন নারীসমাজের অগ্রগতি,* ঢাকা: বাংলা একাডেমী।

৩৯. শ্যামলী আকবর এবং অন্যান্য (১৯৯৮), *নারীশিক্ষা উদ্ভব ও বিকাশ,* ঢাকা: স্টুডেন্ট ওয়েজ।

৪০. *শ্রীহট্ট ব্রাহ্মসমাজের নিয়মাবলী* (১৯৪৬), শ্রীহট্ট।

৪১. *The Dhaka University Studies* (1990), Part A, Volume-47, no-1, University of Dhaka

সহায়ক গ্রন্থ

১. আতাউর রহমান ও লেলিন আজাদ (১৯৯০), *ভাষা আন্দলনের আর্থ সামাজিক পটভূমি,* ঢাকা: দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লি:।

২. আনিসুজ্জামান (সম্পা.) (১৯৬৩), *রবীন্দ্রনাথ,* ঢাকা: স্টুডেন্ট ওয়েজ।

৩. আনিসুজ্জামান এবং অন্যান্য (সম্পা.) (২০১১), *সুফিয়া কামাল স্মারক গ্রন্থ,* ঢাকা: সুফিয়া কামাল স্মারকগ্রন্থ সম্পাদনা পরিষদ।

৪. আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরী (২০০৮), *সমাজ-রাজনীতি ও সমকাল,* ঢাকা: ঐতিহ্য।

৫. আফরোজা বুলবুল (অক্টোবর ২০০৫ ও ফেব্রুয়ারি ২০০৬), *সাপ্তাহিক 'বেগম' পত্রিকায় প্রকাশিত রচনায় বাঙালি মুসলিম নারীর সমাজ-ভাবনা,* ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, ঢাকা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

৬. আবুল আহসান চৌধুরী (২০১০), *সুফিয়া কামাল অন্তরঙ্গ আত্মভাষ্য,* ঢাকা: প্রথমা প্রকাশনা।

৭. আবুল কাশেম ফজলুল হক (২০০২), *সাহিত্য ও সংস্কৃতি প্রসঙ্গে,* ঢাকা: গ্লোব লাইব্রেরী (প্রাইভেট) লিমিটেড।

৮. আব্দুল্লাহ আল-মুতী (১৯৯৬), *আমাদের শিক্ষা কোন পথে,* ঢাকা: দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লি:।

৯. আয়শা খানম (২০১৪ এপ্রিল-জুন), *নারীর মানবাধিকার ও ক্ষমতায়নের পথে সংগ্রামের চুয়াল্লিশ বছর,* মহিলা সমাচার, ঢাকা: বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ।

১০. ইসরাইল খান (২০০৪), *বাংলা সাময়িকপত্র: পাকিস্তান পর্ব,* ঢাকা: বাংলা একাডেমী।

১১. গোলাম মুরশিদ (২০১৮), *নারী প্রগতির একশো বছর রাসসুন্দরী থেকে রোকেয়া,* ঢাকা: অবসর।

১২. জামাল উদ্দিন (২০০২), *বাংলা সাহিত্যে মুসলিম নারী,* ঢাকা: ডেফোডিল পাবলিকেশন্স।

১৩. ড. আব্দুল মালেক এবং অন্যান্য (২০১৮), *নারী শিক্ষাবিজ্ঞান ও বাংলাদেশ শিক্ষা,* ঢাকা: র‍্যামন পাবলিশার্স।

১৪. ড. ইমরান হোসেন (১৯৯৩), *বাঙালি মুসলিম বুদ্ধিজীবী: চিন্তা ও কর্ম (১৯০৫-১৯৪৭),* ঢাকা: বাংলা একাডেমী।

১৫. ড. মাহবুবা সিদ্দিকী (১৯৯৪), *বাংলা কবিতায় সমাজ সচেতনতা,* ঢাকা: বাংলা একাডেমী।

১৬. নিতাই দাস (১৯৯৩), *পাকিস্তান আন্দোলন ও বাংলা কবিতা,* ঢাকা: বাংলা একাডেমী।

১৭. পরমেশ আচার্য (২০১১), *বাঙালির শিক্ষাচিন্তা,* কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং।

১৮. বশীর আলহেলাল (১৯৮৫), *ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস,* ঢাকা: আগামী প্রকাশনী।

১৯. ম. হাবিবুর রহমান (২০০৩), *শিক্ষাকোষ,* ঢাকা: কম্পেন্ডিয়াম অব এডুকেশন প্রোজেক্ট।

২০. মফিদুল হক (২০০৭), *নারীমুক্তি পথিকৃৎ,* ঢাকা: দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লি:।

২১. মোঃ আব্দুল মালেক (২০০৮), *ব্রিটিশ আমলে বাংলা শিক্ষাচিন্তা ও সমাজসংস্কার,* পিএইচডি ডিগ্রী অর্জনের শর্ত পূরণের জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়: সমাজবিজ্ঞান বিভাগ।

২২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (২০১৬), *শিক্ষা,* ঢাকা: বিভাস প্রকাশন।

২৩. শাহানাজ পারভিন (২০০৭), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে নারীর অবদান,* ঢাকা: বাংলা একাডেমী।

২৪. সংকল্প, *নজরুল রচনাবলী (৩য় খণ্ড)* (১৯৯৬), ঢাকা: বাংলা একাডেমী।

২৫. সুবোধ সেনগুপ্ত (সম্পা.) (২০১৬), *সংসদ বাঙালিচরিতাভিধান,* কলকাতা: শিশুসাহিত্য সংসদ প্রাইভেট লিমিটেড।

২৬. হাসান ইকবাল (২০১৬), *ভাষা, নারী ও পুরুষপুরাণ,* ঢাকা: অবসর প্রকাশনা সংস্থা।

২৭. হাসান হাফিজুর রহমান (১৯৭৩), *আধুনিক কবি ও কবিতা,* ঢাকা: বাংলা একাডেমী।